স্মৃতিকথা

কাজী মোতাহার হোসেন

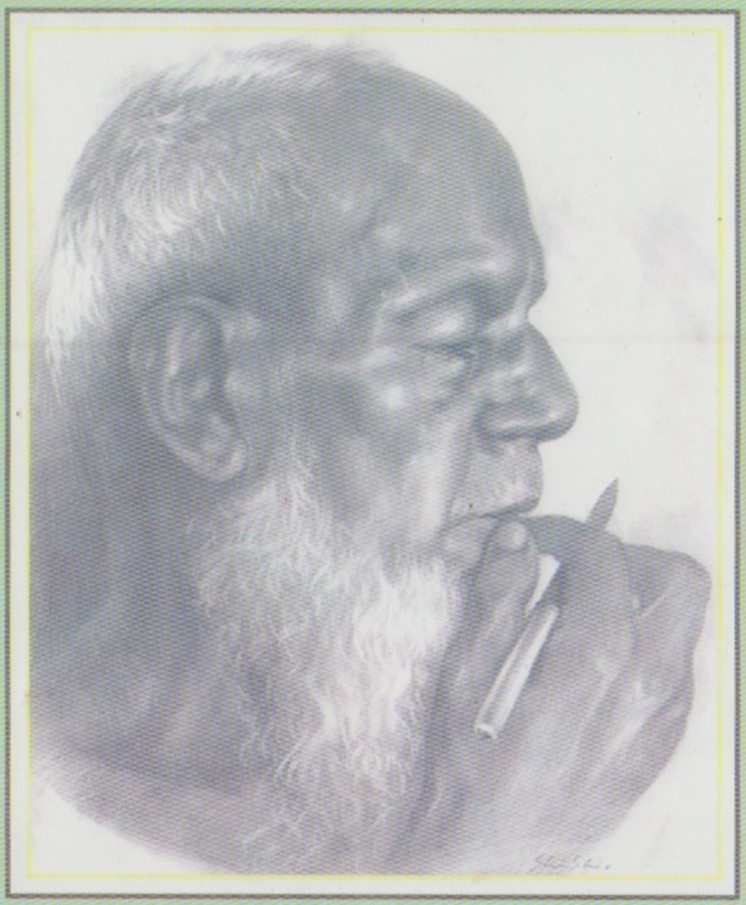

স্মৃতিকথা

কাজী মোতাহার হোসেনের সুগভীর পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। এই শান্ত সমাহিত, সৌম্যদর্শন ব্যক্তিটি ছিলেন একদিকে সত্য ও সুন্দরের সাধক, অন্যদিকে সরল, নিরহংকার, আত্মভোলা, সজ্জন ও ঋষিকল্প। মানুষ হিসেবে এবং বিদ্বৎসমাজে তিনি ছিলেন এক আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি।

'স্মৃতিকথা' একান্তভাবেই কাজী মোতাহার হোসেনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ। ১৮টি স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। অধিকাংশই তাঁর শেষজীবনে লেখা। ছোটবেলা ও ছাত্রজীবন নিয়ে লেখা চারটি প্রবন্ধে (আমার ছোটবেলা, কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা, আমার জীবন-দর্শনের অভ্যুদয় ও ক্রমবিকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ) লেখকের ব্যক্তি-মানস ও চরিত্র কীভাবে গড়ে উঠেছিল তার অকপট পরিচয় পাওয়া যায়। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে মেধা ও বৃত্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে কেমন করে তিনি গড়ে উঠেছেন তারই কাহিনী। লেখাগুলোতে কাজী মোতাহার হোসেনের বহু সহপাঠী ও শিক্ষকের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিসত্তা ও মূল্যবোধ নির্মাণে তাঁর স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মূল্যবান অবদানের কথা তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি বাল্যকাল থেকেই ঘৃণা করতে শিখেছিলেন। মানবিক মূল্যবোধে যাদের হৃদয় আলোকিত নয় তাদের তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করেন নি।

কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে লেখা তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে 'স্মৃতিকথায়'। কাজী মোতাহার হোসেন নিজেই বলেছেন– "নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দিনগুলো আমার সাহিত্যিক জীবনের অমূল্য সঞ্চয়। দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা (বৈজ্ঞানিক হিসাবে) আগে থেকেই ছিল, কিন্তু নজরুলের সংস্পর্শে এসে হয়ত মানুষকে আরও নিকট করে, আপন বলে ভাবতে শিখেছি। এই দুর্লভ মানবীয় অনুভূতি যদি সত্যিই কিছুটা এসে থাকে, তবে তার ষোল আনা না হলেও অন্তত বারো আনাই যে নজরুলের প্রভাবে হয়েছে একথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করবো।" (আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা)।

'স্মৃতিকথায়' আরো কয়েকজন মনীষী সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান লেখা সংকলন করা হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলো রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, আবুল হুসেন, কাজী আব্দুল ওদুদ ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-কে নিয়ে। কৌতূহলী পাঠকেরা নজরুল-ফজিলতুন্নেসা সম্পর্কের কিছু অজানা অথচ প্রামাণ্য তথ্য জানতে পারবেন এই গ্রন্থের একটি রচনা থেকে।

প্রচ্ছদ : শিশির ভট্টাচার্য্য

www.pathagar.com

কবি নজরুলের সুহৃদ, মুসলিম সমাজের মুক্তবুদ্ধিচর্চার অন্যতম কাণ্ডারী কাজী মোতাহার হোসেনের জন্ম নদীয়া জেলার (বর্তমান কুষ্টিয়া) ভালুকা থানার (বর্তমান কুমারখালি) অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর গ্রামে, ১৮৯৭ সালের ৩০ জুলাই, তাঁর মাতুলালয়ে। মাতার নাম তসিকুন্নেসা, পিতা-কাজী গওহরউদ্দীন আহমদ। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার (বর্তমান রাজবাড়ী) পাংশা থানার বাহাদুরপুর গ্রামে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় বি.এ. অনার্স (১৯১৯) ও এম. এ. (১৯২১) পাশ করে, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গণিতে এম.এ. (১৯৩৯) পাশ করেন। তত্ত্বাবধায়কের সাহায্য ছাড়াই তথ্যগণিতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. (১৯৫০) ডিগ্রী অর্জনের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

১৯২১ সাল থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। '৭৫ সাল থেকে '৮১ সালে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন। কর্মজীবনে ১৯৫৫ থেকে '৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞান অনুষদের ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সাল থেকে '৬৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন 'ইনস্টিট্যুট অব স্ট্যাটিসটিক্যাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং'-এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র সদস্য হিসেবে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন এবং সেই সমাজের মুখপত্র 'শিখা'র সঙ্গে ১৯২৬ থেকে' ৩৫ পর্যন্ত সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৫০ সাল থেকে সম্পাদনা করেন 'দিলরুবা' পত্রিকা। ১৯৪৯ থেকে '৫৮ পর্যন্ত 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে'র সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। কাজী মোতাহার হোসেনের প্রথম গ্রন্থ 'সঞ্চরণ' (১৯৩৭) রবীন্দ্র-প্রশংসাধন্য হয়েছিল। বাংলা একাডেমী চার খণ্ডে তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করেছে।

'বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৬৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানসূচক ডি.এসসি. (১৯৭৪), 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' (১৯৭৯) ছাড়াও 'নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক' (১৯৭৭), 'মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৮০) ইত্যাদি সম্মাননা লাভ করেছেন।

বাংলাদেশের 'দাবাগুরু' কাজী মোতাহার হোসেন দাবা খেলায় সাত বার সর্বভারতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতাতেও তিনি পুরস্কার পেয়েছেন।

তথ্যগণিতের মৌলিক গবেষণা এবং সাহিত্যরচনার জন্য কাজী মোতাহার হোসেন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৯৮১ সালের ৯ অক্টোবর তাঁর জীবনাবসান হয়।

www.pathagar.com

স্মৃতিকথা

কাজী মোতাহার হোসেন

নবযুগ প্রকাশনী

www.pathagar.com

©
কাজী মোতাহার হোসেন ফাউণ্ডেশন

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১১, এপ্রিল ২০০৪
তৃতীয় মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪২০, অক্টোবর ২০১৩

মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

প্রকাশক : অশোক রায় নন্দী, নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ। মোবাইল : ০১৭১১-৫২১৯৯৮, ০১৯৪০-১১২৬৭২
মুদ্রক : আবির কম্পিউটার, ০১৭১০-৫৪৬৩০১, মুদ্রণ : নিউ এস. আর প্রিন্টার্স
বিদেশে প্রাপ্তিস্থান, লন্ডনে : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিকলেন, আমেরিকায় : বুক ভিউ
কানাডায় : এটিএন বুক এন্ড ক্রাফটস, ভ্যানফোর্থ এভিনিউ, ভারতে : দেজ
পাবলিশিং, নয়া উদ্যোগ (কোলকাতা), সুবর্ণরেখা (শান্তিনিকেতন)।
অনলাইনে অথবা ফোনে : রকমারি.com, 01841115115.
বই 24.com, 01763665577

প্রচ্ছদ : শিশির ভট্টাচার্য

Smritikatha (Recollection of Memoirs) By Qazi Motahar Husain.
Published by Ashok Roy Nandi of Nabajuga Prokashani.
67 Paridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
First Published : April 2004, 3rd Print October 2013.
Price : Tk. 240.00 Cover : Shishir Bhattacharya.

www.pathagar.com

বাংলাদেশের তরুণ সমাজের প্রতি
উৎসর্গিত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা	VII
ফাউণ্ডেশনের কথা	IX
আমার ছোটবেলা	১১
কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা	২৯
আমার জীবন-দর্শনের অভ্যুদয় ও ক্রমবিকাশ	৪৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	৬১
আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা	৭১
একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত চিন্তা	৭৯
শান্তিনিকেতনে তিনদিন	৮৩
ঢাকার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য	৮৯
সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ	৯৩
স্মৃতিপটে নজরুল	৯৫
নজরুলকে যেমন দেখেছি	১০১
আমার বন্ধু নজরুল : তাঁর গান	১০৫
বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস-কে যেমন দেখেছি	১২১
কর্ম-প্রাণ আবুল হুসেন	১২৯
কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর অবদান	১৩৩
মৌলানা শহীদুল্লাহ্	১৩৯
মরহুমা ফজিলতুন্নেসার সঙ্গে আমার পরিচয়	১৪৩
ফজলুল বারী চৌধুরী স্মৃতিকথা	১৪৭

www.pathagar.com

ভূমিকা

কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭—১৯৮১) ছিলেন গত শতাব্দীতে আমাদের সমাজের এক অনন্য প্রতিভা। তিনি ছিলেন এমন এক বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব যাঁর মধ্যে বহুবিধ বিরল গুণের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, গণিতশাস্ত্রবিদ, সংখ্যাতত্ত্ববিদ, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ ও দাবাড়ু। 'জ্ঞান-সাধনায়, সমাজ-গঠনে, প্রগতিশীল ভাবনার প্রবর্তনায়, উদার মানবতার প্রতিষ্ঠা-কামনায় এবং রসময় জীবন-উপলব্ধির দৃষ্টান্তে' কাজী মোতাহার হোসেনের ভূমিকা ছিল অসাধারণ।

মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্রে কাজী মোতাহার হোসেন মুসলমান সমাজের একজন পথিকৃৎ হিসেবে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯২৬ সালে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজ গড়ে উঠছিল আবুল হুসেন, কাজী আব্দুল ওদুদ ও কাজী মোতাহার হোসেনের নেতৃত্বে। এর মূলমন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রাচীর অতিক্রম করে অজ্ঞানতা, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার থেকে বাংলার তৎকালীন মুসলমান সমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্য ছিল এই আন্দোলনের। এই প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির 'প্রদীপ্ত শিখা' ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। এই গোষ্ঠীর 'মস্তিষ্ক' ছিলেন কাজী আব্দুল ওদুদ, 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ' ছিলেন আবুল হুসেন এবং 'হৃদয়' ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। সে সময়কার রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে এই গোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই প্রবল আলোড়ন এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

কাজী মোতাহার হোসেনের সুগভীর পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। চারটি খণ্ডে তাঁর রচনাবলী বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। মুক্ত বুদ্ধি, বলিষ্ঠ চিন্তা, মননশীলতা, মানবতাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা ও উদার জীবনবোধের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন তাঁর এই রচনাবলী। এই শান্ত সমাহিত, সৌম্যদর্শন ব্যক্তিটি ছিলেন একদিকে সত্য ও সুন্দরের সাধক, অন্যদিকে সরল, নিরহংকার, আত্মভোলা, সজ্জন ও ঋষিকল্প। মানুষ হিসেবে এবং বিদ্বৎসমাজে তিনি ছিলেন এক আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি।

'স্মৃতিকথা' একান্তভাবেই কাজী মোতাহার হোসেনের আত্মজীবনী। ১৮টি স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। অধিকাংশ প্রবন্ধই তাঁর শেষ জীবনে লেখা। প্রফেসর সনজীদা খাতুন প্রশংসনীয়ভাবে সংকলনের দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। ছোটবেলা ও ছাত্রজীবন নিয়ে লেখা চারটি প্রবন্ধে (আমার ছোটবেলা, কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা, আমার জীবন-দর্শনের অভ্যুদয় ও ক্রমবিকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ) কাজী মোতাহার হোসেনের ব্যক্তি-মানস ও চরিত্র কীভাবে গড়ে উঠেছিল তার অকপট পরিচয় পাওয়া যায়। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তিনি মেধা ও বৃত্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে লেখাপড়া করেছেন। বৃত্তির অর্থ কোন সময় অসুস্থ পিতাকে পাঠিয়ে দিয়ে প্রাইভেট টিউশনি করে পড়াশুনা চালিয়েছেন। ছাত্রাবস্থায় কোথাও তিনি জায়গীর থেকেছেন এবং গৃহশিক্ষকের কাজ করেছেন। এই লেখাগুলোতে মোতাহার হোসেনের বহু সহপাঠী ও শিক্ষকের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ব্যক্তি-সত্তা ও মূল্যবোধ নির্মাণে তাঁর স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মূল্যবান অবদানের কথা তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াকালীন রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক

www.pathagar.com

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'আশ্চর্য ব্যবহারের' এক চমকপ্রদ উল্লেখ আছে তাঁর 'আমার জীবন-দর্শনের অভ্যুদয় ও ক্রমবিকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হওয়ার নেপথ্য কারণ ছিল এই ঘটনাটি। সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি বাল্যকাল থেকেই ঘৃণা করতে শিখেছিলেন। মানবিক মূল্যবোধে যাদের হৃদয় আলোকিত নয় তাদের তিনি শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করেন নি। গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কাজী মোতাহার হোসেন স্মরণ করেছেন তাঁর কতিপয় শিক্ষককে, বিশেষ করে জ্যোতীন্দ্রমোহন রায় (কুষ্টিয়া হাই স্কুলের শিক্ষক), ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস, ড. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ড. জেঙ্কিন্স, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বঙ্কিমদাস ব্যানার্জি (ঢাকা কলেজ/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)-কে।

'স্মৃতিকথায়' কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে লেখা তিনটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত : স্মৃতিপটে নজরুল, নজরুলকে যেমন দেখেছি, আমার বন্ধু নজরুল : তাঁর গান। নজরুলের সঙ্গে মোতাহার হোসেনের সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড় ও অন্তরঙ্গ। নজরুল তাঁকে 'মোতিহার' বলে সম্বোধন করতেন। নজরুলের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল কাজী মোতাহার হোসেনের ব্যক্তিমানস ও সাহিত্যিক জীবনের উপর। তাঁর নিজের কথায়— "নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দিনগুলো আমার সাহিত্যিক জীবনের অমূল্য সঞ্চয়। দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা (বৈজ্ঞানিক হিসাবে) আগে থেকেই ছিল, কিন্তু নজরুলের সংস্পর্শে এসে হয়ত মানুষকে আরও নিকট করে, আপন বলে ভাবতে শিখেছি। এই দুর্লভ মানবীয় অনুভূতি যদি সত্যিই কিছুটা এসে থাকে, তবে তার ষোল আনা না হলেও অন্তত বারো আনাই যে নজরুলের প্রভাবে হয়েছে একথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করবো।" (আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা)।

'স্মৃতিকথায়' আরো কয়েকজন মনীষী সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলন করা হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলো রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, আবুল হুসেন, কাজী আব্দুল ওদুদ ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-কে নিয়ে। কিভাবে কাজী মোতাহার হোসেন তাঁদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলেন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ-চিন্তা বা বিজ্ঞানচর্চায় তাঁদের স্ব স্ব অবদান এবং তাঁদের চারিত্রিক মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেছেন। কৌতূহলী পাঠকেরা নজরুল-ফজিলতুন্নেসা সম্পর্কের কিছু অজানা, প্রামাণ্য তথ্য জানতে পারবেন এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'ফজিলতুন্নেসার সঙ্গে আমার পরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে।

কাজী মোতাহার হোসেন ফাউণ্ডেশনের তত্ত্বাবধানে 'স্মৃতিকথা' প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের আশা, প্রকাশনাটি তাঁকে আরো জানতে, বিশেষ করে সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর বলিষ্ঠ লেখাগুলোর সাথে পরিচিত হতে বর্তমান প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে। ইতিহাসের এই তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে কাজী মোতাহার হোসেনের জীবন ও কর্ম সমাজকে আলোর পথ দেখাবে।

মোহাম্মদ আবু হেনা

১৩ পার্ক রোড
বারিধারা, ঢাকা
৭ মার্চ ২০০৪

www.pathagar.com

ফাউণ্ডেশনের কথা

'স্মৃতিকথা' গ্রন্থখানি কাজী মোতাহার হোসেন ফাউণ্ডেশনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত চতুর্থ প্রকাশনা। গ্রন্থটি কাজী মোতাহার হোসেন-এর স্মৃতিচারণমূলক লেখার সংগ্রহ। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, খেলোয়াড় এই জ্ঞানতাপসের মধ্যে বিচিত্র প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল। এসব গুণের সমন্বয়ে তাঁর জীবনধারা, জীবনাদর্শ এবং জীবনদর্শন একটি উচ্চ মার্গে উন্নীত হয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন আপনভোলা, উদার ও শিশুতুল্য সরল মনের ছিলেন তেমনি আবার অসত্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও প্রতিবাদমুখর ছিলেন। তিনি ধর্মকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। এই অপূর্ব সমন্বয়ের ফলে মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন করে তিনি তৎকালীন অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজকে আলোর দিকে ধাবিত করার জন্য পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।

'স্মৃতিকথা'য় তাঁর পরম প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কথা, বন্ধুবান্ধবদের কথায় তাঁর উন্নত রুচিবোধ ও জীবনপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তৎকালীন বহু মনীষী যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, শিখা গোষ্ঠীর আবুল হোসেন ও কাজী আব্দুল ওদুদ প্রমুখের স্মৃতিচারণ করেছেন। জানা যায়, কাজী মোতাহার হোসেন মুসলমান চরিত্র নিয়ে লেখার অনুরোধ করাতেই শরৎচন্দ্র 'গফুর' চরিত্র নিয়ে 'মহেশ' গল্পটি লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁর দাবা খেলার সাথী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সঞ্চরণ' গ্রন্থের প্রশংসা করে তাঁকে পত্র লিখেছিলেন।

কাজী মোতাহার হোসেনের লেখনীতে হারানো দিনের মাধুর্য, রস ও গন্ধ আছে। তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক চিত্রও পাওয়া যায়। আজকে আমরা যাঁরা সেই পুরোনো দিনের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও মূল্যবোধ খুঁজি, যাঁরা বর্তমানের নিয়ত-সন্ত্রাসমূলক অবস্থায় বিভ্রান্ত ও শঙ্কিত, তাঁদের কাছে বইটি সমাদৃত হবে, আমাদের বিশ্বাস। তাঁর মননশীলতা, জীবনসাধনা, সমাজচেতনা আজ নতুন করে আবার পথ দেখাবে। নিজেকে চেনার, নিজের অস্তিত্ব ও অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতা সম্পর্কে মানবসমাজকে অবহিত করবার জন্যই এমন মনীষীদের আবির্ভাব।

গ্রন্থখানি পাঠক সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

২৪/১ সেগুনবাগান,
ঢাকা

নাজমা হক
সাধারণ সম্পাদক
কাজী মোতাহার হোসেন ফাউণ্ডেশন
ঢাকা

www.pathagar.com

আমার ছোটবেলা

এই বৃদ্ধ বয়সে যখন দেখি, নাতি-নাতনীদের বা তাদের ছেলেমেয়েদের, হাসিমুখ, হৈ হুল্লোড়, অকস্মাৎ মারামারি আবার পরক্ষণেই গলাগলি, তখন অবাক হয়ে ভাবি, এরাই কি এসেছে বেহেশত থেকে ? এদের মধুর হাসিকান্না, একটু আদরেই গলে যাওয়া, বাপ-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানীর উপর একান্ত নিঃসংশয় নির্ভর, আর এদের মান-অভিমান, সকলের ভালবাসার উপর সহজ দাবী, তখন বুঝতে পারি সত্যই এরা রাজাধিরাজ। ছোট দু'খানা বাহু মেলে কোলে উঠতে চাইবে, হাজার কাজ ফেলেও কোলে নিতেই হবে; কান্না জুড়ে দেবে, 'পুতুল চাই, আকাশের চাঁদ চাই', আরও কত কি ?—তাদের এসব আবদার মানতেই হবে; তাদের বিড়াল, ঘোড়া, দোলনা, 'লালমণি,' যখন যেটা চাই, তা দিতেই হবে। তাই বুঝি কবি-গুরু আশ্চর্য হয়ে বলেছেন,—

'বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়
এ কি গো বিস্ময়
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ কোন্ তূণে
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।'

এদের জীবনে বিরাজ করে চিরবসন্তের মধুর গুঞ্জন ও কল্পলোকের অনির্বচনীয় কল্পনা।

এসব দেখে আপনা হতেই নিজের কথাটাও মনে পড়ে যায়। আমিও ত একদিন এমনি নির্ভয়, সরল বিশ্বাসী আদুরে খোকাটিই ছিলাম। আমার মনের সেই চঞ্চল শিশুটা কোথায় গেল ? রাজকবি আমীর খসরু এই ভেবেই কি তাঁর 'হাসিভরা কুসুম কলি' (গুনচা-ই-খাঁন্দা) কবিতায় বলেছেন—

'কি শিগুফত গুল দর বু-স্ত আঁ গুন্চা-ই-খাঁদা কুজা ?'

ফুল বাগানের ফুল্ল-কুসুম সখেদ আনন্দ-বিস্ময়ে বলছে, আমি যে পাপড়ি-ঘেরা হাস্যময় কোরকটা ছিলাম, সেই 'আমি' কোথায় গেলাম ? বিকচ পুষ্প যে খুশি না হয়েছে, এমন নয়—তবু সে তার অতীত দিনের সুরক্ষিত কোরকের স্মৃতি ভুলতে পারছে না, এবং সেজন্য তার একটা অভাববোধ রয়ে গেছে।

এ কি সেই বাবা আদমের কেস্সা ? তিনি যখন বেহেশতের কাননে ইচ্ছামত যত্র-তত্র বিচরণ করতেন ধুলাবালি, নুড়িকঙ্কর, মণিকাঞ্চনকে সমজ্ঞান করতেন, এমনকি এসবের নামও জানতেন না; বসনভূষণের কোনও প্রয়োজন বোধ করতেন না তখন কি তাঁর শৈশবকাল ছিল ? তারপর কৈশোরে বিবি হাওয়ার সঙ্গে বিচরণকালে, একটি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ছাড়া অন্যান্য সর্বপ্রকার সুখ-সম্ভোগ করেছিলেন; অতঃপর যৌবন-

www.pathagar.com

দশায় কি শয়তানের ছলনায় ভুলে সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল-ভক্ষণ করে স্বর্গচ্যুত হলেন, তখন কি তাঁর মনে এই বলে খেদ হয়েছিল—"হায় আমার কুঁড়ি অবস্থার সেই নিরাপদ আস্তরণটা কোথায় হারালেম ?"

বাল্যকালের কোমল মনের কয়েকটা গভীর স্মৃতি সারাজীবন অম্লান থাকে। তারই দুই-একটা এখানে উল্লেখ করছি। অবশ্য, অনেক উপস্মৃতি, হয়ত নিতান্ত মামুলি বলেই, মন থেকে একেবারে অপসৃত হয়েছে।

আমার বয়স তখন তিন-চার বছর হবে। একবার নৌকায় করে মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী যাচ্ছিলাম। সঙ্গে ছিলেন বাপজান আর বড় মামু। মামাবাড়ী কুমারখালী ও খোকশার মাঝামাঝি তৎকালীন ভালকো থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর গ্রামে গোড়ই নদীর উত্তর দিকে দুই-তিন মাইল দূরে, আর আমাদের বাড়ী পাংশা থানার অন্তর্গত বাগমারা গ্রামে পদ্মা নদী থেকে আধমাইল উত্তরে, আর খোকশা রেলষ্টেশন থেকে ৭ মাইল দক্ষিণে। গোড়ই দিয়ে আসবার সময় গোড়ই ব্রীজটা আমার কাছে অতি সুন্দর ছবির মত মনে হয়েছিল। ওর ফোকরের ভিতর দিয়ে যখন নৌকোটা চলে গেল তখন আরও অবাক হয়ে গেলাম, এই পুলটা কত বড়, আর কত সুন্দর! এই যাত্রাতেই, গোড়ই ব্রীজ পার হবার দুই-এক মাইল আগেই, আর একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছিলাম, সেকথাও স্পষ্ট মনে পড়ে। আমাদের নৌকো থেকে দশ-বারো হাত দূর দিয়ে একটা সাপের গলা ও মাথা চলে যেতে দেখলাম, গলাটা খুব মোটা বোরো বাঁশের চেয়েও আরেকটু মোটা, মাথার ফণাটা আরও একটু চওড়া, রঙ হলদে, ফনার কাছে হলুদ বরণটা একটু ফিকে। আমার কাছে দৃশ্যটা বেশ ভালই লাগলো; কিন্তু মাঝিদের আতঙ্ক, আর বাপজান যেমন আচম্‌কা আমাকে বুকের সাথে সেঁটে ধরলেন, মামুও কাছে ঘেঁসে আমার গায়ে হাত দিয়ে রইলেন, তাতে এবং এঁদের মুখের উদ্বিগ্ন ভাব দেখে আমারও মনে ভয় হল। কিছুক্ষণ পরে সাপটা ডুব দিল। তখন মাঝিরা আল্লার ধ্বনি দিল, আর কতবড় একটা বিপদ কেটে গেল, তারজন্য আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। পরে শুনলাম ঐ সাপ নাকি ইচ্ছা করলেই লেজের ঝাপটা দিয়ে নৌকো তল করে দিতে পারতো।

তারপর কখন পদ্মা নদীতে পড়লাম, আর বাড়ীতে পৌছলাম কিছু মনে নাই। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম, আমি উড়তে পারি; ডানা না থাকলেও শুধু হাত নেড়েই উড়তে পারি। উড়ে গিয়ে কখনও আমগাছের উপরে কখনও বা বাঁশের ঝাড়ে কোনও বাঁশের আগায় গিয়ে বসতাম। অনেক সময় হুমো বুড়ি সেখানেও তাড়া করতো, তখন হয়ত উড়ে গিয়ে তেঁতুল গাছের আগায় বা হিজল গাছের কোটরে আশ্রয় নিতাম।

আবার একদিন আমার বয়স তখন সাত-আট বছর হবে গলির পাশের হিজল গাছের গা ঘেঁষে যাচ্ছি, তখন দেখি কি! হাতখানেক লম্বা একটা সাপ প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া ফণা তুলে আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সাপটার গায়ের রঙ লাল, আর সেই লালের উপর সাদা-কালো ফুট্‌কুনি (ছোট ছোট বিন্দু) দেখতে অতি সুন্দর। সাপ দেখেই বাড়ীতে এসে পড়লাম। এরপর আমার হল সাপাতঙ্ক—রাত্রিকালে স্বপ্ন

www.pathagar.com

দেখতাম, সাপে তাড়া করেছে, আর "সাপ-সাপ" রবে চীৎকার করে উঠতাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যেত; আর বুকে হাত দিয়ে দেখতাম, বুক ধড়ফড় করছে।...যাহোক, ঐ লাল সাপটা দেখবার পর আমার ধারণা হল, বোধহয় হিজল গাছের কোটরের মধ্যেই অনেক সাপ আছে। তখন থেকে ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় ভয়ে গা শিউরে উঠত। আবার, লোকেরা এই সাপের বর্ণনা শুনে প্রায়ই আমাকে বলতো, "মোতাহার, তুমি ভাগ্যবান ঐ ছোট সাপই হচ্ছে সব সাপের রাণী, ভাগ্যবান ছাড়া অন্য কারও কাছে ঐ রাণী সাপ দেখা দেয় না।"

আর একদিন (বয়স তখন নয়-দশ বছর হবে) আমাদের বাগানে 'দাদী'র গাছের তলায় আম কুড়োতে গিয়েছি, হঠাৎ একটা মস্তবড় সাপ গাছ থেকে সড়াৎ করে লাফিয়ে মাটিতে পড়েই লেজের ঝাপটা দিতে দিতে চষা খেতের ইঁটে (ইটের মতন শক্ত) শুকনো মাটির দলা ছিটকাতে ছিটকাতে চলে গেল। ভাগ্যিস, আমার মাথার কয়েক হাত উপর দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল, নইলে ঐ দিনই হয়ত আমার অক্কা হয়ে যেত। লোকের কাছে শুনলাম, ওটা দাঁড়াশ্ সাপ। ওর লেজের আঘাত খেলে ত আমার পা-ই ভেঙে যেত, আর ওর বিষে যে ঘা হত, তা পচতে পচতে সমস্ত শরীরই পচে যেত। অন্য কেউ কেউ বললেন—না, ওটা সাপ নয়, 'সাপা'। বারো বছর বয়স হলেই সাপের ডানা বেরোয়, তা দিয়ে সাপা শূন্য পথে উড়ে বেড়াতে পারে; তবে সময় সময় মাটি দিয়েও চষা খেতের ইঁটে ঝাপটাতে ঝাপটাতে চলে বটে। সাপাটার ইচ্ছে ছিল, আমাকেই পিঠে করে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে যেতে; আমি হয়ত ঐ সময় হঠাৎ হামা দিয়ে আম কুড়োচ্ছিলাম, তাই আমাকে ধরতে পারেনি, উপর দিয়ে চলে গেছে।

আমাদের 'মিঠে' আমগাছটার গোড়া থেকে ভিতর বাড়ীর পাশ দিয়ে যে মাঠেল (মাটি কেটে-নেওয়া গর্ত) আছে, তাতে মা-চাচীদের সাঁতার দিয়ে গোসল করা দেখেছি। আমিও সেই মাঠেলেই সাঁতার শিখেছি। যাহোক চোত-বোশেখ্ মাসে মাঠেলটা শুকিয়ে যেত। তখন ঝাড়-জঙ্গল থেকে অনেক সাপও এসে জুটত। বড় বড় দাঁড়াশ সাপ, বারো-তেরো হাত লম্বা। সাপ মারার বড় ওস্তাদ ছিল, পাশের লাগ্ গ্রাম বা'দুরপুর (বাহাদুরপুর)-এর দারা ফকীর ও 'কোহে' ফকীর (কফিলউদ্দীন ফকীর)। তারা নাকি সাপের মন্তর জানতো, তাই সাপ তাদের আক্রমণ করতে সাহস পেতনা। পাঁচ-ছয় হাত লম্বা লাঠি দিয়ে তাকে বহু দাঁড়াশ সাপ মারতে দেখেছি, আমাদের ঐ শুকনো মাঠেলেই।

বাড়ীর উত্তর দিকের মাঠেলের পাড় ছিল খুব খাড়া। এই মাঠেলটা ছিল বাঁশঝাড়ের মধ্যে। অগভীর বলে, অনেকসময়ই তাতে পানি থাকতো না। এর খাড়া পাড়ের ভিতরে ছিল অসংখ্য গর্ত। এই গর্তে নানারকমের পাখি বাস করত, আণ্ডাও পাড়ত। আমরা শিশুর দল কত যে পাখীর আণ্ডা বা বাচ্চা চুরি করেছি এইসব গর্ত থেকে, তার শুমার নেই। সময় সময় ওর ভিতরে সাপও থাকতো; তবু আমরা মুরব্বীদের নিষেধ না মেনে ঐসব গর্তে হানা দিয়ে লুণ্ঠন কার্য করেছি। এইগুলোই বোধহয় বাবা আদমের কাছ থেকে শেখা বিশেষ কাজ, যা ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়েদের অতিশয় প্রিয়,—ঐ কালে বিপদ-আপদের দিকে কে ভ্রূক্ষেপ করে?

www.pathagar.com

আর-একবারের কথা মনে পড়ে, তখন আমার বয়স প্রায় ১২/১৩ বছর; দারুণ বর্ষা—বাড়ীর সামনে গলি দিয়ে নৌকো চলে। অগভীর স্থানে পলো দিয়ে মাছ ধরা যায়। এখানে বলে রাখা ভাল, বাপজান অবসর সময়ে বসে বসে ভাল পলো, চারো, রাবানী, টুবো, ধিয়েড়, হোঁচা প্রভৃতি বানাতেন এবং মাছ ধরা জালও তিনি বুনতে পারতেন। তিনি পলো নিয়ে আগে আগে চললেন, আমাকে বললেন খালুই নিয়ে পিছে পিছে আসতে। বাড়ীর আঙিনা থেকে একটু দোপে (নিচে) হাঁটু পানি পর্যন্ত নামতে নামতেই আমার পায়ের নলায় একটা সাপে কামড় দিল, রক্ত বেরিয়ে গেল আমি চীৎকার করে উঠলাম, দেখলাম সাপটা হাত তিনেক লম্বা, গায়ে হলদে আর কালো বৃত্তাকার ফুটকুনি। মাছ ধরা আর হল না। আমাকে বার বাড়ীর উঠোনে ডাঙায় নিয়ে এসে পায়ে দুই-তিন জায়গায় শক্ত তেনার বাঁধ দেওয়া হল। ইতিমধ্যে খবর গেল 'কাজেম কাজী'র কাছে। ইনি গ্রামের বুড়ো নাজেম কাজীর ছেলে, সাপের বিষ নামাবার ওস্তাদ। ঐ সময় আমার নিজের মনে যে ভাব ছিল তা খুব স্পষ্ট মনে আছে : "আমি ত মরলামই; কিন্তু আমার বাপ-মায়ের কি হবে ?" আমার নিজের সংকল্প এবং বাপ-মায়েরও আশা ছিল আমি লেখাপড়া করে বড় হয়ে বড় চাকরী করব, তাতে আমাদের অনটনের সংসারে সচ্ছলতা আসবে। আমার এই নিয়তটা পূর্ণ করবার আগেই আমি এমন করে মরে গিয়ে বাপ-মায়ের আশা-ভরসা চূর্ণ করে দিলাম। হায় এ কি হল ? আশ্চর্যের বিষয় আমার নিজের 'মরণ' সম্বন্ধে কোনও কথা বা ভয়-ভীতি আদৌ আমার মনে উদয় হয়নি।...যাহোক আমার মৃত্যু তখন হয়নি। সাপের বিষ হাঁটু থেকে নামাতে নামাতে পায়ের তলা দিয়েই হোক বা দষ্টস্থানের ক্ষত দিয়েই সম্পূর্ণ নেমে গেল, এবং বিষের বক্র-গতি থেকে বুঝা গেল সাপটা ছিল "সোজা নয়" 'আড়াল বেঁকা'।

নিজের সম্বন্ধে আমার বরাবরই খুব অনুকূল ধারণা ছিল,—আমি ভাল ছেলে, শান্তশিষ্ট, কারও সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করিনে। কিন্তু মনে আছে, আমার বয়স তখন অনুমান ছয় বছর, আর আমার ছোট ভাই আতাহারের বয়স হবে প্রায় সাড়ে তিন বছর। আমার হাতে একখানি ছুরি বা ছেনি—চৈত্ পূজায় ভাল্‌কোর আড়ং থেকে কিনে দিয়েছিলেন ছোটমামু। আমি একটা ডাগর গোছের কাঁচা আম কেটে খাচ্ছি, তখন ছোট ভাই বারেবারে কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে। আমি একবার-দুইবার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম, কিন্তু আবারও এসে হাত থেকে টান দিয়ে নিতে চেষ্টা করলো। এবার আমি রেগে-মেগে দিলাম এককোপ বসিয়ে ওর হাতে। হাত কেটে রক্ত বেরোতে লাগলো। তখন আমার বড় দুঃখ হল; পাছে কেউ আমাকে মারতে আসে, তাই, তাড়াতাড়ি গিয়ে মাচার উপর রাখা একটা চালের ডোলের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম।

আর একদিন খেজুর গাছে উঠে পাকা খেজুর খাচ্ছি, আর কাঁধির থোকা থেকে ঝাঁকি দিয়ে কিছু কিছু নীচেও ফেলছি। আমার একজন খেলার সাথী, ডাক নাম রতি,—মামু বাড়ীর সম্পর্কে খালা হয়, সেগুলো কুড়িয়ে রাখছে। কথা আছে, নীচে নেমে এসে ওগুলো সমান ভাগ করে দুজনে নেব। পরে ভাগ করে দেখা গেল একটা বাঁচে। আমি বললাম, "ওটা আমার, আমি কষ্ট করে পেড়েছি"; ও-বললো, "তুই ত গাছের থেকেও কতগুলো খেয়েছিস—এটা আমার"। তাই বলেই দৌড় দিল; আমি ত পিছনে পিছনে

www.pathagar.com

ছুটে ওর চুল ধরে দুই-একটা কিল বসিয়ে দিলাম। বেশ শান্তশিষ্ট ছেলের নমুনা!

আরেকবারের কথা। সে ঘটনা ঘটে যখন আমি সেনগ্রামের মাইনর স্কুলে আপার প্রাইমারী পড়ি (১৯০৯ সাল, বয়স ১২ বছর)। বাগমারা থেকে বলরামপুর (বল্লামপুর) গ্রামের উপর দিয়ে যেতে হয়। এক ডোবার ধারে পথের উপর ঐ গ্রামের গৃহস্থ পাড়ার এক ছোকরা (বয়স ৭/৮ বছর) মলত্যাগ করছিল। দেখেই আমার ক্রোধের উদয় হল, ছোকরাটাকে ভালরকম শিক্ষা দিতে হবে; তাই ওর কাছে পৌঁছেই ওকে দিলাম এক লাথি। সঙ্গে সঙ্গেই ও গড়াতে গড়াতে আর চিল্লাতে চিল্লাতে ডোবার তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অবশ্য, ডোবাটা তখন শুকিয়ে গিয়েছিল, আর ওর তলদেশ ছিল সমতল। আমি ইতিমধ্যে দ্রুতপদে স্কুলের পথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। এরপর প্রায় মাসখানেক ধরে স্কুলে যাওয়ার সময় বলরামপুরের ভিতর দিয়ে সোজা পথে না গিয়ে, ডাঙ্গিপাড়ার কাছ দিয়ে ও খলু (কলু) পাড়ার ভিতর দিয়ে ঘুরো পথে প্রায় আধ মাইল পথ বেশী হেঁটে স্কুলে যেতাম। এই ঘটনা থেকেই আমি প্রথম বুঝতে পারি, আমার স্বভাবে একটা প্রচণ্ডতা আছে। এরপর আমি বহু চেষ্টা করে আত্মদমন করবার অভ্যাস করেছি, অপরের বিসদৃশ আচরণ উপেক্ষা করে নিজের আচরণ শুধরাতে চেষ্টা করেছি।

বাপজানের স্বভাব (আমার বালক মনের বিচারে) খুব কড়া ছিল। পান থেকে চূণ খসলেই আর রেহাই ছিল না—অমনি পিটুনি। তখনকার নীতি ছিল ছেলে-পিলের স্বভাবেই রয়েছে শয়তানী, এই শয়তানী ছাড়াতে হলে আগেই চাই পিট্টি; পরে উপরি হিসাবে, উপদেশও দেওয়া যেতে পারে।

বাল্যকালে দেখেছি, জ্যোৎস্নার রাত্রে গ্রামের গলিতে একদল (দশ-পনরো বছরের) কিশোর হাডু-ডুডু খেলতো, আর একদল (বিশ-পঁয়তিরিশ) বছরের যুবকও খেলায় রত থাকত; বিকেল বেলায় ঘরের দাওয়ায় বসে পুঁথি পাঠ চলতো, গ্রামের বহু লোক তা শুনতে আসতো। এক ধরণের পুঁথি ছিল শহীদে কারবালা, মেস্‌বাহুল ইসলাম, শাহনামা ইত্যাদি; আর এক ধরণের জঙ্গনামা, আমীর হামজা, হাতেম তাই ইত্যাদি; অন্য ধরণের জৈগুন বিবি, সোনাভান, সূর্যউজাল বিবি ইত্যাদি। আর, পুঁথির মতই জনপ্রিয় ছিল মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ-সিন্ধু। আমার পিতাও ছিলেন সুকণ্ঠ পাঠক। পুঁথির বহুলাংশ তাঁর মুখস্থ ছিল। হজরত আদম (সঃ) থেকে শুরু করে হজরত মুহম্মদ (সঃ) পর্যন্ত অনেক ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী সময় সময় পুঁথি-পুস্তক না দেখেই তিনি আউড়িয়ে যেতেন। তাতেও অনেক উপদেশ থাকতো, সেগুলোও আমি মনে রাখবার জন্য একটু বিশেষ যত্ন নিতাম।

সাত বছর বয়স পূর্ণ হবার আগে তিনি আমাকে পড়াতে বসাননি। এজন্য আমি কৃতজ্ঞভাবে তাঁর সুবুদ্ধির তারিফ করি। ঐ বয়স উত্তীর্ণ হবার পর আমার নিজের মনেই এসেছিল, আমিও কেতাব পড়বো, আদম-নূহ-ইব্রাহিম-মূসা-ঈসা-হজরত মুহম্মদ সবার বিষয়ে জানবো। সুতরাং অল্পদিনেই অ আ ক খ এবং আলিফ-বে-তে-সে, প্রভৃতি অক্ষরপরিচয়, এবং শুভঙ্করীর শতকিয়া, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া ও সহজ গুণন পর্যন্ত আয়ত্ত করে, দশ বছর বয়সেই নিম্ন প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি লাভ করলাম,—বাগমারা স্কুল থেকেই। স্কুলটা ছিল আমাদেরই বাড়ীর খানকা (বসার) ঘরের

www.pathagar.com

বারান্দায়।...একদিনের কথা মনে পড়ে, সেদিন বাপজান বাড়ীতে ছিলেন না, ঘরে একখানা 'কথামালা' পেয়ে গেলাম—তার—

"হুড় হুড় দুড় দুড় মেঘ ডাকিছে
মাঠ পথ ছেড়ে লোক বাড়ী আসিছে"
"ঘোড়ায় চড়িল আছাড় খাইল
আবার চড়িল আবার পড়িল"

—প্রভৃতি ছড়াজাতীয় কবিতা আমার এত ভাল লাগলো যে আমি নিজের শোবার ঘরে খাটের উপর বসে বইখানা শেষ করে ফেললাম। ঐ একদিন মাত্র আমি স্কুল কামাই করেছিলাম। মজার বই পড়তে পড়তে স্কুলের কথা মনেই ছিল না।....শোবার ঘরের খাটের কথা ওঠাতে আর একটা পুরোনো কথা মনে পড়ছে। আমি প্রতিদিন চেষ্টা করতাম খাটে উঠতে, পারতাম না। শোবার সময় মা আমার হাত ধরে তুলে নিতেন। এখন মনে হচ্ছে এ ঘটনা হলদে সাপ ও গোড়াই ব্রিজের সফরের পরের ঘটনা, তখন বয়স হয়ত সাড়ে তিন বা সাড়ে চার বছর ছিল। হঠাৎ একদিন খুব জোরে খাটের তখতা ধরে ওঠবার চেষ্টা করে একা একাই খাটে চড়তে পারলাম। তৎক্ষণাৎ আবার নেমে আবার উঠলাম, এইরকম চার-পাঁচবার খাটে উঠতে ও খাট থেকে নামতে পারায় আমার কি আনন্দ হয়েছিল, তা এখন পর্যন্ত স্মরণে রয়েছে। সেই দিনটা যেন আমার এক মহাসফলতার দিন!

আবার বাল্যকালের লেখা-পড়ার কথায় আসা যাক। আমার এক ছোট চাচা ছিলেন বাড়ীর নিম্ন প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত। এ সময় যোগ-বিয়োগ ও অমিশ্র গুণনের ধারণা আমার মনে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিত সাহেব কেবল একটা যোগ অঙ্ক, একটা বিয়োগ অঙ্ক, আর একটা গুণন অঙ্কের নিয়ম দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাতেই এসবের পদ্ধতি আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল, ডাক (নামতা) পড়তে পড়তে, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে ডাক পড়াতে পড়াতে আমার কুড়ির নামতা পর্যন্ত মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এরপর ভাগের পদ্ধতি আর আমাকে শেখাতে হয়নি, আমি নিজে থেকেই সে পদ্ধতি আবিষ্কার করে পণ্ডিত সাহেবকে দেখিয়ে দিলাম; উনি বল্লেন ঠিক হয়েছে, আর মনে মনে খুব খুশি হলেন।

প্রায় ৯ বছর বয়সে আমি মাস ছয়েক মামার বাড়ীতে থেকে যদুবয়রা নিম্ন প্রাইমারী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম। সেখানেও আমি ক্লাসে প্রথম ছিলাম। এক লেংড়া পণ্ডিত ছিলেন, নাম গুল মোহম্মদ,—তাঁর ছড়ির হাত ছিল প্রশস্ত। আমি তাঁর বাংলা ও অঙ্কের প্রশ্নের সর্বদা সদুত্তর দিতে পারায় তাঁর ছড়ির আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। ওদিকে বাগমারা স্কুলের থেকে আমি বৃত্তি পরীক্ষা দেব, এই মতলবে ছোট চাচা আমাকে লক্ষ্মীপুর থেকে পিত্রালয়ে নিয়ে গেলেন; কাজেই যদুবয়রা স্কুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ইতিমধ্যে কাজী আবুল হোসেন (ছোট চাচা)-এর বদলে ও-পাড়ার (কাজী আবদুল ওদুদের চাচাত ভাই) কাজী আসিরউদ্দীন সাহেব বাগমারা স্কুলের পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন। তিনিই আমাকে সঙ্গে করে নিম্ন প্রাইমারী বৃত্তি

www.pathagar.com

পরীক্ষা উপলক্ষে রাজবাড়ী নিয়ে যান। সেখানকার ইন্‌স্পেক্টিং পণ্ডিত আমার পরীক্ষা নিলেন। আমার উচ্চারণ স্পষ্ট ছিল—বাপজান নিজে আমাকে দিয়ে উচ্চারণ অভ্যাস করিয়েছিলেন, তাই সাহিত্য-পুস্তক থেকে পাঠ করতে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হয়নি। আর অঙ্কে ও মানসাঙ্কেও আমার যথেষ্ট অভ্যাস ছিল। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বলতে শুরু করলেন ১ টাকা ৫ আনা, ২ টাকা ৮ আনা...ইত্যাদি। কিন্তু আগে থেকে তিনি জানান নাই, এসব টাকা-আনার ফিরিস্তি তিনি কেন উচ্চারণ করেছেন। আমার মনে হল নিশ্চয়ই এগুলোর যোগফল জিজ্ঞাসা করবেন। তাই আমি সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে যোগ দিতে লাগলাম। এইভাবে পাঁচটা মিশ্র অঙ্ক উচ্চারণ করে শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, "যোগফল কত ?" আমি তৎক্ষণাৎ ঠিক উত্তর বলে দিলাম। উনি বললেন, "কোন্ কোন্ সংখ্যায় যোগফল অত হল তাকি তোমার মনে আছে ?" অঙ্কগুলো মনে মনে যোগ দেবার সময় মনোযোগও খুব দিতে হয়েছিল, তাই আমি বলে দিলাম অমুক অমুক পাঁচটা মিশ্র সংখ্যার যোগফল এইটা। তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম, আমি সব বিষয়ে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে পুরো ১০০ই পেয়েছিলাম। এই আমার ছাত্র জীবনের প্রথম সফলতা।

আমি রাজবাড়ীর (গোয়ালন্দ মহকুমার) মধ্যে প্রথম হয়ে মাসিক দুই টাকা করে বৃত্তি পেলাম।...

এই বৃত্তির এক বছরের চব্বিশ টাকা দিয়ে বাপজান আমার জন্য একটা দুধের গাই কিনে দিয়েছিলেন। ওটার দেখা-শোনা আমাকেও কিয়দংশ করতে হত। ঐ গরুকে ক্ষেতের আ'ল-এর উপর দিয়ে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে বেড়াতে (অর্থাৎ আ'ল খাওয়াতে) হত; সময় সময় ওর জন্য ঘাস কাটতে হত; এই ঘাস কাটার চিহ্ন এখনও আমার বাঁ হাতের কেনি আঙ্গুলে (ক'ড়ে আঙ্গুলে) রয়েছে—কাঁচির-কাটা দাগ।

এই 'দাগ'-এর কথায় মনে পড়লো, আরো দুটো দাগের কথা। শুনেছি, সাত মাসে আমার দাঁত উঠেছিল, দশ মাসে হাঁটতে শিখেছিলাম। এরমধ্যে, অবশ্যই হামাগুড়ি। মায়ের কাছে কাছে থাকাই ঐ সময় স্বাভাবিক, আর শিশুরা চঞ্চল ত হবেই। একদিন মাছ রান্না হচ্ছিল (মামাবাড়ীতে)। আমি হামাগুড়ি দিয়ে সকলের অলক্ষিতে রাঁধা মাছের গরম হাড়ির ভিতরে ডান হাত ঢুকিয়ে দিয়েই চীৎকার করে উঠেছিলাম। এখনও ডান হাতের কব্জীতে আর হাতের পাতায় আঙ্গুলের দিকে সেই পোড়ার দাগ রয়েছে। অবশ্য একথা আমার একটুও মনে নাই।

আমি কাঁচা শসা চিবিয়ে খেতে খুব ভালবাসতাম। শসা গাছের জাংলার নিচে ঘুরে ঘুরে দেখতাম কোথায় শসা আছে। আমার ছোট খালা ছিলেন আমার রক্ষী, সর্বদাই তাঁর কোলে উঠে (অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত) বেড়াতে ভালবাসতাম। একদিন শসা পাওয়া গেল না। আমি তখন হেঁসেল ঘরে বসে মাছ কোটা দেখছিলাম। হঠাৎ খালার আওয়াজ আসলো, "এই যে রে, মণি, এখানে একটা শসা।" অমনি আমি দৌড় দিয়ে শসার জাংলার দিকে যেতেই বঁটিতে কেটে গেল আমার বাঁ পায়ের পাতা, আঙুলের একটু উপরে। সে ঘায়ের ব্যথা মনে আছে, ঘা শুকিয়ে গেছে, দাগটা এখনও

www.pathagar.com

আছে। আর হঠাৎ এইভাবে ডাক দেয়াতে, আমার পা কাটার জন্য দোষী সাব্যস্ত হলেন বেচারী খালা। তিনি এখন আর বেঁচে নাই, তাঁর স্নেহের স্মৃতি, আর আমার কীর্তির জন্য তাঁর মিছে লাঞ্ছনা সওয়ার কথা আমার মনে গাঁথা রয়েছে।

আর একটা শোনা কথা। আমার বয়স তখন এক বছর; ছিলাম বাগমারায়; সেসময় আমার কলেরা হয়েছিল। এর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেছিলেন সংলগ্ন গ্রাম বাহাদুরপুরের ডাক্তার মুহম্মদ আলী মল্লিক, ডাক নাম 'মাদার মল্লিক'। শুনেছি সেইসময় আমার মা কেমন আকুল হয়ে ডাক্তারকে 'বাপ' ডেকে প্রার্থনা করেছিলেন, "আমার ছেলেটাকে ভাল করে চিকিৎসা করে এর রোগ সারিয়ে দেবেন।" আমি এখনও বেঁচে রয়েছি। মায়ের এই 'ধর্মবাপ'-এর উপকার আমার বাপ-মা দুজনেই যাবজ্জীবন স্মরণ রেখেছিলেন। বাড়ীর ভিতরেও তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল, কেবল "কাজীর বেটা বাড়ী আছেন?" এই সঙ্কেতটা দিলেই তাঁকে সসম্মানে বাড়ীর অন্দরমহলে নিয়ে এসে বারান্দায় বসানো হত। আমারও অবশ্য তেমনি অবাধ যাতায়াত ছিল ঐ মল্লিকবাড়ীতে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, এই মুহম্মদ আলী মল্লিকের চাচা পীরু মল্লিক একদিন আসলেন বাগমারা নিম্ন প্রাইমারী স্কুলে তাঁর ছেলে 'আমানত' মল্লিককে ভর্তি করিয়ে দিতে। এই বুড়োর চেহারা ছিল অতি সুন্দর, দেখেই ভক্তি হয়, এমন চেহারা। তখন আমার ছোট চাচা কাজী আবুল হোসেন, ওরফে 'হোসেন কাজী' ছিলেন স্কুলের পণ্ডিত। ছেলের ভর্তি ও বেতন ফি দেয়া হয়ে গেলে আসলো হাততখ্‌তির ব্যাপার। অর্থাৎ কলার পাতার উপরে ছেলের হাত ঘুরিয়ে ক খ গ ঘ ইত্যাদি অক্ষরের আঁচড় দিতে হবে। পীরু মল্লিক সাহেব আমাকে দেখিয়ে বললেন, "আমার ছেলে আর কারো হাতের আঁচড়া (হাতে-খড়ি) নেবে না—এই ছেলের হাতের আঁচড়া নেবে।" তাই আমাকেই 'আমানত'-এর হাতের মুষ্টিতে ধরা কলমটা ওর মুষ্টি শুদ্ধ শক্ত করে ধরে কলাপাতার উপর আঁচড় বসিয়ে ক খ গ ঘ প্রভৃতি অক্ষর লিখে দিতে হ'ল। কলমটা অবশ্য ফাউন্টেন পেন বা নিবের কলম বা ফৈড় (পালকের)-এর কলমও নয়,—কলম হল বাঁশের কঞ্চিতে সরু নোখ্ কাটা একটা সাধারণ কলম।

আমাদের কালিও কুইঙ্ক, হিরো, পাইলট-এর কালি নয় ব্লু-ব্ল্যাক বড়িও নয়—সে হলো বাঁশের শুকনো বাকলা পুড়িয়ে সেই ভস্ম একটা পাতিলের (বা চাপিনের) মধ্যে রেখে প্রথমে নাকুড় (ছোট দণ্ড) দিয়ে রীতিমত ঘুঁটে, পরে একটু শুকনো বাবলার আঠা এবং অল্প অল্প করে পানি দিয়ে বারংবার ঘুঁটে যে কালি পাওয়া যায়, সেই কাঁচা কালি। এগুলো রাখবার দোয়াত ছিল একরকম মাটির দোয়াত, যা দলিল-পত্রনবিশদের কাছে আজকালও সময় সময় দেখা যায়। আমাদের কাগজ ছিল প্রধানতঃ কলার পাতা, তবে কখনও কখনও দীর্ঘ তালপাতার কাগজও আমরা ব্যবহার করতাম। এর সুবিধা হচ্ছে; একবার লেখা হয়ে গেলে সেটা আবার গরম পানিতে ফেলে দাগ তুলে বারংবার ব্যবহার করা যায়।

এই গ্রাম্য সরল পদ্ধতিতে আমরা প্রায় বিনা খরচায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছি। হস্তলিপির দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আর অ-আ ক-খ হয়ে গেলেই আমরা পাতায় নাম

www.pathagar.com

লিখতাম, নিজের, বাপদাদার ও পাড়াপড়শীর। এরফলে আমরা অন্ততঃ নিজ গ্রামের প্রত্যেকের নাম জানতাম। এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠবার সুযোগ মিলতো। হাতের লেখা রীতিমত দেখাতে হত। অক্ষর লেখার একটু পরে সংখ্যা লেখা শতকিয়া, সওয়াইয়া, দেড়িয়া, আড়াইয়া ইত্যাদি লেখারও মক্‌শ করতে হত। এইসব অভ্যাসের ফলে হস্তাক্ষর সুন্দর হবে না কেন ? আমি আমার গ্রামের লোকের কাছে ভাল ছাত্র বলে গণ্য বটে, কিন্তু সংসারের মানুষ হিসাবে একেবারেই হস্তীমূর্খ বা গর্দভ-মার্কা। একদিন হনহন করে হাটে যাচ্ছি। মাঠে যদু কাজীর সঙ্গে দেখা। উনি জিজ্ঞাসা করলেন "কি মোতাহার! ক'নে যাও ?" আমি বললাম "হাটে যাচ্ছি"। তৎক্ষণাৎ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ কি বার ?" আমি একটু ভেবে বা হিসাব করে দেখলাম, আজতো বুধবার! আজকে তো সেনগ্রামের হাট নয়! সেদিন ছিল রঘুনন্দনপুরের হাট। পথে যদু কাজীর (যায়দ আলী কাজীর) সঙ্গে দেখা না হলে আমি সেনগ্রামের হাটে পৌছবার আগে ভুলটা টের পেতাম না। সেখান থেকে ফিরে আবার রঘুনন্দনপুরের হাট ধরা চলত কিনা সন্দেহ।

আমার দাদার কথা একটুও মনে নাই। দাদীবুড়িকে দেখেছি, তাঁর পিঠ বয়সের ভারে, আর দুর্বলতায়, কুঁজো হয়ে গিয়েছিল; তাই তিনি লাঠি ভর দিয়ে কোনওক্রমে হাঁটতেন, তাতে চেহারাটা উল্টো হ্রস্ব-ইকারের মত দেখাত। যাহোক, তাঁর কোলের কাছে বসে দুই-একটা কথা শুনেছি, তার কিছুই মনে নাই। তখন বোধ হয় আমার ছয়-সাত বছর বয়স; সমবয়সীদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড়ে সময় কাটানোর দিকেই আগ্রহ ছিল বেশী।...কিন্তু ছোট দাদীর কথা খুব মনে আছে। ইনি হোসেন পণ্ডিত সাহেবের মা। সুতরাং বাপজানের এঁরা সকলেই মুরব্বী। তাই বাপজানের কাছে মার খাওয়ার মত কিছু অপরাধ করলেই সম্ভব হলে দৌড়িয়ে ছোট দাদীর কাছে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেতাম। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাপজানকে বলতেন, "কি রে গহর (কাজী গওহরউদ্দীন) তুই নাকি আমার ছোট ভাইটাকে মারবি ? মারেক তো দেখি কেমন আস্পর্দা!" অবশ্য বাপজানের মুখে আর কথাটি নেই। আমি রক্ষা পেয়ে যেতাম।...ঐরকম আর একজন ছিলেন আমার রক্ষক। তিনি হলেন এক ফুফু, বিদু মিঞার স্ত্রী। তাঁর বাড়ীতে যেতে হলে ঘরোয়া গলি দিয়ে ধোঁড়ওয়ালা (ঝুরি-নামা) হিজল গাছের পাশ দিয়ে, আমাদের ঢুকুড়ে গাছের (ঐ আমগাছের নাম) পাশ দিয়ে তাঁর বাড়ীতে যেতে হয়। একবার ঘোর বর্ষা, ঘরোয়া গলিতে বুকপানি আর ঢুকুড়ে গাছের তলায় আমার সাঁতার পানি হয়ে গেছে। আমার বয়স তখন দশ-এগার বছর হবে। সে যাহোক, কি একটা কাজে যেন আমার অবহেলা হয়েছিল। এখানে বলা আবশ্যক আমার বারমেসে বাঁধা রুটিন ছিল—বাপজান কোথাও বাইরে গেলে তাঁর ফিরে আসবার আগেই তাঁর ওজুর জন্য কুয়ো থেকে এক বদনা পানি তুলে রাখতে হবে, আর খড়মটাও তার কাছে গোছান থাকবে, আর হুঁকোর ময়লা গরম সিকচে (লোহার সরু দণ্ড) দিয়ে পরিষ্কার করে, হুঁকোয় নতুন পানি ভরে রাখতে হত। তবে উনি বাড়ীতে না থাকলে হয়ত খেলা-ধুলা সেরে বাড়ী ফিরতে একটু দেরী হত, কিংবা একটু পরে করবো ভেবে শেষে ভুলে যেতাম। পরে অবশ্য উনি বের হওয়া মাত্রই আমি

www.pathagar.com

এইসব কাজ সেরে রাখতাম। একবার 'হুঁকোয় গুড়গুড়ি তুলে লোকে কি খায় ?' এই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে হুঁকোর ছিদ্রে মুখ দিয়ে এক চোষণ দিলাম, অমনি, বিশ্রী তামাকগন্ধী পানি মুখের ভিতর ঢুকে গেল; তৎক্ষণাৎ বমি বমি ভাব হল, মুখের পানি কুলি করে ফেলে দিলাম—আর বুঝতে পারলাম এর মধ্যে মজার কিছুই নাই। এরপর আর কোনও দিন হুঁকো-টানা বা সিগারেট-টানার কোনও প্রবৃত্তি হয়নি।...যাহোক, যা বলছিলাম তাই বলি, আমার ঐসব কোনও একটা ত্রুটি নিশ্চয়ই হয়েছিল। বাপজানের হাবভাব দেখেই বুঝলাম আজ আর রক্ষা নাই। তাই সামনে থেকে দৌড়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে সেই ফুফুর বাড়ীর দিকে সাঁতরে যেতে লাগলাম। কিন্তু দেখলাম, বাপজানও "দাঁড়া, মজাটা দেখাচ্ছি", এই বলে পিছনে পিছনে আসতে লাগলেন। আমি ঢুকুড়ে গাছের পানি ছাড়িয়ে প্রায় ফুফুর বাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি, তখন দেখতে পেলাম বাপজানও সাঁতার দিয়ে আসছেন। আমার ভাগ্য ভাল, আমি দৌড়ে গিয়ে ফুফুর আঁচলের নীচে লুকিয়ে গেলাম। ফুফু বাপজানকে ধমক দিয়ে বললেন, "তোর এ কি লচ্ছন (স্বভাব) ? দেখতো, বাপ আমার কেমন তরাশে কাঁপতেছে! এই সোনার মানিকদের সোহাগ করবি, না মারপিট করবি ? ওরা একটু দুষ্টুমিও করবে না ? যা এখনি ছেলেকে কোলে নিয়ে বাড়ী যা, খবরদার, ওর গায় হাত তুলবিনে।"

বাপজান কোনও কথাই বললেন না, আমাকে নিয়ে ফুফুদের একখানা ভেওয়ায় (কলা গাছের ভেলা) চড়ে বাড়ীতে পৌঁছলেন। আশ্চর্য হই, আগের যুগের লোকেরা মুরব্বীদের কথার কতটা বাধ্য ছিলেন। তাই বুঝি আমরাও ওঁদের কথার একান্ত বাধ্য হব, সেইটেই আশা করতেন।

আমি সর্বদা সরলভাবে সবার কথা বিশ্বাস করতাম; বোধ হয় এ অভ্যাস আমার এখনও একেবারে যায়নি। মনে আছে, ছোট দাদী তামাশা করে একদিন বললেন, "দেখ্, তুই যাকে মা বলিস, ও তোর আপন মা নয়। তোর আপন মা মরে গেছে।" আমবাগানে একটা উঁচু ঢিবি মত দেখিয়ে বললেন, "এই দেখ্, এখানে ছিল তোর মা-র কবর।" এই নিয়ে আমি যে কত কাঁদা কেঁদেছি,—আমার আপন মায়ের শোকে তার অবধি নেই। পরে অবশ্য বুঝেছি, দাদীবুড়ি আমাকে বোকা পেয়ে ধোঁকা দিয়ে তামাশা দেখতেন! ওই উঁচু জায়গাটা ছিল মির্জার ভিটে, তিনি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কিরকম জ্ঞাতি বা কুটুম ছিলেন ঠিক জানিনে। পরে শুনেছি তাঁর নাম ছিল মির্জা কলন্দর বেগ।

আমাদের খানকাঘর ছিল পাঁচ-চালা চৌরিঘর (চারকোনা), ছন দিয়ে ছাওয়া। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে একটা খেলা ছিল, এক ডাঁফ (বাঁশের আড়াআড়ি সাপোর্ট) থেকে চালের বাতা ধরে ঝুলন দিয়ে অন্য ডাঁফের উপর খাড়া হয়ে পড়া। এতে যে বিপদ ছিল না, তা নয়; কিন্তু এসব ক্ষুদ্র বিপদ কি ছেলেরা (বিশেষ করে দশ-পনর বছরের ছেলেরা) গ্রাহ্য করে ? কিন্তু এমন সব নচ্ছার কাণ্ড দেখে বড় চাচা (তখন তাঁর বয়স অন্ততঃ ৭০ বছর হবে) এলেন আমাদের তাড়া করতে। আমরা সবাই চালের বাতা ধরে ডাঁফের উপর দাঁড়ানো। তাই দেখে বড় চাচাও ডাঁফের উপর উঠবার উপক্রম করলেন, অমনি আর সবাই লাফ দিয়ে মেঝেতে পড়ে চোঁ দৌড়। কেবল

www.pathagar.com

আমিই তখনও ডাঁফের উপরেই দাঁড়িয়ে। দেখলাম, বারান্দায় একটা 'শামাজি' (চাল ছাওয়ার চোখা যন্ত্র) রাখা রয়েছে। অমনি আমার মনে একটা আইডিয়া যোগালো। বড় চাচা আমার ডাঁফে আসবার উদ্যোগ করতেই আমি লাফ দিয়ে মেঝেতে লাফিয়ে পড়েই, চাল ছাওয়ার চোখা যন্ত্র দিয়ে বড় চাচার পাছায় এক খোঁচা দিয়ে দে ছুট— পুবদিকের ঘরোয়া গলি দিয়ে ছোট দাদীদের বাড়ীর উত্তর পাশ দিয়ে সরকারি গলি পার হয়ে মাঠ দিয়ে। পিছনে পিছনে বড় চাচাও পাঁচনি (বেত) নিয়ে ধাওয়া করলেন, কিন্তু তিনি আসতে আসতে আমি রঘুনন্দনপুরের মাঠে গিয়ে পড়লাম। ব্যাপার সুবিধা নয় দেখে বড় চাচা ক্ষান্ত হয়ে ছোট দাদীদের 'গলির গাছের' (আম) ছায়ায় বিশ্রাম করে ঘরে ফিরলেন। এই 'গলির গাছের' একটু আগে থাকতেই আমাকে আড়াল-বেঁকা সাপে কামড়িয়েছিল।...সুখের বিষয়, বড় চাচা একথা নিয়ে আর তোলপাড় করেননি। মেজ চাচা, বাপজান, কিংবা ছোট চাচা কারও কাছেই তাঁর পরাজয় কাহিনী প্রকাশ করেননি। আমি কেবল ভাবি, শান্তশিষ্ট ছেলের মনে কেমন করে এইসব দুষ্টামির উদয় হয়! হয়ত এর উৎস একটা সাময়িক উত্তেজনা, অথবা এ-ই হয়ত শয়তানের কারসাজি। আর শয়তানটা বোধ হয় আমাদের দেহের বা মনের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে!

এইবার গ্রামের লোক ও সহপাঠীদের সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ করছি। আমার বয়স যখন দশ বছর, ওদুদ সাহেবের জ্ঞাতি ভাই, যাকে সবাই ইঁদুর-চোখো আবদুল বলত তার বয়স তখন চৌদ্দ বছর। আমাদের আর আবদুল ওদুদ সাহেবদের বংশ এক নয়। বাগমারার কাজীরা পার্শ্ববর্তী মলাহাবাশপুর গ্রাম থেকে এসে বাগমারায় বসবাস করছিলেন, হয়ত তিনশ' বছর আগে, এ-ছাড়া গ্রামে তখন এক মির্জা বংশ, এক মীরদাহ (মৃধা) বংশ, এক খোন্দকার বংশ ও অন্য এক 'মিঞা' বংশও ছিল। শোনা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষ নওজওয়ান 'আতাউল্লা কাজী' প্রায় দুইশ'-আড়াইশ' বছর আগে জৌনপুর থেকে বাগমারায় আসেন। আবার অন্য কেউ কেউ বলেন তিনি 'দখিনা' দেশের কাঠিপাড়া বা কাইতপাড়া থেকে এখানে আসেন। বাগমারার সম্ভ্রান্ত দীন মোহম্মদ খোন্দকার সাহেব এঁর স্বভাব-চরিত্র আর এঁর পূর্বপুরুষদের বিষয় অবগত হয়ে এঁর সঙ্গে নিজের একমাত্র কন্যার বিবাহ দেন। এঁর বংশধরগণের নাম পরম্পরা আমি শুনেছিলাম মুরব্বীদের কাছে, কিন্তু লিখে না রাখায় দুই-একটা নাম ছুট হ'য়ে গেছে। এসব এখন আর সঠিক জানবার উপায় নাই। আতাউল্লাহ্ কাজী, দানেশ কাজী, কোরেশ কাজী, নৈমুদ্দীন কাজী, গওহর কাজীর পরেই আমার নাম। আগেই বলেছি, এরমধ্যে খুব সম্ভব একটা (কি দুটো) নাম ছুট পড়েছে।

যাহোক, যা বলতে যাচ্ছিলাম সেই কথাটাই বলি। আমরা ছাত্রদল দল বেঁধে অলি-গলিতে ও বাগানে ঢুকে পাতা কাটতাম; পরে ঐ পাতাগুলো হাতের পীচ (কড়ে) আঙুল পরিমাণে চিরে একত্র করে সকলে ভাগ করে নিতাম। আমাদের মধ্যে একজনকে আমরা রাজা করেছিলাম। সে হল আমার মেজ চাচার ছেলে 'বেলায়েত'। সেই ছিল সবার বড় ও সবচেয়ে বলবান। অতএব তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা চাই। গলিতে পানি বা কাদা-হাবোড় থাকলে আমাদের মধ্যে দুইজন হাত ধরাধরি করে

www.pathagar.com

চতুর্ভুজের মত একটা চেয়ার তৈরি করতাম। সেই চেয়ারে করে, রাজাকে বয়ে নিয়ে যেতে হত। তার আদেশ মত যে বাগুয়াটা (কলাপাতা) কাটবার হুকুম হত, সেইটেই কাটতাম। পাতা কাটবার জন্য এক লম্বা কোঁটার (খোঁটার) আগা ফেড়ে তার সঙ্গে রশি দিয়ে শক্ত করে একখান কাঁচি বাঁধা হত। কাঁচির ধার থাকত উপরের দিকে,—যাতে নীচে থেকে বাগুয়ার গোড়া বরাবর কোঁটাটা ধাঁ করে উঁচু করে দিলেই বাগুয়াটা পাতাশুদ্ধ কেটে মাটিতে পড়ে যেত; তখন সেটা হত সবার এজমালি সম্পত্তি।

এই দলকে দুইভাগ করে তাদের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় কুস্তি বা মালাম বা লাঠিখেলার ব্যবস্থা থাকতো; অথবা একদল অপর দলের সঙ্গে হাডুডু খেলতো; কিংবা কাগা ধাওয়ানো খেলতো; কিংবা ব্যায়াম-ডন, প্যারালেল বার, হরাইজণ্টাল বার ইত্যাদির মহড়া হত। "বার'গুলো আমরা নিজেরাই বানাতাম, কুস্তি বা মালাম কার কার সঙ্গে হবে, সেটা ঠিক করবার ভার ছিল রাজার উপর। আমার কুস্তির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল 'আবদুল'। আগেই বলেছি সে আমার থেকে চার বছরের বড়। আমি ওর সঙ্গে পারতাম না। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমি জিতে গেলাম, ওকে ধরে আড়ার মধ্যে ফেলে দিলাম। সেই যে একবার জিতলাম, তারপর আর কোনও দিনই সে আমার সঙ্গে মালাম ধরে আর জিততে পারেনি। এর কিছুদিন পরে এক গ্রীষ্মের ছুটি বা পুজোর ছুটিতে ফতু মিঞা (কাজী আবদুল ওদুদ) আসলেন। উনি আসলে, উনিই হতেন ও পাড়ার ছেলেদের বিকল্প রাজা, আর বেলায়েত ভাই আমাদের রাজা। আবদুল আমার সঙ্গে হেরে গেছে শুনে তিনি অবাক হলেন, বিশ্বাসই করলেন না। তাই ফতু মিঞা ও বেলায়েত ভাই এর হুকুমে আবার আমাদের শক্তি পরীক্ষা হল। এবারও আমি সহজেই তাকে মাটিতে পেড়ে ফেল্লাম। তখন আমাকে (সরকারি ভাবে) আবদুলের উপর বিজয়ী বলে স্বীকৃতি দেয়া হল। সেই থেকে আবদুল আমাকে বলতো, 'পোড়া খাটে', আমি ওকে বলতাম 'ইঁদুর-চোখো'। 'খাটে' বলতে 'খাটিয়া' বা বিছানা বুঝায় না। এ হচ্ছে ঢেঁকির 'খাটে'—ধান ভানবার, চিড়ে কুটবার বা আটা কুটবার সময় 'নোটের' (গর্ত) মধ্যে রাখা ধান, চাল, আটা ইত্যাদি কুটবার (বা পিটাবার) খাটে, যা ঢেঁকির আগার দিকে পরানো থাকে। এই খাটে বাঁশেরও হতে পারে কাঠেরও হতে পারে। সচরাচর কাঠের খাটেই অধিক হয়, কারণ, পাকা কাঠের খাটে-ই বেশী মজবুত ও টেকসই হয়। এর থেকে দেখা যায়, আমার সমবয়সীদের তুলনায় শরীরে বল ছিল অধিক। স্বাস্থ্যও বেশ ভাল ছিল।

ফতুমিঞার কথা আর একটু বলা আবশ্যক। উনি শহরে থাকতেন, তাঁর মামার চাকুরিস্থলে, সেখানকার স্কুলেই পড়তেন। তিনি বয়সে আমার চেয়ে আড়াই বছরের বড় ছিলেন। ছুটির সময় বাড়ীতে এলে আমি প্রায় সর্বদাই তাঁর সাথে সাথে থাকতাম। আমিই বাগমারায় তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ছিলাম। তাঁর বাপ-মাও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ফতুমিঞা আমাকে নানারকম প্রশ্ন করে সদুত্তর পেয়ে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন; এজন্য আমাকে বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র বলে জানতেন। তিনি আমাকে দুইরকম কোর্টে 'মোগল-পাঠান' খেলা শেখান। পরে আমি তাঁর সমকক্ষ খেলোয়াড় হয়েছিলাম। এর আগে আমরা 'সাত গুটি বাঘ বন্ধ' এবং 'তিন গুটির লাইন মিল' বা

www.pathagar.com

কাটাকাটি খেলাই বেশী খেলতাম। পরবর্তীকালে আমি ওদুদ সাহেবকে ও তাঁর চাচাকে দাবা খেলা শিখিয়েছিলাম।

ফতুমিঞা সুন্দর ঘুড়ি বানাতে পারতেন। কৌড়া ঘুন্নির চেয়ে ঢাউশ ঘুন্নি উড়াতেই তিনি বেশী ভালবাসতেন। আর শহরের গল্প ও পড়াশুনার গল্প করতেন। তাই ওঁকে আমার খুব ভাল লাগতো। ফতুমিঞা পড়ুয়া ছেলে, ভাল ছেলে; কাজেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ানোতে বাপজানের বিশেষ আপত্তি ছিল না। তবে অনেকসময়ই আমাকে ঘরে না পাওয়াতে বলতেন, "বাড়ীতে কি তোর গা আঁটে না। তোকে দেখি ভাত খাস এই বাড়ীতে আর কুলি ফেলিস গিয়ে ওই বাড়ীতে।"

শোক্‌কা (সফিউদ্দিন মিঞা) ছিল বিদু মিঞার ছেলে। পড়াশুনা তার ভাল লাগতো না, পড়া না পারাতে 'হোসেন পণ্ডিতের' হাতে বেত খেতে হত। তাই তার পালানোর অভ্যাস ছিল। তাকে ধরে আনা অপর ছেলেদের একটা রুচিকর কাজ ছিল। কখনও তাকে পাওয়া যেত বাহাদুরপুরে রাজাই মণ্ডলের খড়ের পাঁজার নীচে, কখনও গাবগাছের আগডালে ঘন পাতার অন্তরালে, আবার কখনও বা বাঁশঝাড়ে কোনও বাঁশের আগায়, কখনও বা নতুন কাটা পাতকুয়ার শুকনো গর্তের মধ্যে। তাকে প্রায়ই এইসব স্থান থেকে হাতা-সাইং (চ্যাংদোলা) করে ধরে আনতে হত।

স্কুলে তার 'চৌদ্দ-পোয়া', 'নীল ডাউন', 'বেঞ্চের উপর দাঁড়ান' প্রভৃতি যাবতীয় শাস্তিই বরাদ্দ ছিল। এছাড়া মঙ্গল, নৈমে, হাতেম, কুটে, নখা, হাসেম, খোনকার, মাঙ্গন প্রমুখ অনেক খেলার সাথী ছিল। এরা আবার খেজুর গাছে চড়ে চুরি করে রসের হাঁড়ি থেকে রস খাওয়ার সাথী এবং মাঠেলে বা পদ্মা নদীর কোলে দল বেঁধে গোসল করা ও ঝাঁপানোরও সঙ্গী ছিল। আর বৃষ্টির দিনে যখন উঠোনে ছ্যাৎলা পড়ে যেত, তখন বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে আছাড় খেয়ে পড়ে সেই বেগে ছ্যাৎলার উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে কে কতদূর যেতে পারে তার প্রতিযোগিতা হত। সেসব অনুপম সুখের দিনের কথা, আজ স্বপ্নের মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

দল বেঁধে স্কুলে যাওয়ার কথাও বেশ মনে পড়ে। আমার একটা কলের ছাতা ছিল, একটা ঘোড়া টিপলেই খুলে যেতো, আর জোর করে টেনে বন্ধ করতে হতো। স্কুলে যাওয়ার সময় চৈত মাসের রোদে ইঁটে ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ছাতাটা ফুটিয়ে উঁচু করে ছেড়ে দিতাম। বাতাসে ছাতাটা ইঁটের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলতো, আমি তার পিছনে পিছনে দৌড়িয়ে ছাতাটা ধরে বন্ধ করতাম। তারপর আবার খুলে বায়ু ভরে চলন্ত ছাতাটার সাথে ঘোড় দৌড় খেলতাম। সেসব দিন কোথায় ?

খুব ভোরে উঠে আমরা সবাই চেষ্টা করতাম অন্যেরা জাগবার আগেই গাছতলা থেকে আম কিংবা তাল প্রভৃতি কুড়িয়ে আনতে। যে যা কুড়িয়ে নিতে পারতো সেটা তারই হত, সেসব ফল যার বাগানের হোক না কেন, ঝরা ফল কুড়িয়ে নেওয়ার বেলায় বাগানের মালিকদের পক্ষ থেকে কোনও রোক-টোক (রাগারাগি) ছিল না। তবে, অবশ্য তাদের লোকও ভোরে উঠেই ঝড়ে-পড়া আম, বা পেকে পড়া তাল-বেল-বরই (কুল) প্রভৃতি কুড়োতে বেরোতো। সেদিনেও তেনা দিয়ে তৈরি ব্যাট-বল খেলতাম

www.pathagar.com

বাঁশের বা কাঠের তৈরি হাতা দিয়ে; আর ফুটবল খেলতাম জাম্বুরার ফল দিয়ে। তাতেই ছিল কত আনন্দ! আর একটু বড় হলে ব্লাডারসহ চামড়ার ফুটবল কিনেও খেলা চলতো এক গ্রামের সাথে আরেক গ্রামের, এক স্কুলের সঙ্গে আর এক স্কুলের। সেদিনেও ফুটবল খেলায় হার-জিত নিয়ে এক দলের সঙ্গে অন্য দলের মারামারি বেধে যেত কিন্তু এখনকার মত এত ঘন ঘন নয়।

সেনগ্রাম মাইনর স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, নিম্ন প্রাইমারীতে বৃত্তি পাবার পরে, ১৯০৭ সালে। প্রথমদিন স্কুলে যেয়ে একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম—ক্লাসে মাষ্টার আসবার আগে ছাত্ররা সুর করে বাংলা বা ইংরেজী বইয়ের শব্দার্থ মুখস্থ করতো। যেমন—"শার্দুল মানে বাঘ", "সারমেয় মানে কুকুর" কিংবা "হারী (Hurry) মানে ত্বরা, ব্যস্ততা", "আইড্‌ল (Idle) মানে অলস, কুঁড়ে" ইত্যাদি।

আশুবাবু ছিলেন ইংরেজীর মাষ্টার, ভারি কড়া লোক। পড়া না পারলে ছাত্রের দুই আঙুলের ভিতর পেন্সিল ঢুকিয়ে চাপ দিতেন, কখনও বা স্কেল দিয়ে হাতে-মাথায়-গায় সর্বত্র আঘাত করতেন, আবার কদাচিৎ তাঁর ছাতা দিয়েও মারতেন। তিনি স্কুলে আসতেন বুজোনো ছাতাটা কাঁধের উপরে ধরে। উমাচরণ বৈরাগী বাংলা পড়াতেন। রোজ দুই পৃষ্ঠা হস্তাক্ষর দেখাতে হত; ছুটির পরদিনও, যতদিনের ছুটি ছিল, ঠিক তত পৃষ্ঠা হস্তাক্ষর দেখাতে হত। তিনি পড়াবার সময় কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ বলে যেতেন; তা লিখে নিতে হত। তার পরেরদিন ঐ শব্দগুলো মানেসুদ্ধ মুখস্থ বলতে হত।

কুবেরকৃষ্ণ কুণ্ডু ছিলেন হেড পণ্ডিত। তিনি আসতেন হাবাসপুর থেকে আড়াই মাইল পথ হেঁটে। এঁকেই আমরা সবচেয়ে বেশী ভয় করতাম। মর্নিং স্কুলই হোক, আর ডে-স্কুলই হোক, তাঁর কামাই হত না কোনও দিন। তিনি খেলা-ধুলার পক্ষপাতী ছিলেন না। স্কুল বসবার এক আধ ঘণ্টা আগেই আমরা স্কুলে উপস্থিত হয়ে স্কুলের চত্বরে হাডু-ডু খেলা করতাম, কিংবা প্রান্তস্থ বটগাছের প্রলম্বত্ত (আস্থানিক মূল) বেয়ে উপরে উঠতাম, কখনও বা তাতে ঝুলে দোল খেতাম। তবে একজন ছাত্রকে চৌকি দেবার জন্য রাখতাম, সে দেখবে কুবের কুণ্ডুর এণ্ডি আর ছাতা দেখা যাচ্ছে কিনা। সঙ্কেত পেলেই আমরা খেলা ছেড়ে, বা বটগাছের বত্ত থেকে লাফ দিয়ে পড়ে শান্ত ছেলের মত চুপ করে বা সশব্দে পড়াশুনায় রত হতাম। এঁর ছড়ি বা স্কেল কিছুই লাগত না, উপযুক্ত ক্ষেত্রে লম্বা হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ লাগাতেন মুখে বা পিঠে। ইনি অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষক ছিলেন, নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাস পণ্ডিত; তাই, শব্দের ধাতু প্রত্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা স্কুলে থাকতেই মোটামুটি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলাম।

হেডমাষ্টার ছিলেন প্রথমে হেম ঘোষ, তারপর ন্যাপা বাগচী (নেপালচন্দ্র বাগচী) এঁরাও ভাল পড়াতেন, প্যারাগ্রাফ করা আর বাক্যবিশ্লেষণ (Syntax) ভালই শিখে-ছিলাম। ন্যাপা বাগচী ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ যুবক গ্রাজুয়েট। তিনি বই দিয়ে প্রহার করতেন। সরস্বতীর প্রতীক স্বরূপ পুস্তকের আঘাতে মাথায় খানিকটা বিদ্যে ঢুকতে পারে, এই বোধহয় ছিল তাঁর বিশ্বাস।

কুবের কুণ্ডুর পরে হেডপণ্ডিত হয়ে এলেন একজন সাধু পুরুষ, নাম যাদবচন্দ্র সাহা। তিনি রাগী মানুষ ছিলেন না, মারধর করতেন না; ছাত্রদের খুব স্নেহ করতেন।

www.pathagar.com

এঁর হাতের লেখা খুব স্পষ্টও ছিল, আর আবৃত্তিও করতেন অতি উত্তম। তিনি অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছেন, সে সম্বন্ধে সময় সময় উপদেশমূলক গল্প শোনাতেন। আর পুস্তকের ভাব অনুযায়ী শ্লোক আওড়াতেন। এঁকে কেউ ভয় করতো না, সবাই ভালবাসতো। এঁর কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম তার দুই-একটা নমুনা দিচ্ছি :

(১) বহুত ভালা না বোলনা চালনা, বহুত ভালা না চুপ।
ভাটকা ভালা বোলনা চালনা, বহু কা ভালা চুপ।
বহুত ভালানা বর্ষা বাদর বহুত ভালা না ধুপ
ভেক কা ভালা বর্ষা বাদর অজকা ভালা ধুপ॥

(২) যা রাকা-শশী-শোভনা গত ঘনা সা যামিনী যামিনী,
যা সৌন্দর্য বিদগ্ধা প্রণয়িনী সা কামিনী কামিনী॥

(৩) অত্যাগসহনো বন্ধু সদৈবানুমত সুহৃদ্
একক্রিয়ং ভবেনমিত্রং সমপ্রাণঃ সখামত।

এসব শ্লোকের অর্থ বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতেন। এঁর কাছে পড়তে বড়ই ভাল লাগতো। এঁর একটা ছেলে ছিল 'জগদীশ', আর এক মেয়ে ছিল 'রতি'। স্ত্রীবিয়োগের বছর দুয়েক পরে ছেলেমেয়েকে নিয়ে কাশীধাম চলে গেলেন। এমন ধারা লোকের সঙ্গলাভ করা ভাগ্যের কথা।

আমার সহপাঠীদের মধ্যে একজন ছিল বঙ্কুবিহারী ঘোষ—সবচেয়ে লম্বা, বলবান, আর সুন্দর হাডু-ডু খেলোয়াড়। আরেকজন ছিল রাধিকামোহন ঘোষ; দেখতে সুন্দর, সর্বদা হাসিমুখ, আর দুই হাতের তর্জনী একসঙ্গে কেওড়া (আটকে) দিয়ে প্রথমে মাথার উপরে খাড়া অবস্থায় রেখে, সেখান থেকে সম্পূর্ণ পিছন দিকে নিয়ে আবার কেওড়া না ভেঙেই আবার মাথার উপর পূর্বাবস্থায় খাড়া করতে পারত। আর কোনও ছাত্রই এই কৌশল দেখাতে পারতো না। আমিও চেষ্টা করে দেখেছি, দুই হাতের আঙুলে এক বিঘত লম্বা একটা রশি বেঁধে হাত দুটো মাথার উপর থেকে পিঠের উপর এবং সেখান থেকে আমার মাথার উপর নিতে পেরেছি। অপর কেউ কেউ দুই হাতের মধ্যে চার-পাঁচ আঙুল ব্যবধান রেখে এই খেলা দেখাতে পারতো।

আরেকটা ছেলে ছিল নন্দলাল সাহা। সে ইংরেজীতে প্রথম প্রথম আমার চেয়ে ভালো ছিল, অনেক বেশী শব্দ জানতো। তাই আমি গ্রীষ্মের ছুটিতে পাঠ্য word book ইংলিশ প্রাইমারের সমুদয় শব্দ ও তার মানে আয়ত্ত করেছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে পুরো 'রাজভাষা' বইখানার সমস্ত শব্দ শিখে নিয়েছিলাম। ছুটির পরেই দেখলাম আমি ওর চেয়ে অনেক ভাল অনুবাদ বা বাংলা থেকে ইংরেজী ট্রানস্লেশন করতে পারি। আমার নিজের বুদ্ধির উপর প্রত্যয় ছিল, তাই বিশেষ চেষ্টা করেই ক্লাসে প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হওয়ার চেষ্টা করে তাতে সফল হয়েছিলাম। চতুর্থ স্ট্যাণ্ডার্ডের শেষে আমি উচ্চ

www.pathagar.com

প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার জন্য কুষ্টিয়াতে পরীক্ষা দিতে গিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক তিন টাকা হারে বৃত্তি পেয়েছিলাম।...ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠবার পর (১৯১০ সাল) সেনগ্রামের যে পাড়ায় (রাইচরণ দাস মশাইয়ের বাড়ীর কাছে) আমাদের স্কুলটা অবস্থিত ছিল, সে অঞ্চল ফরিদপুর জেলার মধ্যে গিয়ে পড়লো। কুষ্টিয়ার উকিল রাইচরণবাবু আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই মাইনর স্কুলটা স্থাপিত হয়েছিল। তিনিই বরাবর এই স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন, গবর্ণমেণ্টের থেকে স্কুলের জন্য সাহায্য যোগাড় করে দিয়েছিলেন, আর প্রতি মাসে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত সাহায্য দিতেও ত্রুটি করেননি। তিনি অপুত্রক ছিলেন, তাঁর স্কুল ও স্কুলের ছেলেপেলেরাই তাঁর সন্তানের মত ছিল। তিনি মাঝে মাঝে স্কুলের ছাত্রদের দৈ-চিঁড়ে-সন্দেশ প্রভৃতির ভোজ দিতেন। তাঁর দোতলা বাড়ী আর বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। তিনি কুষ্টিয়াতেই প্রায় সবসময় কাটাতেন, তাই পুকুরের মাছ, বাগানের আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কলা বারোভূতেই খেত, তাদের মধ্যে স্কুলের ছাত্ররাও এক 'ভূত' ছিল নিশ্চয়ই।

এইবার মনে পড়ছে একটা কথা। আশুবাবুর ক্লাসে সেদিন পাঠ্য বইয়ে The Clock বিষয়ের পাঠ ছিল। তিনি আমাদের কয়েকজনকে বললেন, রাইচরণবাবুর বাড়ী থেকে ঘড়ি দেখে আসবার জন্য। আমরা গেলাম, দেখলাম, ঘড়িটার দোলনা (পেণ্ডুলাম) দুলছে, তারপর ফিরে আসলাম। আশুবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘড়ি দেখেছ ?" আমি বললাম "হ্যাঁ"। তখন তিনি বললেন, "কয়টা বেজেছে ?" আমি বললাম "ঘড়ি তো বাজে নাই, টিক টিক করছে শুনলাম।" 'রাধিকা' কিংবা 'নন্দ'ই হবে, বললো, "দেড়টা বেজেছে।" আমি অবাক হয়ে বললাম, "দেড়টা আবার বাজে কেমন করে ?" তখন আশুবাবু হাসলেন আর ছবি এঁকে ভাল করে ঘণ্টা মিনিট ইত্যাদি বুঝিয়ে দিলেন। সেইদিন আমি ঘড়ি দেখা শিখলাম। সে যুগে পকেটে পকেটে Watch কিংবা দেওয়ালে দেওয়ালে Clock থাকতো না। তাই গরীব ছেলেরা ঘড়িতে কয়টা বাজলো তা বুঝবে কেমন করে ?

একথা জুতো সম্বন্ধেও খাটে। শুনেছি সেকালে প্রত্যেক গ্রামে মোড়লের বাড়ীতে একজোড়া চটি জুতো থাকতো। গ্রামের কারো বিয়ে-শাদী হলে বর সেই চটি বগলে করে নিয়ে যেত; বিয়ের আসরে পৌছবার খানিক আগে পথের নালা-ডোবা বা পুষ্করিণী থেকে হাত-পা ধুয়ে চটি জোড়া পরে ডুলিতেই হোক, পাল্কীতেই হোক, বা গরুর গাড়ীতেই হোক, বিয়ের মণ্ডপে গিয়ে পৌছতো।

এইবার আগের কথায় আসি। আমাদের মাইনর স্কুলটা ছিল কুমারখালী থানায়, কুষ্টিয়া মহকুমায়, নদীয়া জেলায়, প্রেসিডেন্সী ডিভিশনে। কর্তৃপক্ষ ঠিক রাখবার জন্য, স্কুলটা স্থানান্তর করবার কথা হল সেনগ্রামের হাটের কাছে—এঁরা ছিলেন স্থানীয় জমিদার। এ অঞ্চলটা তখনও নদীয়া জেলায় (বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলা এলাকায়)-ই ছিল। রাইচরণবাবুই সেক্রেটারী থাকলেন।

'নন্দ'দের বাড়ী ছিল এই নতুন স্কুলের কাছে, যে নন্দ অনেক ইংরেজী শব্দ জানতো। এখানেও নতুন পরিচয় হল, জমিদারবাবুদের ও তাদের ছেলেদের সাথে,

www.pathagar.com

আরও হাটের গোলদার ও দোকানদারদের ছেলের সঙ্গে। এরমধ্যে তারাপদ বোস, ঘোঁতোবাবু (অনিল ভুঁইয়া), ক্ষুদিরাম, নিধিরাম ও প্রফুল্ল ঘোষদের সঙ্গে, আর ব্রজগোপাল, হরিগোপাল ঠাকুরদের সাথে, আর রসিকলাল ঘোষ (গোয়ালার ছেলে) এদের সঙ্গে হল অধিক পরিচয়।

একটি লক্ষণীয় কথা এই যে, স্কুলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় নগণ্য। আমি, চাচাতো ভাই বেলায়েত এবং বলরামপুরের বাকের শেখ ছাড়া আর কোনও মুসলমান ছাত্রের কথা মনে পড়ে না। বাহাদুরপুরের আমানত মল্লিক ও জাফর শেখ, জয়কৃষ্টপুরের যদু-গছু এরা বাগমারা নিম্ন প্রাইমারী স্কুল থেকে পাস করে হাবাসপুর মাইনর স্কুলে পড়তো।

আমি সেনগ্রাম মাইনর স্কুল থেকে মধ্য-ইংরেজী বৃত্তিলাভ করেছিলাম, পরীক্ষা হয়েছিল চুয়াডাঙ্গায়। এটাও ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটা মহকুমা। এখানে তিন-চার দিন যাবৎ লিখিত ও মৌখিক উভয় প্রকার পরীক্ষাই দিতে হয়েছিল। এ কয়দিন চুয়াডাঙ্গা স্কুলের হোস্টেলে আমাদের স্থান হয়েছিল। পরীক্ষার শেষে একটা যাত্রাগানের অনুষ্ঠান হয়েছিল। বোর্ডিং-এর সবাই আমাকে এই রাত্রিটা থেকে যেতে অনুরোধ করতে লাগলো, আর বললো এটা ভূষণ দাসের যাত্রাদল। খুব ভালো, এতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। আমি দোটানায় পড়ে গেলাম। যাত্রা দেখা হালাল না হারাম এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। তবু এরা জোর করে অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়ে অবশেষে আমাকে রাজী করালো।...কি পালা ছিল স্মরণ নাই, কিন্তু একটা জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছিল, সেটা হল সখা-সখীদের গান। গানের আমি সমঝদার ছিলাম না এবং সুশৃঙ্খলার সঙ্গে নৃত্য করা—এই ব্যাপারটা আমার কাছে অতিশয় আশ্চর্যজনক মনে হল। ডাক পড়ানোর সময়েও সব ছেলের একসঙ্গে বাক্য উচ্চারণ করতে শুনেছি, কিন্তু তাতে দেখেছি—কেউ একটু আগে, কেউবা পরে ডাক বচন উচ্চারণ করে। রীতিমত তালিম দিলে মানুষ যে কেমন একযোগে শৃঙ্খলার সঙ্গে গীত গাইতে বা ড্রিল করতে পারে, তার নমুনা দেখে আমার তাক লেগে গিয়েছিল। আর আমি যাদের অনুরোধে এই পালাটা দেখতে ও শুনতে গিয়েছিলাম, তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলাম আর গান ও বাজনা যে একান্তই খারাপ, আমার এ ধারণাও কিছু শ্লথ হয়ে গিয়েছিল।

এখানেই বাল্যস্মৃতির সমাপ্তি করছি।

সাম্পান
প্রথম বর্ষ, ২য়, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা
সেপ্টেম্বর, অক্টোবর,
১৯৭০ নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৭০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা

আমার মাতৃভূমি বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে; আমার জন্মকালের কথায় বলতে গেলে, কুষ্টিয়া মহকুমার ভালুকা (ভালকো) থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে। আর আমার পিতৃভূমি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পাংশা থানার বাগমারা গ্রামে। বর্তমানেও জেলা, থানা ও গ্রামের নাম বদলায়নি; তবে পোস্ট-অফিস মেঘনার বদলে প্রথমে হাবাসপুরে গেল, তারপর বর্তমানে বাগমারাতেই পোস্ট-অফিস হয়েছে। আমার জন্মকাল ১৮৯৭ সালের ৩০শে জুলাইয়ে প্রত্যুষের কিছু পূর্বে, (শুক্রবার); বাংলা হিসাবে ১৩০৪ সনের শ্রাবণ মাসের ১৪ তারিখে। আরো স্মরণীয় যে কুষ্টিয়া তৎকালীন প্রেসিডেন্সি বিভাগে আর ফরিদপুর ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত।

১৯০৭ সালের জানুয়ারীতে পিত্রালয় বাগমারা গ্রামের নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিলাভ করি, পরীক্ষা হয়েছিল রাজবাড়ীতে (জেলা ফরিদপুর)। ১৯০৯ সালের জানুয়ারিতে নদীয়া জেলার সেনগ্রাম মাইনর স্কুল থেকে বৃত্তিসহ উচ্চ প্রাইমারি পাস করি, পরীক্ষা হয়েছিল তৎকালীন কুষ্টিয়া মহকুমা শহরে (বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা শহর)। ১৯১১ সালের জানুয়ারিতে সেনগ্রাম মাইনর ইস্কুল থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে বৃত্তিলাভ করি—পরীক্ষা হয়েছিল চুয়াডাঙ্গা মহকুমা শহরে। মাইনর স্কুলটি ১৯০৯/১০ সাল পর্যন্ত শ্রীযুক্ত রাইচরণ দাস মহাশয়ের বাড়ীর সান্নিধ্যে ছিল। তারপর সেনগ্রামের ঐ এলাকা সেটেলমেন্টের ম্যাপে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হয়ে যাওয়াতে ঐ স্কুলটি সেখান হতে সরিয়ে সেনগ্রাম হাটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য তখনও সদাশয় রাইচরণ বাবুই ঐ স্কুলের সর্বময় কর্তা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেনগ্রাম মাইনর স্কুলের দূরত্ব আমার পিত্রালয় বাগমারা থেকে প্রথমে এক মাইলের কিছু অধিক ছিল। পরে স্থানান্তরণের ফলে দূরত্ব ১ মাইলের কিছু কম হয়ে যায়।

রাইচরণ বাবুর বাড়ীর চত্বর থেকে সেনগ্রামের হাট প্রায় এক মাইল দক্ষিণে, একই গলির উপরে। বর্ষাকালে ঐ গলির পার্শ্ববর্তী খালে পদ্মানদীর পানি বয়ে যেত, আর স্থানে স্থানে গলিটাও পানির নিচে ডুবে যেতো। অধিক বর্ষা হলে গলির উপর দিয়েও নৌকা চলতো। বছর পাঁচেক আগে আমি আমার পুরাতন স্কুলের স্থানটা দেখবার জন্য রাইচরণ বাবুর বাড়ীর কাছে গিয়ে দেখি, সেই পূর্বতন স্কুলের চত্বরটার সর্বত্র জুড়ে গেছে বটের শিকড়ে। আগে ঐ গাছটা ছিল চত্বরের একদম দক্ষিণ প্রান্তে। এর লম্বা চার-পাঁচটা ঝুলন্ত ঝুরির নিম্নভাগ লাফ দিয়েই হোক বা কাঁধে কাঁধে চড়েই হোক, আমরা ছাত্রেরা শক্ত করে ঝুলন খেয়ে আমোদ করতাম, আর স্কুল ও বটগাছের মধ্যেকার ফাঁকা চত্বরে হাডু-ডুডু খেলতাম, এরপর রাইচরণ বাবুর দালান ঘরে এসে দেখলাম, দালানের চারপাশের দেওয়ালে এবং ছাদেও বটপাকুড়ের ও লম্বা লম্বা চারার

www.pathagar.com

সমারোহ। পুকুরের পানিতে শেওলা জমেছে। বাড়ীটা বিরান। দুই-চারটা পেয়ারা গাছ বেশ মোটা হয়ে গেছে। গাছের পেয়ারা এখন নির্বিঘ্নে বারোভূতে খেয়ে যায়।

রাইচরণ বাবুর উল্লেখ করবার বিশেষ হেতু এই যে, স্কুলের ছাত্রবেতনে বা গবর্ণমেন্টের দেওয়া সাহায্যে স্কুলের শিক্ষকদের বেতন দেওয়া ও স্কুলঘরের মেরামত করার খরচপত্র পোষাত না; অতিরিক্ত খরচ যা লাগতো সব রাইচরণ বাবু (স্কুলের সেক্রেটারি হিসাবে) একাই বহন করতেন। স্কুলটা সর্বদাই কুষ্টিয়া (নদীয়া) জেলার অন্তর্গত ছিল; আর রাইচরণ বাবুও কুষ্টিয়াতেই ওকালতি করে সেখানেই গৃহনির্মাণ করে অবস্থান করতেন। তাঁর সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার আছে, যথাসময়ে বলা হবে।

মাইনর স্কুলের পড়া সাঙ্গ হওয়ায় এখন কোনও উচ্চবিদ্যালয়ে পড়তে হবে। বোধহয় আমার নাড়ীর টান ছিল কুষ্টিয়ার দিকেই। মনে আছে বাল্যকালে আমি মায়ের সাথে নানাবাড়ীতেই বেশী আদর পেতাম—মা, মামু, নানী, খালা—এঁদের অজস্র স্নেহ পেতাম। বড় মামু আমাকে কুষ্টিয়ার মজমপুর গ্রামে তাঁর এক খালাতো বোনের বাড়ীতে দিয়ে আসলেন; এই খালুর নাম ছিল মীর ওসমান আলী, খালার নাম মনে নাই—বোধহয় কোনও দিন জানিও নাই। এখানে মনে পড়ছে, আমার আপন খালা যাঁর কোলে-কাঁখে আমি মানুষ হয়েছি, তাঁকে সকলে "বাজীমুন" বলে ডাকতো। তাই সহজেই তাঁর নাম জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু মায়ের নাম আমি অনেক দিন পর্যন্ত জানতে পারিনি—জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারিনি, কারণ, মা বলতেন, "ছি! মেয়েছেলের নিজের নাম বলতে নাই।" একদিন অনেক অনুনয়-বিনয় করাতে ছোট করে বলেছিলেন, "তছিরুননেছা"। দেখতে পেলাম, নামটা বলেই তিনি যেন লজ্জায় মুষড়ে পড়েছেন। অবশ্য, বর্তমানে ছেলেমেয়েদের কাছে নিজের নামপ্রকাশের ব্যাপারে ও সংস্কারটা লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাচীনকালের এই সংস্কারের কথা শুনে আজ অনেকেই হয়ত হাসবেন। তবু অতীতের কথা বলছি বলে এ তথ্য প্রকাশ করলাম।

মীরবাড়ীতে খালা-আম্মারা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম এঁদের তখন অত্যন্ত গরীব অবস্থা, নিজেদের আহারের সংস্থান করাই তাঁদের পক্ষে কঠিন, তাই আমি কয়েক মাস পরেই একটা জায়গীর জুটিয়ে নিয়ে কুষ্টিয়া স্কুলের অদূরে করিমবক্স নামক এক দয়ালু সচ্ছল গৃহস্থের বাড়ীতে তাঁর পুত্র গোলাম সোবহানের গৃহশিক্ষক রূপে অবস্থান করতে লাগলাম। এঁরা আমাকে খুব সম্মানের সাথে স্থান দিয়ে আহার ও শয্যাদির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেন। খাদ্যের মধ্যে সর্বদা দুধভাতেরও একটা অঙ্গ থাকতো। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম বাড়ীর গরু প্রচুর দুধ দেয়, তাইতেই আমি দুধ খেতে পাই; কিন্তু পরে জানতে পেরেছিলাম আমার জন্য বিশেষ করে দুধ রোজানা করা হয়েছিল। তাইতে বুঝতে পারলাম করিমবক্স সাহেবের মহানুভবতা ও অতিথিপরায়ণতার মান কত উর্ধ্বে। তাঁর বাড়ীতে পীর সাহেব আসলে তাঁকে যেমন আদর-আপ্যায়ন করতেন, এই গৃহশিক্ষকের প্রতিও তাঁর ব্যবহার তেমনি মোলায়েম ও মনোহর ছিল। বেল আমার একটা প্রিয় খাদ্য, ছেলেবেলা থেকেই। আমার এই মেজবানের বাড়ীতেও ভাল জাতের একটা বেলগাছ ছিল। এর আকার ও স্বাদ এখনও আমার স্মরণে জেগে আছে।

www.pathagar.com

কুষ্টিয়ার প্রাচীন উচ্চ বিদ্যালয়ে (বা বড়স্কুলে) পাঠকালে, সে সময়ের প্রথা অনুসারে, গবর্ণমেন্টের থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বেতন দিতে হত না। তাই বৃত্তির (মাসিক চার টাকা) টাকাতেই আমার বইপুস্তক, পেন্সিল ও খাতা-পত্রাদির খরচ বেশ চলে যেত। খুব সম্ভব, ১৯১২ সালে (বা তার কিছু আগে) কুষ্টিয়ায় 'আমিনুল ইসলাম' নামে একজন সদাশয় লোক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। তাঁর আমলেই কুষ্টিয়ার স্কুলের লাগোয়া পশ্চিমদিকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য 'ইজিকিয়েল মুসলিম হোস্টেল' স্থাপিত হয়। তিনি ঈদ-বকরীদের সময় মুসলমান ছেলেদের জন্য উক্ত হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে নিজের পকেট থেকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা দিতেন—ছাত্রদের ভোজের জন্য; আর মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে তিন-চার জন্যের থাকার খরচ ও খাবার খরচ রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। সেই সূত্রে আমি হোস্টেলে থাকবার খরচা (মাসিক দুই টাকা) আর খাবার খরচা (মাসিক পাঁচ-ছয় টাকা) রেয়াৎ পেতাম। এর বদলে এইসব ছাত্রকে বলা হয় 'মনিটর' বা সর্দারপড়ুয়া। এদের কাজ ছিল দৈনিক উপস্থিত-রেজিস্টারে হাজির-গায়েরহাজিরের খতিয়ান রাখা, আর বাবুর্চি ও অন্যান্য চাকরদের কাজকর্মের তদারক করে হোস্টেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে কিছু সাহায্য করা ও ছাত্রমহলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এই সুযোগ পেয়ে আমি কিঞ্চিদধিক এক বছর পরে করিম সাহেবের বাড়ী থেকে ইজিকিয়েল মুসলিম হোস্টেলে চলে আসলাম।

এর অল্পদিন পরেই জনাব আমিনুল ইসলাম সাহেব বদলী হয়ে যাওয়াতে তাঁর স্থলে আসলেন শ্রীযুক্ত দাশরথী দত্ত। আমি কুষ্টিয়া স্কুলের একজন ভাল ছেলে বলে পরিচিত থাকাতে দাশরথী দত্ত মশাইও আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁর এক শ্যালক চমৎকার গান গাইতে পারতেন, আর আমি তাঁর একজন নিয়মিত শ্রোতা হওয়াতে এঁর মধ্যস্থতাতেই বোধহয় দাশরথী বাবু আমাকে দীর্ঘকাল স্মরণ রেখেছিলেন। তা ছাড়া তিনিও মাঝে মাঝে আদালতের ধারের বড় রাস্তার ওপারে অফিসারদের ক্লাবে গানের আসরে আসতেন।

একটা ঘটনার কথা বলি। ১৯১৯ সালে যখন আমি ঢাকা কলেজের এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। তখন আমার অসুস্থ পিতার কাছে, আমার বি. এ. পরীক্ষার পর যে তিরিশ টাকা করে মাসিক বৃত্তি পেতাম, তা পাঠিয়ে দিয়ে আমি নিজে প্রাইভেট ট্যুশন করে যে ২০/২৫ টাকা পেতাম তাই দিয়েই নিজের হোস্টেলে খাওয়া-দাওয়ার খরচ চালাতাম। গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটির মধ্যে কলেজ বন্ধ থাকাতে সে কয় মাস কোনও-না-কোন স্কুলে শিক্ষকতা করে মাসান্তে বাড়ীতে টাকা পাঠাতাম। সে সময় দৌলতপুরের মহসিন স্কুলে চাকুরীর জন্য আমি দরখাস্ত করেছিলাম; দাশরথী বাবু তখন উক্ত স্কুলে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। যারা চাকরীর জন্য দরখাস্ত করেছে, তাদের তালিকায় আমার নাম শুনে তিনি মন্তব্য করলেন, "আমি ত এ ছেলেকে চিনি; খুব ভাল ছেলে, সে তো কলেজের প্রফেসর হওয়ার যোগ্য।" তখন একজন বললেন, "হয়ত বিজ্ঞাপন দেখে মিছেমিছি একখানা দরখাস্ত ঝেড়ে দিয়েছেন।" তখন তিনি বলিলেন, "না—তা হতে পারে না; ও নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ বিপদে পড়েছে। যা হোক, আমি একেই এই খালি পদে নিযুক্ত করলাম; কিন্তু এ আসলেই তাকে যেন খুলনায় আমার কাছে পাঠিয়ে

www.pathagar.com

দেওয়া হয়।" আমি ৫০ টাকা মাসিক বেতনে এসিস্ট্যাণ্ট টিচারের পদ গ্রহণ করে দৌলতপুর স্কুলে চাকরীতে যোগ দিলাম। শিক্ষক-মহলে দাশরথীবাবুর কথা শুনে আমি পরবর্তী রবিবারেই তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা করলাম। তিনি আমার কথা সমুদয় শুনে আমাকে উপদেশ দিলেন, "দেখ, ছুটির পরে স্কুল খুললেই ঐ একদিন উপস্থিত থেকে তুমি কাজে ইস্তফা দিয়ে ঢাকায় চলে গিয়ে নিজের অধ্যয়ন সম্পন্ন করবে আর ওদের কারও কাছে প্রকাশ করবে না যে তুমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছ। হয়ত ওরা স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটির মাইনা দিতে গোলমাল করতে পারে। তবে অবশ্য আমি তেমন গোলমাল হতে দেব না। তবু তুমি নিজেও সাবধান থেকো।" আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছিলাম।

ইতিপূর্বে রাইচরণ বাবুর মাইনর স্কুলে পড়বার সময় সেই দেশ-দরদীর কথা কিছু বলা হয়েছে—এবার কুষ্টিয়া হাই স্কুলে পড়বার সময়কার একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। কুষ্টিয়া কোর্টের দক্ষিণ দিকে যেমন অফিসারদের একটা ক্লাব ছিল, তেমনি এর উত্তর দিকেই ছিল কোর্টস্টেশন। এখানে আমিনুল ইসলাম সাহেবের সময় থেকেই দিবসের মেলগাড়ীগুলো থামতো। এখানে ছিল যেমন রেলযাত্রীর ভিড়, তেমন স্কুলের ছাত্রদের একটা ভ্রমণাগার। আমি একদিন রেলস্টেশনের স্কেল-ব্যালান্স-এর হ্যাণ্ডল ধরে নাড়াচাড়া করছিলাম, এমন সময় কেমন করে যেন হাতের থেকে লীভার-এর ওজন-কাঠিটা মাপনযন্ত্রের পেটের ভিতর ঢুকে গেল। আমি অসহায়ভাবে হতভম্ব হয়ে ওটা তুলে আবার হাতলের সঙ্গে লাগাবার চেষ্টা করছি। এমন সময় স্টেশন-মাস্টার ব্যাপার দেখে, আমাকে ঐখানেই চুপ করে বসে থাকতে বললেন। আমার একবারও মনে হল না—দৌড়ে পালিয়ে যাই। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল একটা অপরাধ যখন করে ফেলেছি, তখন আমাকে তার ফল ভোগ করতেই হবে। তাই আমি সুবোধ বালকের মত বিষণ্ন মনে চুপ করে বসে রইলাম। ঘণ্টাখানেক পরে দেখতে পেলাম রাইচরণ বাবু প্লাটফর্ম দিয়েই হেঁটে আসছেন। কাছে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "একি ? মোতাহার, তুমি এখানে অমন করে বসে কি করছো ?" আমি বললাম, "ওজনকলের কলকব্জা নাড়াচাড়া করতে এর একটা অংশ খুলে গিয়ে কলের মধ্যে ঢুকে গেছে—তাই স্টেশন-মাস্টারবাবু আমাকে এখানে বসে থাকতে বলেছেন। এখান থেকে চলে যেতে দেখলে হয়ত আমাকে ধরে নিয়ে জেলেই দেবেন।" এ-কথা শুনে রাইচরণবাবু যেন আগুন হয়ে গেলেন, স্টেশন-মাস্টারকে তিরস্কার করতে করতে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কি হয়েছে ? তোমাদের কল, তোমরাই জান কেমন করে ঠিক করতে হয়। ছেলেমানুষ ত' কলকাঠি দেখলে অমন নাড়াচাড়া করেই থাকে। সেজন্য কি ওকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নজরবন্দী করে রাখবে ? কল খারাপ হয়েছে তো মিস্ত্রী ডেকে কল সারানোই তোমার কাজ। বার-দিগর এমন করলে তোমার স্টেশনমাস্টারী ঘুচিয়ে দেব।" এই বলে আমাকে সঙ্গে করে রেলের ওপারে গিয়ে নিজের গাড়ীতে করে আমাকে তাঁর নিজের বাড়ী আমলাপাড়ায় নিয়ে খুব করে চিঁড়ে-মুড়কি, লুচি-গজা, সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়ালেন। আর বললেন, "তোমার কোনও দরকার হলেই আমার এখনে চলে এসো। তুমি যেমন করে আমার সেনগাঁর স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছ, এখানেও তেমন করে কুষ্টে

www.pathagar.com

স্কুলের নাম রাখবে। এই আমি চাই"। এরপর থেকে আমি মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যেতাম। তিনিও খুশী হয়ে আমাকে নানা উপদেশ দিতেন।

কুষ্টিয়ার একজন নামজাদা মুক্তিয়ার খোদাদাদ খাঁ সাহেব বিশেষ বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। তিনি একটা সাহায্য তহবিল (duty fund) খুলেছিলেন। সেই তহবিল থেকে গরীব ছেলেদের পরীক্ষার ফি, ভাল ছাত্রদের উৎসাহ দান ইত্যাদির অর্থ-সাহায্য দিতেন। এই সাহায্যের নাম ছিল 'করজে হাসানা' অর্থাৎ পরবর্তীকালে অবস্থা সচ্ছল হলে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চাকুরী হওয়ার পর, আমি কুষ্টিয়ায় গিয়ে তাঁকে এই টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দিয়েছিলাম। তিনি ত অবাক। বললেন, "এ পর্যন্ত কেউ ত এই 'কর্জে হাসানার' টাকা ফিরিয়ে দেয়নি ? তবে তুমি দেবে কেন ?" আমি বললাম, "গরীব লোকের ত অভাব নেই। আপনার তহবিল যাতে উজাড় হয়ে না যায়, সে জন্য যারা দারিদ্র্য ভোগ করেছে, বিশেষ করে এই ফাণ্ডের সাহায্যে উপকৃত হয়েছে, তাদেরই ত সর্বাগ্রে উচিত, সম্ভব হলে ঋণ পরিশোধ করে আরও কিছু সাহায্য করা।" আমি কর্জের ৭০ টাকার সঙ্গে আরও ২০ না ৩০ টাকা দান করেছিলাম, তা ঠিক মনে নাই।

এ পর্যন্ত কুষ্টিয়া স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। আগে বহিঃস্থ রাইচরণ বাবু, মীর ওসমান সাহেব, করিমবক্স সাহেব, আমিনুল ইসলাম সাহেব, কওসের সাহেব, দাশরথীবাবু ও খোদাদাদ মুক্তিয়ার সাহেব—এঁদের কথা বলে নিলাম। তবু অনেকের নাম স্মরণ না থাকাতে (বিশেষ করে উকিল-মুক্তার মহলে) ও থানাপাড়া, এড়োপাড়া, স্টেশনপাড়া, কারিগরপাড়া প্রভৃতি অনেক অঞ্চলের কথা বলা হলো না। অবশ্য, আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন ছাত্র ও শিক্ষক-মহলের সঙ্গে আমার যে পরিচয় সেইটেই সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোনও সন্দেহ নাই। এরই কিছুটা স্মৃতিকথা এখন লিপিবদ্ধ করতে চাই। এখনই কিছুটা স্মৃতিস্খলন হয়েছে, তাই অধিক বিলম্ব করলে আরও স্মৃতিবিলোপ হয়ে যাবে। তাই শুভাকাঙ্ক্ষীদের কথা রক্ষা করে কিছু বিবরণ দিচ্ছি।

কুষ্টিয়া স্কুলের কথা মনে হলে প্রথমেই মনে পড়ে আমার প্রিয় শিক্ষক জ্যোতীন বাবুর কথা। ওঁর পুরো নাম জ্যোতীন্দ্রমোহন রায়, বাড়ী পাবনার অন্তর্গত বর্ধিষ্ণু নগরবাড়ী গ্রামে (ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা-নদী 'যমুনা'র তীরে),—বারাণসীর সংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি যে যমুনা, সেই 'যমুনা' নয়। ওঁর নামটার বানান হয়ত বৈয়াকরণিকেরা লিখবেন—'জ্যোতিরিন্দ্র মোহন রায়'; কিন্তু আমি নাম-বিশেষ্যের বদল না করে উক্ত নামধারী যেমন লিখতেন, তেমনই লিখেছি।

আমি যখন (১৯১১ সালে) চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তখন তিনি আমাদের ভূগোল পড়াতেন। তৃতীয় শ্রেণীতে তাঁর কাছে জ্যামিতি পড়েছি; দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে পড়েছি mechanics (গতিবিজ্ঞান, স্থিতিবিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান)। চতুর্থ শ্রেণীতে আমার পানিবসন্ত হয় : সংবাদ পেয়ে আমার পিতা আমাকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য স্কুলে আসেন। আমি তখন ক্লাসেই ছিলাম। জ্যোতীনবাবু খানিকক্ষণ পড়ানো ক্ষান্ত রেখে

www.pathagar.com

আমার পিতাকে ডেকে বিশদ করে বলে দিলেন, আমার কি খাদ্য, কি অখাদ্য; কেমন করে সর্বদা মশারীর মধ্যে রেখে মশা-মাছি থেকে দূরে রাখতে হবে, ওষুধ ও মলম কেমন করে লাগাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি দেখতে পেলাম জ্যোতীনবাবুর চোখ থেকে দুই এক বিন্দু পানি ঝরে পড়ছে। বুঝলাম তিনি আমাকে কত ভালবাসেন, আমার প্রতি তাঁর কত বিশেষ স্নেহ ও যত্ন, আমার নিরাময়ের জন্য তাঁর কত উদ্বেগ!

তৃতীয় শ্রেণীতে থাকতে একদিন আমার স্কুলে আসতে একটু দেরি হয়েছে। বিকেল বেলা তিনি আমাকে হোস্টেল থেকে ডেকে পাঠালেন। ভাবলাম, আজ স্কুলে আসতে বিলম্ব হয়েছিল বলে তিরস্কার করবেন। তাই ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন "আজ তোর কাপড়টা (ধুতিখানা) একটু ভিজে ভিজে দেখলাম। তোর বুঝি আর কাপড় নাই, তাই বুঝি কাপড় শুকিয়ে নিতে দেরি হয়েছিল ?" আমি চুপ করে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম, উনি কেমন করে টের পেলেন ? এরপর উনি একটা পোঁটলা বের করে বললেন "এই নে। তোর জন্য এনেছি একখানা ধুতি, শার্ট আর গেঞ্জী।" আমি ইতস্ততঃ করাতে বললেন, "তোর লজ্জা কিসের, তোর পিতা দিলে নিতিনে ? তোদের সবাইকে ত নিজের ছেলের মতই দেখি।" এরপর আর স্নেহোপহার না নিয়ে পারা যায় ?

এই তৃতীয় শ্রেণীতে থাকতেই তিনি একদিন আমাকে বললেন, "শহর কুষ্টিয়ার ছাত্রদের মধ্যে একটা রচনা প্রতিযোগিতা হচ্ছে, তোকেও এতে যোগ দিতে হবে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রতিযোগিতায় কারা থাকবেন ?" জওয়াব পেলাম, "এই স্কুলের সব ক্লাসের ছাত্র, আর শহরের যেসব ছাত্র বর্তমানে আই. এ., বি. এ., এম. এ. ইত্যাদি পড়ছে, সেইসব ছাত্র এতে যোগ দেওয়ার অধিকারী।" আমি বললাম, "স্যার, আমি পারবো না।" কিন্তু তিনি তা শুনলেন না, বললেন, "পারিস কি না পারিস তা শুনতে চাইনে। আমি নাম দিয়েছি। তোকে লিখতেই হবে। জন্মাষ্টমীর দিনে রথখোলায় এ প্রতিযোগিতা হবে।" আমাকে বাধ্য হয়েই এতে নামতে হলো। রথখোলায় গিয়ে দেখলাম, প্রায় পঞ্চাশ জনের মত প্রতিযোগী হয়েছে। বিষয়টা ছিল, 'বর্ষাকাল'। আমি গ্রাম্য বালক, বর্ষাতে যে রকম দৃশ্য হয়, লোকেরা যেমন চলাফেলা করে, নৌকার বাইচ দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে একটা রচনা লিখলাম। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এর ফল বেরুলো—আমি প্রথম হয়েছি; অভাবনীয় ব্যাপার! এতে আমার কিছুটা আত্মপ্রত্যয় হল। হয়ত আমার মধ্যে এ গুণটা লুকিয়ে ছিল। কিন্তু জ্যোতীনবাবু এর সম্ভাব্যতা কি করে টের পেলেন! এতে যেন আমার জ্ঞানকুসুমের আর একটা পাপড়ি প্রস্ফুটিত হলো।

জ্যোতীনবাবু কেমন করে পরিচিত ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে আমাদের জ্যামিতি শিখাতেন, তার দুটো উদাহরণ দিচ্ছি।

১. একটা নদীর কিনারে একই পাড়ে দুইটি বাড়ী। এক বাড়ীতে আগুন লেগেছে; আর এক বাড়ীর ঘাটে ঘাটে নদী থেকে পানি নিয়ে আগুন নিবানো ছাড়া অন্য উপায় নাই। নদীর কোন্ স্থান থেকে পানি নিয়ে গেলে পথটা ক্ষুদ্রতম হবে ? উঃ—

www.pathagar.com

বাড়ীগুলোকে বিন্দু, আর নদীতীরকে আয়না মনে করলে আলো যে-পথে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে পৌঁছায়, সেই পথটিই ক্ষুদ্রতম পথ। কেবল প্রতুল আর আমি সঠিক সমাধান করেছিলাম।

২. কুষ্টিয়ায় একটা বেঁকী দালান আছে (না ছিল ?) গোরাই নদী থেকে একটু দূরে। দালানটা অর্ধ-বৃত্তাকার; এর অনেকগুলো কুঠুরি আছে, তার বাইরের দিকের রেখা ভিতর দিকের দেওয়াল-রেখা থেকে কিছু ছোট; পাশের দিকে সোজা দেওয়ালগুলোর রেখাগুলো অবশ্যই কেন্দ্র-মুখো। একদিন জ্যোতীনবাবু আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঁচ-ছয়টা ছাত্রকে বললেন, "তোমরা সবাই স্কেল আর কাগজ-কলম নিয়ে আমার সঙ্গে এসো। বেঁকী দালানের বৃত্তের ভিতরের দিকের আর বাইরের দিকের ব্যাসার্ধ মেপে বের করতে হবে।" এই বলে আমাদের প্রত্যেককে এক-একটা কামরায় নিয়ে গিয়ে বললেন, "এই ঘরের মধ্যে থেকেই মাপ জোখ করে তোমরা অঙ্ক সমাধান কর; আমি বাইরে থেকে দেখছি। পনর-বিশ মিনিটের মধ্যেই তোমাদের কাজ হয়ে যাওয়া উচিত। আমি ২০ মিনিটের পরে এসে দেখব, কে কে করতে পেরেছ।" অঙ্কটা আমি সমাধান করতে পেরেছিলাম, আর কেউ পারে নাই।

একবার ১৯১৪ সালে, যখন আমি কুষ্টিয়া স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, তখন একদিন তিনি টিফিনের ছুটির সময় আমাকে ডেকে বললেন, "এবার খুব ভাল একটা সার্কাস দল এসেছে। তুই যাবি দেখতে ?" আমি স্রেফ না বলে দিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, "এতে শিক্ষার বিষয় আছে। আমি তোর টিকেটও করেছি। আজ সাঁঝে আমার সঙ্গে যাবি; তোকে বুঝিয়ে দেব ইনারশিয়া (যদ্বৎতদ্ভবতা বা স্থিতিপ্রবণতা) ও সার্কুলার মোশন (বৃত্তগত) সম্বন্ধেও কিছু বুঝিয়ে দেব। তুই ত ওসব বইয়ে পড়েছিস; কিন্তু চাক্ষুস দেখলে বিষয়টা আরও স্পষ্টভাবে তোর মনে বসে যাবে।" তখন আর আমি রাজী না হয়ে পারলাম না। সময়মত তাঁর সঙ্গে গেলাম সার্কাস দেখতে। সার্কাসে দেখলাম ঘোড়সওয়ার কেমন করে ছোট ছোট গোলক ঊর্ধ্বে ছুঁড়ে দিচ্ছে আবার সেগুলো নামবার পথে ধরে ফেলছে। গোলকগুলোতে নিক্ষেপের ঊর্ধ্বগতি আর ঘোড়ার সঙ্গে অগ্রগতি রয়েছে। ঊর্ধ্বগতিটাকে মাধ্যাকর্ষণে টেনে নামাচ্ছে; ঊর্ধ্বগতির মন্দন (বা শ্লথন)-এর ফলে ক্ষয় হতে হতে শূন্য হয়ে মুহূর্তিক স্থিতাবস্থা আসার পর নিম্নমুখী স্থরণ হয়ে হাতে এসে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগতি সমতালে চলছে। এখানে দেখা যাচ্ছে ঊর্ধ্বগতি ও অগ্রগতি কেউ কারো পরওয়া না করে বা বাধা না দিয়ে একে অন্যের অন্যপক্ষভাবে চলছে। ঘোড়সওয়ারও সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে বলে তার কাছে মনে হচ্ছে বলটা শুধু উঁচু দিকে আর পক্ষে ঠিক বিপরীত দিকে চলছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোলকটির যাত্রাপথ হচ্ছে একটা পরাবলয় (বা Parabola)। দর্শকরা যারা ঘোড়ার চলনটুকুর ডানদিকে বা বামদিকে বসে আছে, তারা শুধু চলন্ত গোলার দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখবে, এর গতি তেরছা ঢিল ছুঁড়লে যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনিই দেখা যাচ্ছে। তির্যকভাবে গোলক ঊর্ধ্ব দিকে ছুঁড়ে দিলে যে গতিপথ হয়, তার নাম প্যারাবোলা। আরও বললেন, দেখ তোমরা জমির উপর দিয়ে দৌড়িয়ে যাবার সময় ঠিক খাড়াভাবে দৌড়াতে পার না, একটু সামনের দিকে ঝুঁকে দৌড়াতে হয়। বুঝিয়ে

www.pathagar.com

দিলেন "জমির একটু ঘর্ষণ (friction)-সহতা আছে বলেই আমরা চলতে পারি— অতিশয় পিচ্ছিল পথ দিয়ে দৌড়িয়ে যাওয়া দূরে থাক, হেঁটেও যাওয়া যায় না।"

আরও বুঝালেন, "ঘোড়সওয়ার যখন বক্রপথে (বৃত্তাকার পথে) দৌড়াচ্ছে, তখন বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে বেশ কিছুটা ঝুঁকে চলছে। তোমরা হয়ত রেলওয়ে ট্রেনে চড়ে যাবার সময় দেখেছ, রেলপথের বাঁকের উপর দিয়ে গাড়ী চলবার সময় গাড়ী বাঁকের কেন্দ্রের দিকে একটু ঝুঁকে যায়। এর কারণ হচ্ছে, বক্রপথে দ্রুত চলতে গেলে একটা কেন্দ্রাতিগ বলের সৃষ্টি হয়, আর সেটা রোধ করতে হলে এর বিপরীত দিকে সমপরিমাণ কেন্দ্রাতিগ বল প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। তা না করলে রেলগাড়ি লাইনচ্যুত হয়ে যেতে পারে। তাই, রেলপথের ওরূপ স্থলে কেন্দ্রের নিকটবর্তী দিকে রেলগুলো নিম্নতলে অপর দিকের সমান্তর রেলগুলো একটু উচ্চতলে বসানো হয়। এর ফলে কেন্দ্রাভিমুখী মাধ্যাকর্ষণ সম্ভাবনা কাটিয়ে ওঠা যায়।"

এইভাবে জ্যোতীনবাবু কতভাবে কতদিকে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য চিন্তা ও চেষ্টা করেছেন, তার অবধি নাই। আমার অঙ্কে বিশেষ পারদর্শিতা আছে দেখে, তিনি নিজের চেষ্টায় 'মেকানিক্সের' বই পড়ে আগের থেকেই পড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, আর হেডমাস্টারের কাছে বলেছিলেন, "মোতাহারের মত এমন ছেলেকে যদি mechanics পড়ানো না হয়, তাহলে আর কার জন্য এ বিষয় পড়ানো যাবে ?" এইভাবে যুক্তি দেখিয়ে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি কিনে কুষ্টিয়া স্কুলেই বোধহয় পূর্ববাংলায় সর্বপ্রথমে মেকানিক্স পড়ানোর আয়োজন করা হয়।

আর একটি কথা মনে পড়ছে, তিনি অনেক সময় (সম্ভবত ছাত্রদের মনে নৈতিক চিন্তার উদ্রেক করবার জন্যই) শিক্ষাবহির্ভূত প্রশ্নাদি করে আমাদের জওয়াব শুনতেন, কিন্তু নিজে কোনও মন্তব্য করতেন না। একদিন ক্লাসে প্রশ্ন তুললেন, "দেখ হিন্দু ছেলেরা সন্ধ্যা-আহ্নিক করবে, আর মুসলমান ছেলেরাও মগরিবের নামায পড়বে, এমন সময় দেখা গেল একটা বাড়ীতে আগুন লেগেছে। তখন তোমরা কে কে আগে আগুন নিবাতে যাবে, আর কে কে আগে উপাসনা সেরে নেবে ?" আমরা কেউ একদিকে আর কেউ অন্য দিকে রায় দিলাম। আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক বা নামাজের দিকেই ভোট দিয়েছিলাম। তিনি শুধু দেখলেন আর শুনলেন, কিছু বললেন না। এর বিশ-ত্রিশ বছর পর আমি একবার কুষ্টিয়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললাম, "স্যার, আপনি একসময় চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ানোর সময় আমাদের সবাইকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন, আমি এখন বুঝতে পারছি, আমি ভুল উত্তর দিয়েছিলাম"। তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি প্রশ্ন রে ?" আমি বললাম, "স্যার আমি আগে আগুন নিবাতে যাব, তারপর বাড়ীতে যেয়ে 'কাজা' নামায পড়বো।" তিনি আমার পিঠে থাপ্পড় দিয়ে বললেন, "বেশ, বেশ।"

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন তোর "গণিওমিটারের কথা মনে আছে ?" আমাকে চিন্তাকুল দেখে তিনি চট করে বললেন, "এই দ্যাখ, তোর 'গণিওমিটার' আমি কেমন হেফাজত করে রেখে দিয়েছি।" তখন মনে পড়লো, তিনি আমাদের পাঁচ-ছয় জনের প্রত্যেককেই একখানা করে কাঠের গোল তক্তা দিয়ে বলেছিলেন, "এর উপর পুরু কাগজ সেঁটে দিয়ে তার উপর সরু কলম দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম এবং প্রান্তের

www.pathagar.com

দিকে আধা ইঞ্চি চওড়া চক্রাকারে ৩৬০ ডিগ্রীর দাগ কেটে দেবে।" "বললেন, তোরটাই সবচেয়ে সুন্দর ও পরিষ্কার হয়েছিল বলে সেটা এখনও তুলে রেখেছি।"

ভারত-বিভাগ ও পাকিস্তান হবার পর এই আদর্শ শিক্ষক, জ্যোতীনবাবুকে তাঁর সাধের কুষ্টিয়া স্কুল হতে বিদায় করে দেওয়া হল। তিনি কলকাতায় চলে গেলেন। আমি কুষ্টিয়ায় মোহিনী মিল-এর মালিকদের কাছে শুনেছিলাম, তিনি কলকাতায় দক্ষিণাঞ্চলে আছেন; বর্তমানে অন্ধ হয়ে গেছেন। আমি কলকাতায় গিয়ে মোহিনী মিলের লোকদের কলকাতার আবাস খোঁজ করে বৌ-বাজার রোডে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে, জ্যোতীনবাবুর খবর জিজ্ঞাসা করলাম, আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা করলাম। তাঁরা আমাকে সঙ্গে নিয়ে জ্যোতীনবাবুর বাড়ীতে গেলেন। তিনি ভিতর-বাড়ীতে ছিলেন। ওঁরা বললেন, "আপনিই ওঁকে ডাক দিন।" আমি তাই বললাম, "স্যার, আমরা কুষ্টিয়ার লোক, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।" তিনি ভিতর থেকে বেরিয়েই বললেন, "কে তোমরা? আমি যেন মোতাহারের গলা শুনছি।" সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন, আমিও। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন, "আমার ত আর তোদের দেখবার ভাগ্য নেই। তোরা মাঝে মাঝে এসে আমার খবর নিস।" মোহিনী মিলের লোকদেরকেও এ কথাই বললেন। আমরা সবাই বুঝলাম তাঁর নিজের হাতে গড়া হিন্দুহোস্টেল ও সাধের কুষ্টিয়া স্কুল ছেড়ে এই নির্বাসনে এসে বাস করতে হচ্ছে বলে তাঁর মনে কত অভিমান, কত বেদনা! পরে জানতে পেরেছি, এই সাক্ষাতের ৩/৪ বছর পরেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন, সেই স্বর্গধামে, যেখান থেকে তিনি এসেছিলেন।

এখন স্মরণ করি আর একজন যতীনবাবুর নাম। ইনি ছিলেন হেডমাস্টার এম. এ., বি. এল., নাম যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস। ইংরেজী পড়াতেন। তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, কার কার বাড়ীতে ইংরেজী অভিধান আছে। এভাবে জানতে পারলেন আমার ডিকশনারী নাই। তিনি ঘোষণা করলেন অমুক দিনে অঙ্কের পরীক্ষা হবে। তার মধ্যে যে প্রথম হবে তাকে একখানা 'চেম্বার্স ডিকশনারী' পুরস্কার দেওয়া হবে, আর সামনের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজীতে যে প্রথম স্থান অধিকার করবে তাকে দেওয়া হবে স্কুলের তরফ থেকে একটা সোনার মেডেল। এই দুটো পুরস্কারই আমার ভাগ্যে জুটেছিল। অবশ্য শিক্ষকদেরও আগের থেকেই এর ফলাফল জানাই ছিল।

দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে হৃষীকেশ মজুমদার (সেকেণ্ড মাস্টার) আমাদের পাটিগণিত ও বীজগণিত পড়াতেন, অতি চমৎকার। তিনি কেমন পারদর্শী শিক্ষক ছিলেন তার একটা পরীক্ষা করার সুযোগ ঘটেছিল, আমার ঢাকার বাড়ীতেই। বোধ হয় ঢাকা বোর্ডের কোনও পরীক্ষা উপলক্ষে একবার তিনি ঢাকায় এসে আমাকে দেখতে এসেছিলেন। আমি এসে বললাম, "স্যার আমি আর একজনের সঙ্গে ওপরে বসে নির্জনে বোর্ডের পরীক্ষার ট্যাবুলেশন করছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হবে। আপনি ততক্ষণ আমার দুটো ছেলেকে নিয়ে একটু বসুন,—আমি কাজটা সেরেই আসছি। আজ আমার সৌভাগ্যের দিন। আপনি কিছু জলযোগ না করে যেতে পারবেন না।" আমি

www.pathagar.com

নওয়াব-নুরুকে (১ম শ্রেণী ও ৩য় শ্রেণীর ছাত্র) ওঁর কাছে বসিয়ে দিয়ে কাজে গেলাম। উনি ছেলে দুটোকে নিয়ে পড়াতে বসলেন। আমি ফিরে এসে দেখি নওয়াব-নুরু খুব খুশি। নওয়াব বীজগণিতের সমীকরণ, আর নুরু জ্যামিতির কোণ ও ত্রিভুজ শিখে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পরে আমার শিক্ষকের পদধূলি নিয়ে এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে তাঁকে বিদায় দিলাম। ছেলেদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোদের বেশ হাসি-খুশি দেখছিলাম কেন রে ?" ওরা বললো "উনি ভারি সুন্দর করে, সহজ করে আমাদের সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি যেমন করে পড়াই তেমন ?" নওয়াব বললো, "না, আরও ভাল"; নুরু বললো, "খুউব ভাল করে।" বুঝলাম, কেমন মাস্টারের কাছে আমি শিখেছি। খুশি হয়ে উঠলো মনটা; শিশুদের আনন্দিত করে শিক্ষা না দিতে পারলে কি ভাল শিক্ষক হওয়া যায় ? ওঁর তুলনায় আমি অত্যন্ত অসহিষ্ণু। তাই আমি আস্তে আস্তে অসহিষ্ণুতা ছেড়ে দিয়েছি, ওদের কাছে সব কথা সহজ করে বলতে হয়, আর বুঝে নিতে হয়, ওরা কতটুকু শিখেছে—সেখান থেকেই শুরু করতে হয়।

এইবার বলছি আমাদের পুরাতন বাঘা হেডমাস্টার শ্রীগোপাল চক্রবর্তীর কথা। তিনি ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস এম. এ.। প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন, পুলিশের দারোগা হয়ে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে চূড়ায় চড়তে। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় ঠেকে গেলেন। তিনি আমাদের বিবরণ দিয়েছে,—S.P. (সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব পুলিশ)-এর report ছিল : "He has pluck and with luck he can ride a duck. But he had a loose seat." আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন "pluck" আর "to ride a duck" এর অর্থ কি।...আর একটা কবিতা ছিল—

and he rode the ambling palfrey,

When he insisted him to ease his bottled steed.—

ইত্যাদি। এটা ব্যাকরণ ও রচনা পড়াবার সময় লাগতো। আমার ফার্স্ট ক্লাসে খানিকটা rhetoric prosody (বাক্যালঙ্কার কাব্যছন্দ)-ও পড়াতেন। তাঁর চমৎকার সুস্পষ্ট উচ্চারণে ছন্দসহকারে পড়াতেন,

"When all thy mercies O my God, my rising soul surveys

Transported with joy, I'm lost in wonder, love and praise."

পদ্যটা ছিল আমাদের পাঠ্যবই 'Lahiri's Selected Poems'-এ। ওঁকে বাঘা বলেছি এজন্য যে তিনি কখনও অন্যায় সহ্য করতেন না। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁর হাতে সর্বদা কড়া বেত থাকতো। একদিনকার একটা ঘটনা বলি : তখন থার্ড ক্লাসে পড়ি, তখনও ক্লাস আরম্ভ হওয়ার মিনিটখানেক বাকি আছে। রাস্তা দিয়ে কুমারখালির নিকটবর্তী যদুবয়রা নিবাসী একজন নীচের ক্লাসের মাস্টার (বোধ হয় থার্ড কিংবা ফোর্থ মাস্টার হবেন) রামবাবুকে স্কুলের ভিতর দিয়ে আসতে দেখে একজন ছাত্র নাকি বেশ একটু জোরেই বলে উঠেছিল, "ঐ দেখ রাস্তা দিয়ে রামা আসে।" আমি সেকথা শুনতে পাইনি, কিন্তু রামবাবুর তীক্ষ্ণ কানে সেকথা প্রবেশ করেছিল। স্কুলে ঢুকে তিনি

www.pathagar.com

হেডমাস্টারের কাছে ফরিয়াদ করেন। একথা শুনে কড়া বেত হাতে নিয়ে হেডমাস্টার আমাদের ক্লাসে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কে একজন রামবাবুকে বিদ্রূপ করে অপমানজনক কথা বলেছ, স্বীকার করো। আর কেউ যদি জেনে থাকো তবে তা প্রকাশ কর।" কিন্তু সবাই চুপ। অমনি আরম্ভ হলো শপাশপ বেত্রাঘাত, খুব কষে কষে হেডমাস্টার মশাই প্রত্যেককেই তিন বেত মারলেন। স্কুলে পড়াশুনায় গাফিলতির জন্য আমার কোনও দিন শাস্তির অভিজ্ঞতা ছিল না—এবার সে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাটা এইভাবে হলো। কিন্তু এর পরের দিন এক অভাবনীয় কাণ্ড! হেডমাস্টার মশাই আমাদের ক্লাসের সবাইকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। শ্রীগোপালবাবু ব্রাহ্ম ছিলেন, তাই তিন-চারটা গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ছেলে নিমন্ত্রণে গেল না, কিন্তু অন্য সকলের সঙ্গে আমি গেলাম। হেডমাস্টারবাবু বললেন, "দেখ, আমি জানি, তোমরা সকলে দোষী নও; দোষী কেবল একজন। এজন্য জেনো তোমাদের গায়ে বেত মারতে আমারও অত্যন্ত মনে ক্লেশ হয়েছে। কালকে তোমাদের কোনও একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিদারুণ অপরাধ করেছিলে, সেজন্য আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি; কিন্তু জেনো শৃঙ্খলাই চরিত্রের সর্বপ্রধান উপাদান, ছাত্রজীবনে চরিত্র সুগঠিত না হলে পরে আর হয় না, তাই আমাকে বাধ্য হয়েই শিক্ষকটির মুখ দেখে বিচার করতে হয়েছে। তবে একটি বিষয়ে আমি আবার খুশিও হয়েছি। সে হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যে ঐকান্তিক বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে উঠেছে তাই দেখে। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, আর জেনো, তোমাদের কৃতকর্মকে আমি আমার নিজের কুকর্ম বলেই মনে করি। তাই আমার নিজের অপরাধের জন্য জরিমানা দেওয়া উচিত, আর তোমাদেরও ঐক্যের জন্য পুরস্কৃত করা উচিত। তাই তোমরা আতিথ্য স্বীকার করে কিছু মিষ্টি মুখ করো, তাতে আমার দুঃখ কিছু লাঘব হবে।" আমরা শুনে অবাক হয়ে হেডমাস্টারের সবকথা মেনে নিয়ে ধন্য হলাম,—আর দৈ-চিঁড়ে, সন্দেশ-রসগোল্লা, সিঙ্গাড়া লুচি খেয়ে পুলকিত হয়ে ঘরে ফিরলাম। পরে আমরা জানতে পেরেছি, তিনি রামবাবুকেও তিরস্কার করেছিলেন,—"আপনি কেমন শিক্ষক ? নিজের সম্মান রক্ষা করে ছেলেদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে পারেন না ? আপনার কিছু দোষ না থাকলে ওরা আপনার প্রতি এত বিরূপ হবে কেন?" ...ইত্যাদি। এ খবরটা অবশ্য কেরানী, দপ্তরী, ঘন্টাবাদক প্রভৃতির কাছ থেকে ফাঁস হয়েছিল। তাদের কান থাকে সবদিকে।

শ্রীবীরেন মজুমদার (চক্রবর্তী) ছিলেন নিতান্ত সাদাসিধে শিক্ষক, তিনি নীচের ক্লাসে বাংলা, ইংরেজী, বিজ্ঞান ইত্যাদি পড়াতেন। তবে তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল, ফুটবল খেলা আর রেফারীগিরি করা। তিনি সর্বজনপ্রিয় অমায়িক লোক ছিলেন।

আর একজন কৃষ্ণকায়, তর্জনী (আঙ্গুল)-বাঁকা বাংলা শিক্ষক ছিলেন, কিশোরী-মোহনবাবু। ফোর্থ ক্লাসে তাঁর কাছে পড়েছি। তিনি বড় রসিক লোক ছিলেন। আবার আমাদের ক্লাসে লাবণ্যকুমার ঘোষাল বলে ততোধিক রসিক একটি ছাত্রও ছিল। যা হোক একদিন 'সীতার বনবাস' পড়াতে পড়াতে সীতার রূপ বর্ণনায় "রূপলাবণ্যবতী" কথা আসামাত্র লাবণ্য উঠে জিজ্ঞাসা করলো, "স্যার রূপ ত বুঝলাম; কিন্তু লাবণ্য ত বুঝলাম না ?" কিশোরীবাবু ত বেকায়দায় পড়ে গেলেন, কিছুতেই বুঝাতে পারলেন না,

www.pathagar.com

অবশেষে ভেবে-চিন্তে বললেন, 'লাবণ্য ত তোমারই নাম। তবে দেখ, বর্ণনা করে 'লাবণ্য' বুঝান যাবে না। তোমাদের ক্লাসে ত সুন্দর ফর্সা ছেলে রয়েছে ঢের, কিন্তু 'লাবণ্য' আছে কেবল ঐ একজনের মধ্যে"—এই বলে আমার দিকে বাঁকা অঙ্গুলিটা নির্দেশ করে দেখালেন। যা হোক, আমার মধ্যে সীতার লক্ষণ আছে শুনে গর্ববোধ করলাম যতটা, লজ্জাবোধ করলাম তার চেয়েও অধিক। তারপর মাস্টারমশাই লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বল তো তোমার নামের সাথে যে ঘোষাল আছে তার মানে কি ?" লাবণ্য তৎক্ষণাৎই জওয়াব দিল, "ঘোষাল মানে ঘোষযুক্ত, যেমন রসাল রসযুক্ত, মশাল মশাযুক্ত, বিশাল বিষযুক্ত" ইত্যাদি।

এবার আমার কয়েকজন সহপাঠী ও নিম্নতর স্নেহাস্পদ ছাত্রের সম্বন্ধে কিছু বলেই শেষ করবো। সকলের নাম মনে নাই বলে দুঃখ হচ্ছে।

হারা, গোরা, পচা, বুলি, নগেন, ইউসুফ এরা ছিল ফুটবল খেলোয়াড়। হারা (খগেন মিত্র), গোরা (বীরেন সোম) ও পচা খেলতো অগ্রবর্তী লাইনে—গোল দেওয়ায় ওস্তাদ। পেনালটি শটে ত বটেই, কর্ণার শটেও হারা ও গোরার লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। বুলি ছিল বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা, অথচ খর্বকায় ড্রিবলার, হাফব্যাক-এর খেলোয়াড় আক্রমণের সময় হারা-গোরা বা পচার কাছে বেশ সুন্দরভাবে বল এগিয়ে দিতে (Pass করতে) পারতো। বুলির ড্রিবলিং সত্যিই দর্শনযোগ্য ছিল। নগেন ছিল ব্যাক, শট করে এক ব্যাক থেকে অপর ব্যাকে (বা অন্তত ঃ হাফ ব্যাকে) বল ফেলত। এর লম্বা ঠ্যাংয়ের পরিধি ডিঙিয়ে গোল করা সহজ ছিল না। ইউসুফ ছিল বিখ্যাত গোলকীপার। একে এড়িয়ে গোল করবার শুধু একটা উপায় ছিল,—উপরের বারের ঠিক এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি নীচে বলটা নেটের গা দিয়ে চালিয়ে দেওয়া। এই ইউসুফ পরবর্তীকালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজেরও বিখ্যাত গোলকীপার বলে স্বীকৃত হয়েছিল। কথিত আছে একমাত্র 'নিমাই' ছাড়া আর কাউকে সে পরোয়া করত না। এই নিমাই-এর খেলা আমি দেখি নাই; তবে শুনেছি, তাঁর কৃতিত্বের কথা শুনে রেনউইকের সাহেব কোম্পানী তাঁকে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন। সেখানেও তাঁর শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়েছিল। কুষ্টিয়ার টাউন ক্লাবেও কয়েকজন ভাল খেলোয়াড় ছিল। এখন শুধু জটাবাবুর নাম মনে পড়ছে। কুষ্টিয়ার সঙ্গে পাকশীর ইংরেজ টীম আর চুয়াডাঙ্গা টীমের খেলা জমতো ভাল। পাকশীর টীমকে আমি একবারও জিততে দেখিনি। এঁদের শট খুব লম্বা হলেও হারা-গোরা, জটাবাবুর বার-চুম্বী শট ও বুলির ড্রিবলিং-এর সঙ্গে এঁরা পেরে ওঠেননি। চুয়াডাঙ্গার টীমকে একবার মাত্র ফুটবল খেলাকে 'হেডবলে' পরিবর্তিত করে জিততে দেখেছি। কিন্তু আমার জানিত-পক্ষে এর আগে বা পরে আর কোনও দিন হারতে দেখিনি। পরে কুষ্টিয়ার খেলোয়াড়রা শুধু 'গোল' করার সময় সুযোগ বুঝে ধনুক-শট করতেন, আর অন্য সময় মৃত্তিকাস্পর্শী শট চালিয়ে এবং উপযুক্ত 'পাস' চালিয়ে চুয়াডাঙ্গাকে হেড-বল খেলার বিশেষ সুযোগ দেন নাই।

আমি কুষ্টিয়া স্কুলে থাকা কালে আমার সহপাঠী গিরীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর উৎসাহ-উদ্যোগে ও জ্যোতীনবাবুর সহযোগিতায় টেনিস খেলা প্রচলিত হয়। সর্বপ্রথম টেনিস ক্ষেত্র ছিল কুষ্টিয়া স্কুলের পশ্চিম কোণায় রেল লাইনের দিকে (অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব

www.pathagar.com

কোণে)। গিরীনের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলাম। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে শ্যামাচরণ এবং আরও কয়েকজন মোটামুটি নিপুণ খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিল। এই সঙ্গে পচা ও বিমল বিশ্বাসের নাম করা যায়। স্কুল থেকেই ছাত্রদের জন্য র‍্যাকেট কিনে দেওয়া হত। তখন তিন টাকা চার টাকার মধ্যেই মাঝারি গোছের র‍্যাকেট কেনা যেত।

শৈলেন বোস ছিল সাহিত্যিক গোছের লোক, এবং সুগায়ক। শৈলেনই আমার কাছ থেকে সময় সময় লেখা আদায় করত। এখন বুঝতে পারি, সে লেখা বঙ্কিমী ধরণের, তখনও রাবীন্দ্রিক ধারার প্রচলন তেমন হয়নি। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও সময় সময় রবীন্দ্রনাথের রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে সুশোভন সাধুভাষায় (Chaste and elegant language-এ) পরিবর্তিত করতে বলা হতো।

বেলগাছীর চৌধুরী আতাহার হোসেন ইজিকিয়েল ইসলামিয়া হোস্টেলে আমার রুম-মেট ছিল। এঁর ছিল নবাবী চাল, দুপুররাত্রি পর্যন্ত গল্প-গুজব আর একপ্রহর বেলা পর্যন্ত নিদ্রা। তারপর হালুয়া-রুটি খাওয়া ও রুমমেটদের খাওয়ানো, প্রসাধন ও স্কুলের ক্লাসে গমন। বড় ভাল লোক, শালীন ব্যবহার, গরীব-দুঃখীর প্রতি দয়ালু।

সূর্যনগর (কালুখালি ও রাজবাড়ীর মধ্যে একটি রেলস্টেশন)-এর রাজাদের ছেলে বিমলচন্দ্র রায়কেই বলা যায় উপরোক্ত চৌধুরী সাহেবের দোসর।

ফরিদপুর জেলার কসবা মাজাইল গ্রামের ইব্রাহিম বিশ্বাসও আমার সহপাঠী। ইনি এখন একজন সুদক্ষ ডাক্তার (কলকাতার ক্যাম্পবেল হসপিটাল থেকে পাস)। ইনি খুব মুখস্থ করতে পারতেন। ম্যাট্রিকুলেশনে এঁর 'পার্শিয়ান' ছিল ঐচ্ছিক বিষয়। ইনি মোট বই-এর সবটুকুই মুখস্থ করে ফেলেছিলেন, কিন্তু কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে, আর কোথায় শেষ তা বুঝতে পারতেন না। যা হোক, মুখস্থের জোরে উতরে গিয়েছিলেন।

ফণী চট্টোপাধ্যায় নামেও আমার এক সহপাঠী ছিল। সে ইংরেজীর বিখ্যাত সাহিত্যপুস্তক অনেকগুলো পড়ে ফেলেছিল। ইংরেজীতে বেশ বক্তৃতা করতে পারতো, কিন্তু সম্যক ব্যাকরণজ্ঞান ছিল না,—তাই ইংরেজীতে ও ফার্স্ট হতে পারেনি।

এতিম আলীর সম্বন্ধে এখন কিছুই জানি না। তবে পড়বার সময় এঁর ধারণা ছিল এই যে, ইনি যে-কোনও ভাল ছেলের সমকক্ষ। যা হোক, তিনি বি.এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন। হয়ত এখনও বেঁচে আছেন।

কানাইলাল কর্মকার মাঝারি গোছের নিরীহ ছেলে। এখন কোথায় আছেন অজ্ঞাত।

সরোজ আচার্য—ইনি কুষ্টিয়া স্কুলের ড্রইং মাস্টারের ছেলে। মাঝারি গোছের ছেলে; স্বভাব ও সদ্ব্যবহারের গুণে এঁর কোনও শত্রু ছিল না।

এবার কয়েকজন তৎকালীন বিচারে যাদের ভাল ছেলে বলা হতো, তাঁদের নাম করছি :

ক. রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; যশোর জেলার 'নাকৈল' গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে, ইংরেজীতে বেশ ভাল, হস্তাক্ষর চমৎকার। এঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ছিল। ইনি পরে ট্রান্সফার নিয়ে চলে যান। পরবর্তী সংবাদ জানা যায়নি।

www.pathagar.com

খ. সুরেশ আচার্য : ইনি ক্লাসের দ্বিতীয় ছাত্র ছিলেন, যশোরের কাছে ফরিদপুরের এক গ্রামে এঁর বাড়ী। এঁর বাড়ীতেও গিয়েছি—ব্রাহ্মণ পুরোহিত বংশের ছেলে। কলকাতায় গিয়ে বি. এ. পাস করে গণৎকার হয়েছেন। এঁর লেখা একখানা কুষ্ঠিপত্র আমার কাছে ছিল। এখন হারিয়ে গিয়েছে।

গ. অবনীনাথ খাঁ : ইংরেজীতে বেশ ভাল; বক্তৃতাও করেন ভাল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক, বাসা ছিল বড় পোস্টঅফিসের একটু পশ্চিম দিকে। পরে কলকাতায় এণ্টালী অঞ্চলে এঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উপযুক্ত লোক, অবশ্য কোনও ভাল চাকুরী করছেন।

ঘ. ফণীন্দ্রনাথ রায় : এঁর পিতা ছিলেন মহকুমার জজ। আমরা যখন কুষ্টিয়ায় প্রথম শ্রেণীতে পড়ি তখন ফণীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। নাম শুনে ভয় হয়, দংশন করবে না ত ? কিন্তু যেমন সুন্দর চেহারা, তেমন আচারব্যবহার, তেমনি মিশুক ছেলে। আবার হস্তাক্ষর আমার চেয়েও সুন্দর, ইংরেজীও আমার চেয়ে সম্ভবতঃ ভাল বলেন। এজন্য আমাকে বিশেষ চেষ্টা করে ইংরেজীতেও এঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করতে হয়েছিল। এঁর আগমনে রবীন চ্যাটার্জীর শূন্যস্থান পূর্ণ হলো। ইনি ক্লাসের দ্বিতীয় ছাত্রে পরিণত হওয়াতে সুরেশ আর অবনীকে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যেতে হলো।

ফণীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে একটা কথা না বললেই নয়। আমরা কুষ্টিয়া স্কুল থেকে ২৩ জন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিই। কলকাতায় বসন্তের প্রকোপ হওয়াতে পাবনা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। পাবনা কলেজিয়েট স্কুলে আমাদের থাকার স্থান হলো। আমরা জানতাম না ওখানে কেমন মশার উপদ্রব। তাই আমরা অনেকেই মশারি সাথে নিইনি। শুধু ফণীন্দ্র মশারি এনেছিল। সবাইকে মশা কামড়াবে, আর ফণীন্দ্র মশারি খাটিয়ে নিদ্রা দেবে ? আর শুধু আমাকেই বা কেমন করে মশারির মধ্যে নেবে! তাই ফণীন্দ্র আর মশারি খাটালই না; সবার যে গতি, তারও সেই গতি হোক! এরূপ বিবেচনা কয়জনে করতে পারে ? এ অবশ্যই মহৎ চরিত্রের লক্ষণ।

আমরা দুইজনই কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম—ফণীন্দ্র আর্টস-এ আমি সায়েন্সে। ফণীন্দ্র একদিন আমাকে ডেকে নিয়ে বললো, "আমি দুটো ফাউন্টেন পেন আর বড় দুই দোয়াত কালি কিনেছি—একটা তোমার জন্য আর একটা আমার জন্য।" আমি বললাম, "আমি নিব-কলমেই লিখতেই পারি।" কিন্তু ফণীন্দ্র কিছুতেই এ যুক্তি মানবে না। তাই আমাকে বন্ধুর উপহার নিতেই হলো। এই ছিল আমাদের সম্পর্ক।

এবার আমার সহপাঠী নয়, এমন কয়েকজনের সম্বন্ধে কিছু বলেই শেষ করছি :

ক. দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী : আমার দুই ক্লাস নীচের ছাত্র। খুব সুন্দর, আমাদের ক্লাসের সুধীর (বা পচার) মতই! আর সপ্তম শ্রেণীর একটা ছাত্র, মনোমোহন ঘোষ, তার প্রায় আকর্ণ ভ্রূযুগল দেখলে সবারই নজর পড়তো তার উপর। এই তিনজনেরই অনুরাগী বহু ছাত্র ছিল! উপরোক্ত দুইজনের প্রতিই আমার হৃদয়ের আকর্ষণ ছিল; কিন্তু কোনও দিন মুখ ফুটে কাউকে বলিনি,—'আহা তুমি সুন্দর!' দূর থেকেই পুষ্পের সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হতাম—গাছ থেকে ছিঁড়ে শার্ট-কোটের বোতামে গুঁজবার সাধ হয়নি।

www.pathagar.com

তবে, সুধীরের সঙ্গে আরও অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। সুধীরের বড় ভাইয়ের একটা ছেলেকে আমি গৃহশিক্ষকরূপে প্রায় ছয়-সাত-মাস (বা তারও অধিককাল) পড়িয়েছিলাম। এমনিতেও সুধীর আমাকে সাইকেল চড়া শিখিয়েছিল, একদিন স্কুলের বিস্তীর্ণ ময়দানে প্রায় দুই ঘণ্টা পরিশ্রম করে। সুধীরদের জমিদারী ছিল হালশার কাছে। সেখান থেকেই সে ঘোড়ায় চড়া শিখেছিল। রোজ স্কুলের মাঠে খেলতে আসত ঘোড়ায় চড়ে। সময় সময় আমাকে ঘোড়ায় ওর পিছনে বসিয়ে নিয়ে সদর রাস্তায় চক্কর দিত আর কখনো বা স্কুলের ময়দানে। মোট কথা ওকে দেখে আমি খুব খুশি হতাম। এরি নাম বোধহয়, প্লাতুনিক ভালবাসা। তা নাম যাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি উপভোগ করতে পারি। এই যথেষ্ট।

দেবেনের সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা হয়েছে। আর মনোমোহনের সঙ্গে কোনও-দিন বাক্যালাপও হয়নি।

খ. মাহতাবউদ্দিন আহম্মদ (দেবেন ব্যানার্জীর সহপাঠী) : এর সুরজ্ঞান ছিল আর গলাও ছিল সুমিষ্ট। কুষ্টিয়া স্কুলের আরবী-ফার্সীর হেড-মৌলবী বাংলা বলতেন তাঁর চাটগেঁয়ে ছাঁটে, কিন্তু আরবী-ফার্সীর গজলে বেশ ভাল সুর দিতে পারতেন। প্রত্যেক বছর ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত আবৃত্তির সাথে ফার্সী আবৃত্তিও হতো। এ কাজ সম্পাদিত হতো উপরের ক্লাসে আমার দ্বারা ও নীচের ক্লাসে মাহতাবের দ্বারা। গানটি সচরাচর আল্লা-রসুলের স্তুতি; আর আবৃত্তি হতো আইন-ই-আখলাক কিংবা অন্য কোথাও থেকে উদ্ধৃত Monologue (স্বগতঃ আখ্যান) বা dialogue (কথোপকথন)। পরে মাহতাব Advocate হয়েছিল; তখনও কুষ্টিয়ার আদালতে আমার কোনও কাজ থাকলে বিনে পয়সায় করে দিত।

গ. প্রফুল্লমোহন দাসগুপ্ত : আমার চার-পাঁচ ক্লাস নীচে পড়তো প্রফুল্লমোহন দাসগুপ্ত (থানাপাড়ায় থাকতো)। আমার সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না। কিন্তু ও যখন ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে তখন আমি কুষ্টিয়ায় এসে আবিষ্কার করি ও ভারি সুন্দর গান গায়। তখন ও আমার বন্ধু-স্থানীয় হয়ে ওঠে। মনে আছে, একদিন বিকেলবেলা আমরা দুজনে পোর্ট-স্টেশনের প্লাটফরমে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম, প্লাটফরমের পশ্চিম কোণা থেকে নেমে আরেকটু দূরে একটা জাম গাছে অনেক জাম দেখা যাচ্ছে। গাছটা বেশ মোটা আর উঁচু, আর জড় থেকে পাঁচ-ছয় হাত উঁচুতে ওর প্রথম ডাল। আমরা দুজনেই গাছে চড়তে ওস্তাদ ছিলাম। তাই কষ্টেসৃষ্টে উপরে উঠে, গেলাম ক্রমে আগ-ডালে যেখানে জাম ঝুলছে। দুইজনে পাশাপাশি দুই ডালে বসে জাম খাচ্ছি আর গল্প করছি। এমন সময় হঠাৎ আকাশে মেঘ করে এলো। আমাদের গ্রাহ্য নাই। মিনিট দশেকের মধ্যে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি আর প্রবল ঝড়। কাপড়-চোপড় ভিজে আমরা হয়ে গেলাম যেন "জড়সড় ভিজে কাক গাছের মাথায়"। কিন্তু তখন আর কী আছে উপায়? গাছ পিছলে হয়ে গেছে, সড়াৎ করে পড়লেই সাবাড়; তা ছাড়া বিজলি চমকাচ্ছে, আর মেঘ ডাকছে কড়াৎ কড়াৎ। পাকা তিন কোয়ার্টার পরে বৃষ্টি থামলো, বাতাসও মন্দা হলো। তখন ভিজে-কাক দুটো সড়সড় করে উপরের ডাল থেকে নীচের ডাল পর্যন্ত

www.pathagar.com

এসে শেষ ডালের গোড়ায় এসে পড়লাম। তখন ডারউইনের থিওরীর কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আমরা সাহস করে লাফ দিয়ে নীচে পড়ে গেলাম। বেশ একটা দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা হলো। ততক্ষণে পেটের জাম সব হজম হয়ে গেছে।

এর দশ-বারো বছর পরে একজন বড় গবর্ণমেণ্ট অফিসার গটগট করে আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, প্রফুল্ল। দেখে মনটা সত্যিই প্রফুল্ল হলো, সেই জাম পাড়ার সঙ্গী। জিজ্ঞাসা করলাম,"কেমন আছ ? ফুলি কেমন আছে ? (ফুলি ওর ছোটবোনের নাম)। এখন কোথায় আছো ? কি করছো ?" ও বললো, "বৌদি কেমন আছেন ? আমি জেলা অফিসার হয়ে এসেছি ৩/৪ দিন আগে। আজ রোববার বলে আপনার আস্তানা কোথায় খোঁজ করতে করতে এসে পড়েছি। পথ চিনলে বৌ নিয়েই আসতাম। আজ বৌদি ও আপনাকে বৌ দেখাতে নিয়ে যাব বলেই এসেছি। ওয়ারীর এক বাড়ীতে উঠেছি। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন।" কিছুতেই ছাড়লো না। আমার বাসায় তখন মালেকা, সালেহা, আজিজন, সাখাওয়াত এরা থাকতো। কোনও অসুবিধা হলো না। ছোট ভাইবোনদের বাসায় রেখে আমরা দুইজন প্রফুল্লের ওখানে গেলাম। যেয়ে দেখি সত্যি ঘর-আলো-করা বৌ, তার সাত-আট মাসের একটা হামাগুড়ি-দেওয়া ছেলেও রয়েছে, যুঁই ফুলের মত ধবধবে। ফুলিকেও দেখলাম, সামান্য একটু লম্বা হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও মুখে বিষাদের চিহ্ন, মাতৃ-পিতৃহীন মেয়ের বিষণ্নতা। যা হোক বৌটা দেখে বেশ খুশি হলাম—ছিপছিপে লম্বা, সুবেশিনী, সুকেশিনী, সুহাসিনী ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগের উপযুক্তা পাত্রী। প্রফুল্লের সাথে পূর্ব-সৌহার্দ্যের বিপর্যয় হয়নি। আমি প্রত্যহ সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে যেতাম, আর ওরাও প্রতি নিশির প্রহরান্তে আমাকে অন্ততঃ যাদুঘরের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেতো। ছেলেটা থাকতো আমার কোলে, আর ওরা দুজনে যেত আমার আগে আগে। সঙ্গীতাসক্তিটাই আমার বিশেষ আকার্ষণ ছিল। প্রথম, প্রফুল্ল এখন শুধু সুগায়ক নয়, বেনারসের ওস্তাদদের কাছে থেকে রীতিমত ওস্তাদ হয়ে এসেছে। আর ঝুনু (ভবানী দাশগুপ্তা)-ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের একজন বিশিষ্ট গায়িকা। মুজাফফরপুরে ঝুনুর বাবা ডাক্তার ছিলেন; তিনি নিজেই এই কন্যাকে সঙ্গীত শিখিয়েছিলেন। আমি ঝুনু-প্রফুল্লের গান শুনে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে আওড়াতাম, কিন্তু ওদের ঢংটা আয়ত্ত করতে পারতাম না। আমার "সাঁওয়ালী সুরাতিয়া" কিংবা "আব মায় কেয়সে আওরে"—ইত্যাদির স্বল্প বিদ্যায় ওদের নাগাল পেতাম না।

এরপর আমি যতবার কলকাতায় গিয়েছি, ততবারই ওদের বাড়ীতে গিয়ে ওদের গান শুনে তৃপ্ত হয়েছি। সাধ আছে ভবিষ্যতেও কলকাতা গিয়েই ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। ফুলীর বিয়ে হয়ে গেছে—এখন সে আর বিষণ্নবদনা নয়, বেশ স্নেহমুখী।

ঘ. গোপীপদ চট্টোপাধ্যায় : গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়ের বড়ভাই হরিপদবাবু ছিলেন আমার দুই-এক ক্লাস আগের ছাত্র। আগে বলতে ভুলে গেছি, কুষ্টিয়ার হরিপদ চ্যাটার্জী ছিলেন সেণ্টারফরওয়ার্ডের প্লেয়ার। এঁর খ্যাতি হারা-গোরার চেয়েও কিঞ্চিৎ অধিক ছিল। এই সূত্রেই প্রথমে আমার গোপীপদ-র সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে অবশ্য সাহিত্য ব্যাপারেও এঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

www.pathagar.com

ড. হরগোপাল বিশ্বাস : পাঁচু বিশ্বাসের নাম আমার একটু-একটু মনে পড়ছে। ইনি বোধহয় হরগোপাল বিশ্বাস আর শচীন অধিকারীর সমসাময়িক ছাত্র। এরা দুইজন আমার সুপরিচিত; বিশেষ করে, কুষ্টিয়ার ভাল ছাত্র ছিল বলে। হরগোপালের সঙ্গে আমার কলকাতাতেও দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, ঢাকাতেও হয়েছে। এর ধারণা ছিল পি. সি. রায়ই তার সর্বোত্তম শিক্ষক। কিন্তু আমি জানি কুষ্টিয়া স্কুলের জ্যোতীন বাবুর সঙ্গে পি. সি. রায়ের অনেক ফারাক। পরে হরগোপালও নিজের মত বদলিয়ে আমার মতটাই সঙ্গত বলে মেনে নিয়েছে। আমিও পি. সি. রায়ের কেমিস্ট্রির ছাত্র। পি. সি. রায় ও জ্যোতীন বাবুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, পি. সি. রায় বর্ণ-বিচারী সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন; আর জ্যোতীন বাবুর মানসধর্ম সম্পূর্ণরূপে বর্ণাতীত, সাম্প্রদায়িকতার লেশ-শূন্য সার্বমানবিক।

এই কুষ্টিয়া শহরের অদূরে বিষাদসিন্ধুর স্বনামধন্য রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেনের বাড়ী কালীগঙ্গার নিকট লাহিনীপাড়া গ্রামে। কুষ্টিয়ারই কুমারখালী থানায় জগন্নাথপুরের কাছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রিয়নিবাস ছিল শিলাইদহ গ্রামে। এই লীলাক্ষেত্রে প্রথমে রবীন্দ্রনাথ পল্লীকবি লালন শার সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর অপরিসীম শব্দভাণ্ডার ও ভাবসমৃদ্ধি দেখে বিস্মিত হন। এই সর্বশ্রেষ্ঠ মারেফতী ও বাউল ফকিরের আস্তানা ছিল কুষ্টিয়া থেকে মাইল দুয়েক দূরে গড়ই নদীর পাড়ে ছেঁউড়ে গ্রামে, আর তাঁর দীর্ঘজীবনের প্রথমাংশ কেটেছে তাঁর জন্মভূমি ভাঁড়ারা গ্রামে। এই গ্রামগুলো সাহিত্যামোদী ও ধর্মপিপাসু লোকদের তীর্থক্ষেত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই আমি ভালবাসি কুষ্টিয়ার স্কুল, কুষ্টিয়া শহর আর কুষ্টিয়া জেলা।

আমি যে কুষ্টিয়ায় কত আনন্দে কাল কাটিয়েছি, কতজনের স্নেহপ্রীতিতে সিঞ্চিত হয়েছি তার খানিকটা পরিচয় দিয়েছি। এছাড়াও বহু হিতৈষীর নামোল্লেখ করিনি বাহুল্য-ভয়ে, আর দুঃখের সাথে স্বীকার করছি বহুজনের নামোল্লেখ করতে পারিনি বিস্মৃতির কারণে। তবু জোরের সাথেই বলতে পারি আমি কুষ্টিয়ায় অবস্থান করে যত সুখানুভব করেছি, অন্য কোনওখানেই ততটা নয়। তাই বাসনা করেছিলাম, কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে শেষ জীবনে কুষ্টিয়াতেই বাস করব। আর সেজন্য গড়ই নদীর ধারে আমার পরমাত্মীয় ও হিতৈষী জনাব কওসের উদ্দীন চৌধুরী সাহেবের কাছ থেকে প্রায় ১২ বিঘা জমি খরিদ করেছিলাম। কিন্তু পরে সেই জমির খানিকটা গবর্ণমেণ্ট অধিকার করে নিলেন, আর খানিকটা নদীতে ভেঙে গেল। তাই আমার পূর্ব-পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়েছে আর ইতিমধ্যে ঢাকাতেই যে বাড়ী তৈয়ার করেছিলাম সেখানেই অবসর-জীবন পালন করছি। আর এ অবসরও সম্পূর্ণ অবসর নয়; প্রফেসর এমেরিটাস হয়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটু সম্পর্ক এখনও রয়ে গেছে, সম্পূর্ণ বিলয় হয়নি। এটাই হয়ত বিধিদাতা বিধাতার সংকল্প ছিল, তাই এখানেই বসত করছি। তবুও এখনও সতৃষ্ণ নয়নে কুষ্টিয়ার দিকে তাকাই। আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

লোকসাহিত্য পত্রিকা
প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা,
জানুয়ারি ১৯৭৫, পৌষ ১৩৮১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার জীবন-দর্শনের অভ্যুদয় ও ক্রমবিকাশ

জীবনের প্রথম পরিচয় মাতার সাথে; দুগ্ধই যখন ছিল আমার একমাত্র খাদ্য। এরপর নানা-নানী, দাদা-দাদী, ভাই-বোন, মামা-খালা, ফুফু, চাচা-চাচী ইত্যাদির সংস্রবে এসে এঁদের চরিত্র ও আচার-ব্যবহার লক্ষ করে, অনুকরণ-বৃত্তিতে অলক্ষে নিজের চরিত্রের ভিত্তি নির্ণীত হয়। এইভাবে দেখতে পেয়েছি সকলের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রক্ষা করলে সবার ভালবাসা পাওয়া যায় এবং এই ভালবাসা বড়ই কাম্য। অতএব এঁদের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে, এঁদের মত হতে হবে।

এরপর সমবয়সী সাথীদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে গিয়ে বুঝলাম, খেলার নিয়ম রক্ষা না করলে খেলাই হয় না, নিয়ম রক্ষা করাই 'ন্যায়', আর লঙ্ঘন করাই 'অন্যায়'। এই হল জীবন-দর্শনের প্রথম ভিত্তি—অনেকটা অভ্যাসের ফলে অর্জিত হয়ে পরে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

আমি সেকেণ্ড ও ফার্স্ট ক্লাসে উঠে (কুষ্টিয়া হাইস্কুলে) একজন গণিত-শিক্ষক পেয়েছিলাম। তাঁর নাম শ্রী হৃষীকেশ মজুমদার। বেশ কড়া মানুষ, কড়ায় ক্রান্তিতে পড়া আদায় করে নিতেন, কিন্তু অন্তঃকরণটা অতি কোমল। তিনি একবার ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষক হিসাবে ঢাকায় এসে, আমার বাড়ীতে শুভাগমন করেছিলেন। আমি তখন ইউনিভার্সিটির এক পরীক্ষায় ট্যাবুলেশন শেষ করা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তাই আমার দুই পুত্র আনোয়ার আর নুরুদ্দীন-কে তাঁর কাছে রেখে আধঘণ্টার ছুটি নিয়ে কাজ শেষ করে এসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। ইতিমধ্যে তিনি ছেলে দুটোকে পড়াতে শুরু করেছিলেন। ওরা বললো, "আমরা এত ভাল করে বোঝাবার মত শিক্ষক আর পাইনি।" সত্যি! উনি সবসময় মূল কথাটা অতি সহজ করে বোঝাতে পারতেন। উনি যাওয়ার পর আমি ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আমার মাস্টারমশাই কেমন পড়ালেন ? আমার মতন ?" ওরা দুজনেই একবাক্যে বললো, "না, আপনার চেয়ে ঢের ভাল।" আমি খুব খুশি হলাম। এই সর্বপ্রথম বুঝলাম, আমি নিজের ছেলেদের কাছে ঢের বেশী আশা করি, তাই অধৈর্য হয়ে মারধর করি—এটা অন্যায়। অবশ্য আমিও বোধহয় অন্যের ছেলেদেরকে ধৈর্য ধরে ভালই পড়াই; স্পষ্ট করে ওদের বোধগম্য করতে চাই।

১৯১৫ সালে (আমার ১৭/ ১৮ বছর বয়সে) প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল আমি পূর্ববাংলা ও আসামের সম্মিলিত প্রদেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক ১৫ টাকা করে প্রাদেশিক বৃত্তি পেয়েছি। পরে মার্কশীট দেখে জানা গেল, আমি ইংরেজী দ্বিতীয় পেপারে মাত্র ৪৪ নম্বর এবং মেকানিক্স এ মাত্র ৮০ নম্বর পেয়েছি; আর অঙ্ক প্রথম পেপারে ৬৮, আর দ্বিতীয় পেপারে ৯৯ নম্বর পেয়েছি।

www.pathagar.com

জ্যোতীনবাবু বললেন, "এ অসম্ভব কথা। তোমার তো ইংরেজীতে ৭-এর কোঠায় আর মেকানিক্স-এ ১০০ নম্বর পাওয়ার কথা।" তাই, আমাকে সাথে করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর আশুতোষ মুখার্জির কাছে গিয়ে এই পেপারে পুনঃপরীক্ষার প্রার্থনা করলেন। আশুবাবু অনুসন্ধান করে জানালেন, মেকানিক্স-এর পেপার খোয়া গিয়েছে, তাই অন্যান্য সববিষয়ের গড় নিয়ে ৮০ নম্বর দেওয়া হয়েছে, আর ইংরেজীর খাতাও পুনঃপরীক্ষা করা চলবে না—যা হবার হয়ে গেছে। খুব সম্ভব, ইংরেজীর এ পেপারে, ট্যাবুলেটর 74 লিখতে 44 লিখেছিল, তাতেই নম্বর 44 হয়ে গেছে। যা হোক আমার ইংরেজীর প্রায় ৩০ নম্বর আর যন্ত্রবিজ্ঞানের ২০ নম্বর গচ্চা যাওয়াতে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশজনের মধ্যে গণ্য হয়ে সাধারণ বৃত্তি ২০ টাকা আর ভাগ্যে জুটল না। এ স্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, জ্যোতীনবাবু আমার জন্য কুষ্টিয়া স্কুলে মেকানিক্স বিষয়টা সংযোজিত করেন। হেডমাস্টার শ্রীগোপাল চক্রবর্তীকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, "এই ছেলেটা যদি চলে যায়, তবে আমি আর কার জন্য মেকানিক্স প্রবর্তন করবো ?"

শ্রীগোপাল চক্রবর্তী ছিলেন 'বাঘা' হেডমাস্টার, ইংরেজীতে সুদক্ষ এম এ।[১] ...তিনি চমৎকার পড়াতেন, সপ্তাহে একবার করে পরীক্ষা নিতেন, আর আমাদের ক্লাশের ৩০ জন ছেলের খাতাই বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের ইংরেজীর ভুলগুলো কেটে দিয়ে লাল কালি দিয়ে শুদ্ধ করে দিতেন। তাই কিছুদিন পরেই আমাদের প্রায় সকলেরই ইংরেজীতে ব্যাকরণের দোষ হতো না। সেরা ৪/৫ জনের খাতায় Idiom বা ইংরেজী বাগ-রীতির ভুলও শুদ্ধ করে দিতেন। এতটা পরিশ্রম স্বীকার করে এমন নিয়মিতভাবে ছাত্রদের খাতা শুদ্ধ করে দেওয়ার দৃষ্টান্ত এখন আর দেখা যায় না। এঁকে আমরা 'বাঘা' উপধি দিয়েছিলাম।[২]

এবার নবযৌবনারম্ভে কলেজীয় শিক্ষা ও শিক্ষকবর্গের ও সহপাঠীদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে।

আমি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এস সি. ক্লাসে ভর্তি হই। সেখানে ইংরেজী পড়াতেন স্টারলিং (Sterling) সাহেব আর শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ। সাহেব পড়াতেন Coverley Papers—বিখ্যাত Johnson[৩]-এর লেখা থেকে সংকলিত গদ্যপুস্তক। তিনি ক্লাসে রোজ ১ঘণ্টার মধ্যে ১০/১২ পৃষ্ঠা শুধু পড়ে যেতেন, আমরা মন দিয়ে শুনতাম। পড়ানোর ঢং এমন, তাই শুনেই ভাবার্থটা মনের ভিতর বসে যায়—অবশ্য মাঝে মাঝে দুই-একটা কঠিন শব্দের মানে বলে দিতেন। তাঁর পঠন-প্রণালী থেকেই শিখেছি কোন্ বাক্যের কোন্ অংশটুকু এক নিঃশ্বাসে পড়ে যেতে হয়, আর কোথায় কোথায় একটু থেমে যেতে হয়, কোথায় স্বর একটু উচ্চ বা নিম্ন করতে হয়। মোট কথা, মনে হত আমরা যেন ইংরেজী নাটকপাঠ শুনছি। ডাঃ ঘোষ পড়াতেন গদ্য। Wordsworth, Cowper, Shakespeare, Shelley ইত্যাদির রচনায় কোথায় কোনমাত্রা এবং তালের কি রকম বিশ্লেষণ হচ্ছে ইত্যাদি। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসেও শ্রীগোপাল চক্রবর্তীর কাছে আমার কতটুকু মাত্রাজ্ঞান হয়েছিল; এখন ডঃ ঘোষের কাছে বিস্তারিত পাঠ পেয়ে খুব উপকার পেয়েছি—আর ভালও লাগতো।

www.pathagar.com

গণিত পড়াতেন প্রফেসর সারদাপ্রসন্ন দাস। দৈবক্রমে নিম্নপ্রাইমারীতে গণিতবিনোদ থেকে শুরু করে আই. এস. সি. পর্যন্ত সব ক্লাসেই সারদাপ্রসন্ন দাসের অঙ্ক পুস্তকই পড়েছি। এখন সৌভাগ্যক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসেও তাঁর Modern Arithmetic-এ দশমিক, পৌনঃপুনিক, অবিরত ভগ্নাংশ ইত্যাদির ব্যাখ্যা আমার খুব ভাল লাগতো। তাঁর বক্তৃতার ধরণ দেখে বুঝতে পারলাম, ইনি ভাল ছেলেদের জন্য বেশ ভাল, কিন্তু মাঝারি গোছের বা ক্ষীণবুদ্ধি ছাত্রদের পক্ষে তেমন উপযোগী নন। তিনি ক্লাসে এসেই, কোন কথাবার্তা নেই—বোর্ডের দিকে তাকিয়ে গোটা চার-পাঁচ প্রশ্ন লিখে দিতেন এবং মুখেও আউড়ে যেতেন; আবার Conic Section জাতীয় ব্যাপার হলে চট্ করে বোর্ডে একটা চিত্র এঁকে A B C D E F G ইত্যাদি বিন্দুর নাম লিখে দিয়েই, বোর্ডটা পিছনে রেখে ছেলেদের দিকে মুখ করে বলতেন, "take down" অঙ্ক হলে হুড়হুড় করে সম্পূর্ণ অঙ্কটা কষতে যা যা লিখতে হবে সব বলে যেতেন। কেউ সঙ্গে সঙ্গে লিখে গেল, কিন্তু অনেকেই অত তাড়াতাড়ি লিখতে পারতো না, বোঝার কথা ত দূরেই গেল। আর জ্যামিতিক বিষয়েও ঐরূপ। উনি যে কেমন করে বোর্ডের দিকে তাকিয়েই হুড়হুড় করে সমগ্র উত্তরটা সঠিকভাবে বলে যেতে পারতেন তা ভাবলে অবাক লাগে। বোধ হয় ঊর্ধ্বপক্ষে ক্লাসের দশ-বারোজন ৫০ মিনিট ভরে লেখা কাগজগুলো বাড়ীতে এসে ধীরে ধীরে পড়ে বুঝতে পারতো; আর অন্যেরা কি করত বোঝা মুশকিল। তবে এ-কথা কেউ বলতে পারবে না, তিনি ক্লাসে এসে অযথা সময় নষ্ট করতেন। তবে প্রতিদিন ক্লাসে আসতে ৪/৫ মিনিট দেরী হত সে কথা স্বতন্ত্র।

কেমিস্ট্রী পড়াতেন স্যার পি.সি. রায়। ক্লাসে এসে টেবিলের উপর বসে চমৎকারভাবে ধীরে ধীরে রসিকতার সাথে রসায়ন পড়াতেন। চিত্রাঙ্কন আর experiment-এর কাজ demonstrator-ই করতো। তাঁর ক্লাসে পড়ানো সকলেরই মনে ধরতো, এবিষয়ে কারও কোন অভিযোগ থাকার কথা নয়। আমিও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম,—কিন্তু সে শ্রদ্ধা বেশীদিন টিকিয়ে রাখতে পারলাম না, এই আফসোস। ব্যাপারটা হল এই : ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ ওটেন (Oaten) একদিন পড়াতে পড়াতে থার্ডইয়ারের ছাত্রদের কাছে হিন্দু জাতি সম্বন্ধে তাঁর আসল মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন, "হিন্দুরা অসভ্য ও বর্বর জাতির অন্তর্ভুক্ত।" এ সংবাদ শীঘ্রই কলেজের সব ক্লাসে ও হিন্দু হোস্টেলে ছড়িয়ে পড়লো। এর পরিণতিতে বিকাল ৪টার সময় কলেজের দোতলা থেকে নামবার সিঁড়ি থেকে জোর আওয়াজ শোনা গেল—"মারো শালা কো, মারো শালা কো"—পরক্ষণেই দেখা গেল ওটেন সাহেব নিচের তলার বারান্দার উপর উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন, তাঁর পিঠের উপর কয়েকজন ছাত্র সওয়ার হয়ে, অনেক ছাত্র পা ধরে হুড় হুড় করে টেনে নিয়ে গেল। আমি নিচের তলায় বারান্দায় নোটিশ বোর্ডের সংবাদ, আদেশ-নির্দেশ ইত্যাদি পড়ছিলাম,—এই ব্যাপার দেখে তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে বাসে চড়ে ওয়েলেসলি স্ট্রীটের মোড়ে নেমে সোজা ইলিয়ট হোস্টেলে আমার নিজের কামরায় চড়ে আসলাম।...এই ঘটনার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল, গ্রীষ্মের অছিলায়। তিন

www.pathagar.com

মাস পর কলেজ খুললে দেখা গেল, আগের প্রিন্সিপ্যাল James (জেমস) সাহেবের স্থলে Wordsworth সাহেব প্রিন্সিপ্যাল হয়েছেন, আর পূর্বের দুঃখজনক ঘটনার ফলে প্রত্যেক ছাত্রের ১০ টাকা করে জরিমানা হয়েছে। তার সঙ্গে একটা নোটিশ দেখা গেল কোনও শিক্ষকের সুপারিশসহ জরিমানা মাপের দরখাস্ত করলে, জরিমানা ১০ টাকার স্থলে এক আনা করে নেওয়া হবে। আমি গরীব ছেলে, ১৫ টাকার স্কলারশিপ ছাড়া আর কিছু করার নাই, তাই বড় আশা করে শ্রদ্ধেয় প্রফেসর পি.সি. রায়ের কাছে দরখাস্ত নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, "দেখ, তুমি মুসলমান, তুমি মৌলবী সাহেবের কাছ থেকে সুপারিশ নেও, অনেক হিন্দু ছেলেকে সার্টিফিকেট দিয়েছি; আমি আর দেব না।" এ কথায় আমি অবাক হয়ে গেলাম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মুখে এই কথা ? হিন্দু ছাত্র আর মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার! তাই ওঁর প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা রইল না। বুঝলাম স্কলার হলে কি হবে ? এঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের অভাব আছে। যাঁকে শ্রদ্ধা করতে পারিনে, তাঁর কাছে পাঠ নেওয়া আমার মেজাজে সইল না। আমি সেইদিনই প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিলাম। ভাগ্যক্রমে সে সময় রাজশাহী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কুমুদিনীকান্ত ব্যানার্জি 'আর্যনিবাসে' (শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে) এসেছেন শুনে আমি তাড়াতাড়ি রাজশাহী কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য একখানা দরখাস্ত লিখে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আমি বিভাগীয় বৃত্তিধারী-ছাত্র, এই দেখে উনি খুব খুশি হয়ে দরখাস্তের উপর Admit লিখে দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি যেয়ো; একটি মাত্র Seat আছে। আমি এখনই টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি, সেটা যেন তোমার জন্য থাকে।" আমি ঐ দিনই ইলিয়ট হোস্টেলে সমুদয় প্রাপ্য শোধ করে, রেলপথে নাটোরে গিয়ে, সেখান থেকে টমটমে চড়ে রাজশাহী গিয়ে মুসলিম হোস্টেলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে কোনও অসুবিধা হল না। যথাসময়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। কয়েক দিন পরে প্রিন্সিপ্যাল ব্যানার্জিও এসে পৌছালেন। এইভাবে ১৯১৬ সালে আমি রাজশাহী কলেজের ছাত্র হয়ে খুব স্বস্তিলাভ করলাম। কুমুদিনী বাবু ফিজিক্স (পদার্থবিদ্যা) পড়াতেন, কোথাও কোন আবশ্যকীয় তথ্য বাদ যেত না।

এই কলেজে অঙ্কের প্রফেসর ছিলেন শ্রীরাজমাধব সেন, এঁর স্নেহময় মার্জিত কণ্ঠস্বর,মোলায়েম ব্যবহার আমার ভাল লাগতো। উনিও মাঝে মাঝে আমার খোঁজ খবর নিতেন, বিশেষ করে মুসলিম বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেডেন্ট জনাব আবদুল হাকিম সাহেবের কাছ থেকে।

হাকিম সাহেব সাহিত্যবিশারদ আবদুর করিম সাহেবের পুত্র, চমৎকার ক্রিকেট আর টেনিস খেলতেন এবং ফুটবলেরও রেফারীগিরি করতেন। আমিও টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও ফুটবল খেলতাম, আর জিমনেসিয়ামে ব্যায়ামও করতাম। এসব দেখে হাকিম সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, "প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তোমাকে খুব ভাল জানেন, কিন্তু তুমি টেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারনি, তাইতে উনি আশঙ্কা প্রকাশ করে আমাকে বলেছেন, ছেলেটা কি সময় নষ্ট করে কেবল খেলাধুলাই করছে ? ওর উপর কড়া নজর রেখে দেখবেন, ও যেন অপদার্থ ছেলেদের সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে না যায়। আমি ওর উপর ভরসা রাখি যাতে পরীক্ষায়

www.pathagar.com

আমাদের কলেজের মান রক্ষা করে।"...আমি তখন হাকিম সাহেবকে বুঝিয়ে দিলাম, স্যার, আপনি যদি আর কারও কাছে কথাটা ফাঁস করে না দেন, তা-লে আমার টেস্ট-পরীক্ষার রহস্যটা বলতে পারি। আমি নিজে জানি, আসলে ভবেশ ফার্স্ট নয়, আমিই ফার্স্ট। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, "আচ্ছা বল, ফাঁস না করার মত রহস্য যদি হয়, তবে আমি ফাঁস করবো কেন ?" তখন বললাম, "পরীক্ষায় কতকাংশ শুধু অঙ্ক থাকে, তাতে সহজেই পুরো নম্বর পাওয়া যায়। তার কিয়দংশ এমন থাকে যার উত্তর ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে হয়। গত পরীক্ষায় ভাষায় বর্ণনার মত অংশে ৬৬ নম্বর ছিল, আমি শুধু সেই ৬৬ নম্বরের জওয়াব দিয়েই ৬৩ নম্বর পেয়েছি। এর সঙ্গে অঙ্কগুলো লিখে দিলেই আমি আরও ৩৪ নম্বর অবশ্যই পেতাম; অতএব আমি ৯৭ নম্বর পেয়েছি। আর ভবেশ ৭০ নম্বর পেয়েই ভাবছে, ও-ই ফার্স্ট। আমি কলকাতায় থাকতে শুনেছি, ওখানকার ভাল ছেলেরা নাকি এই কায়দা করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে নিজের প্রকৃত উৎকর্ষ বা গুণবত্তা গোপন রাখে। তাই আমিও একটু পরখ করে দেখলাম।"

এরপর আমি প্রফেসর রাজমোহন বাবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "স্যার আমি তো ৬৬ নম্বরের উত্তর দিয়েছিলাম, কিন্তু ৬৩ নম্বর পেলাম কেন ? তিন নম্বর কাটা গেল কেন ? উনি উত্তরে বললেন, "আশ্চর্যের বিষয়, তুমি অঙ্কগুলো করতে পার নাই, তবু বর্ণনামূলক অংশত খুব ভালই লিখেছ। উচিত মত ধরতে গেলে হয়ত তুমি ৬৬ নম্বরই পেতে পারতে, কিন্তু আমি কাউকে 'ফুল মার্কস' দেইনে বলেই তিনটি নম্বর কেটেছি। যা হোক এখন থেকে প্রশ্নের অঙ্কগুলোও নির্ভুলভাবে কষবার কায়দা-কানুন অভ্যাস করো, যাতে পূর্ণ নম্বর পেতে পার।"

তৎকালীন রাজশাহী কলেজের বাংলার অধ্যাপকের নাম ভুলে গিয়েছি—হয়ত তিনি অবিনাশবাবু, সত্যেনবাবু কিংবা সুবর্ধনবাবুর মত জমকালো নামধারী ব্যক্তি হবেন। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় এত চিত্তাকর্ষকভাবে পড়াতে পারেন এমন আর কাউকে আমি দেখিনি। পরীক্ষায় তিনি সর্বদা ভবেশ নন্দী (?)-র চেয়ে আমাকেই অধিক নম্বর দিতেন, যদিও ভবেশের ভাষা আলঙ্করিক ও শ্রুতিমধুর ছিল। ভবেশের কাব্য-প্রতিভা ছিল। তার কয়েকটা পদ আমার মনে পড়ছে :

"কাকলি-কোমল কানন-কুঞ্জে গুঞ্জে মধুর ভৃঙ্গ
স্তব্ধ উজল দাঁড়ায়ে জননী সাতেক শিখরী শৃঙ্গ।"

এখানে বর্ণনার বিষয় সম্ভবত ভারত-মাতার প্রাকৃতিক রূপের পুষ্প-পল্লবশোভিত অপরূপ স্নিগ্ধ রূপ। সে যাই হোক, এমন কাব্যময়, কল্পনা-কুশল ভাষা আমার হাত দিয়ে কখনও বেরোতো না। আমাদের অধ্যাপক অবিনাশবাবু (এই নামই মেনে নেওয়া যাক) বলতেন, "স্কুল-কলেজের রচনা পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সর্বদা নিবিড় সম্বন্ধ রেখে কোন ছাত্র কত দিক দিয়ে বিষয়টাকে বিস্তারিত করে, বাস্তব জগতে যেমন ঘটে, সেই দৃশ্যটি উদঘাটন করতে পারে, তারই বিচার করা। ভাষা সহজ, সুবোধ্য ও স্বাভাবিক হতে হবে, তাতে যেন রচয়িতার আন্তরিক উপলব্ধির ছাপ পড়ে, শুধু খেয়ালীপনা হলে চলবে না।" যা হোক, আমি অবিনাশবাবুর কাছ থেকে এইভাবে

www.pathagar.com

অনেক উৎসাহ পেয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি। এজন্য তাঁর কাছে আমি চিরঋণী।

এইবার আমাদের হোস্টেলের একজন ছাত্রের কথা উল্লেখ করেই খতম করছি। এঁর নাম মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ্, বাড়ী পাবনা জেলার উল্লাপাড়ার কাছে। ইনি তখন থার্ড ইয়ার-এর ছাত্র; আমার থেকে এক ক্লাস উপরে। আমি একবার একটা বাংলা রচনা লিখে তাঁকে দিয়েছিলাম। তিনি দেখে বললে, "হ্যাঁ, ভালই হয়েছে, তবে আপনার কাছ থেকে আমরা আরও ভালো আশা করি।" আভাসে বুঝে নিলাম, আমার বাংলা সমাস-সম্ভার ওঁর চেয়ে অনেক সংকীর্ণ। তাই প্রবন্ধটা ছিঁড়ে ফেলে, সেই প্রবন্ধটাই ইংরেজীতে লিখে রাজশাহী কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপতে দিলাম। অবিনাশ-বাবুর কর্তৃত্বেই এ ম্যাগাজিনের প্রবন্ধ-চয়ন হতো। দেখলাম, প্রবন্ধটা ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে, কিন্তু ভিন্ন নামে। আমি নাম দিয়েছিলাম 'If it would be' নতুন নামকরণ হয়েছে 'Utopia,' বিষয়বস্তুটা ছিল একটু বিজ্ঞান-ঘেঁষা। পৃথিবীর মাটিতে চলাচল করবার জন্য আল্লাহ্ মাটির রোধন-শক্তি দিয়েছেন; সম্পূর্ণ পিচ্ছিল হলে মানুষ চলাফেলা করতে পারতো না, কাজকর্মও করতে পারতো না, ইত্যাদি। কাজেই তিনি যা-করেছেন ভালই করেছেন; এর জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ থেকে তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন করলেই এ জীবন সার্থক হবে ইত্যাদি। Utopia শব্দটার আমি মানেই জানতাম না—Dictiornary-তে আছে Imaginary island with perfect social and political system; যা হোক, এই নামটাই বেশী লাগসই। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, আমাদের জীবনের আদর্শ কেমন হলে মানুষ সবার সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা করে বাস করতে পারে তাই যুক্তির সাহায্যে ভেবে দেখবার প্রয়াস। সুতরাং জীবনধারণের দর্শনকেও প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলতেই হবে। এই নিয়মগুলোর পরিপ্রেক্ষিতেই ক্রমিক অভিজ্ঞতালব্ধ পথ ধরে আমাদেরও গতাগতি হবে। এইরূপ জীবনদর্শনকেই আমরা ধর্মীয় জীবন বলে থাকি।...সম্ভবতঃ বিষয়ের অভিনবতা ও বুদ্ধির সুচারু চালনার মিশ্রণ থাকাতেই প্রবন্ধটা গৃহীত হয়েছিল। এর বেশী আমি আর কিছু ভেবে পাইনে।

রাজশাহী কলেজে খুব সুখে ছিলাম। পদ্মা নদীতে স্নান করতাম, সাঁতার দিয়ে ওপারে চলে যেতাম, কলেজের একখানা বোট ছিল প্রফেসর রাজমাধব বাবুর তত্ত্বাবধানে। তাতে চড়ে নদী ভ্রমণ করতাম, আরও কত কি! একদিন দেখি একজন সাঁতারু ওপারে গিয়ে আবার সেই পিঠ পিঠ এপারে ফেরবার জন্য সাঁতার দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তাই ব্যাকুলভাবে হাত ইশারা করছে। আমি সাঁতরিয়ে কাছে গিয়ে ধুতি খুলে তার এক প্রান্ত ওর দিকে ফেলে দিয়ে বললাম, "কেবল ভেসে থাক কাপড়ের প্রান্ত ধরে, খবরদার আমাকে ছুঁতে চেষ্টা করো না।" এইভাবে ওকে নদীর কিনারায় টেনে এনে বললাম "এখন বুক-পানি মাত্র, হেঁটে তীরে ওঠো। আমি কাপড়টা ঠিকমত পরে নিয়ে এখনই আসছি।"...সেদিন যে কত ভাল লেগেছিল, তার বর্ণনা দিতে পারব না। মনে হচ্ছিল আল্লাহ্ আমার প্রতি খুশি হয়েছেন।

এইবার রাজশাহী কলেজ থেকে ঐ বিভাগে প্রথম হয়ে মাসিক ২০ টাকা করে বৃত্তি পেলাম। প্রশ্ন উঠল কোথায় পড়ব ? আমার বাড়ী ঢাকা বিভাগে; তবু ঢাকা দেখি নাই একবারও। তাই ভাবলাম এবার প্রেসিডেন্সী ও রাজশাহী না গিয়ে আমার নিজের

www.pathagar.com

বিভাগ ঢাকায় গিয়ে বি. এ., এম. এ. পড়বো। তাই ১৯১৭ সালে ঢাকায় এসে প্রথমে দিন চারেক ঢাকা কলেজ হোস্টেলের পূর্ব-ব্যারাকে আমার বাড়ীর কাছে সেনগ্রামের অধিবাসী জমিদার-পুত্র অশ্বিনীকুমার ভুঁইয়ার দোতলার কোঠায় তাঁর অতিথি হিসাবে যাপন করে ভর্তি-পর্ব শেষ হলে পশ্চিম ব্যারাকের উত্তরার্ধে দোতলায় সিট পেলাম। তখন হোস্টেলটা দোতলা ছিল, হোস্টেলের সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন গণিতের অধ্যাপক শ্রীবঙ্কিমদাস ব্যানার্জি। মুসলমান ছেলেদের জন্য আলাদা হোস্টেলও ছিল না, সুপারিনটেণ্ডেন্টও ছিল না। তবে একজন মনিটর ছিল। হিন্দু ছাত্রদের রান্নাঘর ও খাবার ঘরের জন্য হোস্টেল প্রাঙ্গণের পশ্চিম প্রান্তে দুটো বৃহৎ কুঠী ছিল। আর স্বল্প সংখ্যক মুসলমান ছাত্রের জন্য হোস্টেলের দক্ষিণ দরজার বাহিরে দুই কামরা বিশিষ্ট একটা মাঝারি গোছের কুঠির ক্ষুদ্রতর প্রান্তে রান্নাবান্না এবং বৃহত্তর প্রান্তে খাবার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য, হোস্টেলের ছাত্র-সংখ্যা ছিল, হিন্দু প্রায় ২৭০ জন ও মুসলমান প্রায় ৭০ জন, অর্থাৎ হোস্টেলের হিন্দু ছাত্র-সংখ্যা ও হোস্টেলের মুসলিম ছাত্র-সংখ্যার অনুপাত ছিল মোটামুটি ৪ঃ১ আর সমগ্র ঢাকা কলেজের ছাত্রদের এই অনুপাত প্রায় ৭ঃ১ হবে। এর কারণ, বহু হিন্দু ছাত্র স্বগৃহে থেকে কলেজে পড়ত, কিন্তু স্বগৃহ থেকে কলেজে পড়া ছাত্রের সংখ্যা মুসলমান ক্ষেত্রে ছিল একেবারেই নগণ্য। আমার যতদূর মনে পড়ে, হিন্দু-মুসলিম মিলিয়ে কলেজের সমুদয় ছাত্র-সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৫০, তার মধ্যে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১১০ এর কম। অবশ্য ১৯২১ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি হবার সময় মোটের উপর হিন্দু-মুসলিম ছাত্র-সংখ্যার অনুপাত ছিল প্রায় ৩ঃ১।

এর কিছুকাল আগে থেকেই মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একটু সুদৃষ্টি পড়েছিলো; সেই কারণে বিপুল উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের আবির্ভাব হল, যাঁরা সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হয়ে দেশের ও নিজেদের কওমের খেদমত করতে পারেন। এই ক্রান্তিকালে চার-পাঁচ বছরের মধ্যে[৪] বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুসলিম মনীষীদের নাম হচ্ছে নওয়াব স্যার সলিমউল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ, নওয়াব বাহাদুর আবদুল লতিফ, হাকিম হাবিবুর রহমান, আবুল কাসেম ফজলুল হক, নওয়াব নওয়াব আলী চৌধুরী, খাজা নাজিমউদ্দীন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, নওয়াব ইউসুফজান সাহেব, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, রওশন আলী চৌধুরী, মুন্সী মজীরউদ্দীন, মুন্সী মেহেরউল্লাহ, সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী, স্যার এ. এফ. রহমান, প্রফেসর মৌলানা মুহম্মদ এরফান, প্রফেসর ফেদা আলী খাঁ, প্রফেসর আবদুর রহমান খাঁ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মিঃ ফখরুদ্দীন আহমদ ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে ছিলেন সদাশয় জমিদার, পদস্থ রাজকর্মচারী, প্রফেসর, সুবক্তা ও ব্যক্তিত্বশীল উপদেষ্টা।...ইতিমধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদেরকে পৃথক পৃথক হলে [এখন আর হোস্টেল নয়] স্থান দেওয়া হয়েছে—যথা, সেক্রেটারিয়েট মুসলিম হল, ঢাকা হল, সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল, উইমেন্স হল, উইমেন্স হিন্দু হল ইত্যাদি ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, আরও অনেক বিষয় আমার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে।

যা হোক, এই উদ্দীপনার শেষে তখনকার ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজের সম্মিলিত হিন্দু, মুসলিম ও বিদেশীয় শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন

www.pathagar.com

স্যার এ. এফ. রহমান (ইতিহাস), সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র (ইংরেজী), ড. শহীদুল্লাহ্ (বাংলা), রমেশচন্দ্র মজুমদার (ইতিহাস), হরিদাস ভট্টাচার্য (দর্শন), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (পদার্থবিদ্যা), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (রসায়ন), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা), ড. মাহমুদ হুসেন (ইতিহাস), ড. মোহাম্মদ হাসান (ইংরেজী), ফেদা আলী খাঁ (আরবী, ফারসী); অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত (বাংলা), ড. ডব্লিউ, এ, জেঙ্কিন্স (পদার্থবিদ্যা), ডব্লিউ এ আর্চিবোল্ড সাহেব (ইংরেজী), টার্ণার সাহেব (অঙ্ক), বাংলার ভূপতিমোহন সেন (রাজমোহন সেনের পুত্র; অঙ্ক), ল্যাংলী সাহেব (দর্শন), টি. টি. উইলিয়ম্স্ (ধনবিজ্ঞান), অশ্বিনীকুমার মুখার্জি (ইতিহাস), ললিতমোহন চ্যাটার্জি (ইংরেজী; জগন্নাথ কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল)।

১৯১৮ সালে আমি আই. এ. ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরীক্ষা পাস করে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ বি. এ. পাস করি। এ পরীক্ষায় পূর্ব বাংলা ও আসামের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক ৩০ টাকার বিভাগীয় বৃত্তিলাভ করি। এই সময় চট্টগ্রামের জোরওয়ারগঞ্জ স্কুলের স্থাপয়িতা ও সেক্রেটারী জনাব ফজলুল কাদের সাহেবের মারফতে আমার বিবাহের একটা প্রস্তাব আসে। সম্পর্কটা খুব সম্মানজনক, পাংশার বিখ্যাত রওশন আলী চৌধুরী সাহেবের কন্যার সাথে। কিন্তু এর কিছুদিন আগে থেকেই আমাকে বৃত্তির সব টাকা বাপ-মায়ের ভরণ-পোষণের জন্য বাড়ীতে পাঠাতে হত, আর আমি প্রাইভেট টিউশনী করে বিশ-পঁচিশ টাকা যা পেতাম তাই দিয়েই নিজের খরচ-খরচা চালাতাম। ঐ সময় আমার পিতা বাতগ্রস্ত হয়ে চলৎশক্তিহীন হওয়াতেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। অতএব আমি অকপটে সমুদয় অবস্থার বিবৃতি দিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে জনাব ফজলুল কাদের সাহেবের কাছে একখানা চিঠি পাঠালাম। আমার চিঠি পেয়ে তিনি আমার কর্তব্য-বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে উৎসাহ দিয়ে চিঠির জওয়াব দিলেন। এইভাবে আমি দৈবাৎ একজন মহানুভব বন্ধু পেয়ে গেলাম। ইনি অবশ্য রওশন আলী চৌধুরী ও এঁর ছোট ভাই এয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেবানকেও আমার অবস্থা ও সিদ্ধান্তের কথা অবগত করান, ফলে, আমি এই চৌধুরী পরিবারেরও বন্ধুত্ব লাভ করলাম। ওঁরাও আমাকে অতিশয় স্নেহের চোখে দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই একজন ভাল ছেলে বলে পরিচিত হয়ে পড়েছিলাম। উপরে আমি 'দৈবাৎ' শব্দটা ব্যবহার করেছি। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি, এসবই আল্লাহ্র কুদরত। তাই এখন এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি আর আশ্বিনের একমাস ছুটিতে বিল করা যেত না, তাই আমাকে কোনও স্কুলের মাস্টারী করে সেই টাকা বাড়ীতে পাঠিয়ে সংসার চালাতে হত। খবরের কাগজে কর্মখালির তালিকা দেখে স্থানে স্থানে দরখাস্ত করে মাস্টারীর সুযোগ সন্ধান করতাম। একবার মৈমনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ স্কুলে হেডমাস্টার হয়ে সেখানে গেলাম। তখন সেক্রেটারী সাহেব বললেন, "তিন বছরের গ্যারান্টি দিতে হবে।" আমি ত অবাক। বললাম, "গ্যারান্টির ত কোনও কথা ছিল না।" শুনে অন্যান্য শিক্ষকেরা বললেন, "স্যার, লিখে দেন না। পরে আপনি চলে গেলে কে কি করতে পারে?" আমি

www.pathagar.com

সম্মত হলাম না, একদিনের মাইনে ২ টাকা নিয়ে জোরওয়ারগঞ্জের সাব-রেজিস্ট্রার জনাব ফজলুল কাদের সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। উনি বললেন, "ঠিক আছে; কিন্তু আর ১৫ দিন পরেই হেডমাস্টারের ছুটি ফুরোলেই তিনি এসে পড়বেন। আমি কেবল এই ১৫ দিন আপনাকে রাখতে পারি।" আমি বললাম, "তাই হোক।"

এই পনর দিন আমি স্কুলের বৃহৎ পুকুরে সাঁতার কাটতাম, খেলার মাঠে ছাত্রদের সঙ্গে খেলা করতাম। আর ওদের কয়েকটা ক্লাসে রুটিনমত পড়াতাম। আমার বিদায়ের দিন বিকালে ছেলেরা একটা বিদায় সভা করলো, আর এই ১৫ দিনের স্মৃতিতেই কয়েকজন বক্তৃতা করতে গিয়ে কেঁদে ফেললো।...সন্ধ্যার পর সাব-রেজিস্টার সাহেব কোরমা-পোলাও খাওয়ালেন, আর জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন আপনার প্ল্যান কি ?" তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আমার ত কোন প্ল্যান নাই, তবে আমি মনে করি, আল্লা-ই আমার জন্য প্লান করছেন।"

পরদিন প্রত্যুষেই ডাক আসলে একখানা চিঠি পেলাম, দেখলাম আমার চাকরি হয়েছে সেকেণ্ড মাস্টার হিসাবে ৫০ ঢাকা বেতনে খুলনার দৌলতপুর মহসিন স্কুলে। তখন বুঝতে পারলাম, সত্যিই ত আল্লাহ্ আমার জন্য প্ল্যান করেই রেখেছেন।...যা হোক ঝটপট রওনা হয়ে গিয়ে উঠলাম দৌলতপুরের মহসিন স্কুলে, পরদিন সকাল বেলা।[৫]

এসব ঘটনা আপাতঃ দৃষ্টিতে টুকরো টুকরো হলেও সমুদয় ঘটনাপুঞ্জের মধ্যেই যেন পরস্পর সংস্পর্শ রয়েছে—যেন আগে থেকেই সুসজ্জিতভাবে বাঁধা হয়েছে। এটা কার কাজ ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ্ ঘটনার পর ঘটনা তাঁরই মহৎ উদ্দেশ্যে এমন সুসজ্জিত করে রেখেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই রহমত দান করে থাকেন—তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। আমি আশা করি, তিনি যেন আমাকে সর্বদা সরল পথ দেখান, আর হেদায়েত করেন।

এবার আমার দৌলতপুর মহসিন স্কুল থেকে বিদায়ের পালা। সেদিন সকালবেলায় একটা ক্লাস নিয়েছিলাম থার্ড ক্লাসের ছাত্রদের সাথে ক্লাস ছিল প্রথম ঘণ্টায়। একটা মাতব্বর ছেলে আধ ঘণ্টা পর বললো, "স্যার! একটা কথা বলবো ?" আমি বললাম, "হাঁ, নিশ্চয়ই বলবে।" বললো—"স্যার, আমরা সব ক্লাসেই জুতো ঠকঠক করি, পা ঘষে উৎপাত করি, কিন্তু কেবল আপনার ক্লাসেই পারিনে।"—"কেন ?" বললো—"লজ্জা করে।" এই ছেলেটাই ভৈরব নদীর খেয়া পার হওয়ার সময় নৌকা ঝাঁকিয়ে হেডপণ্ডিতকে ডুবিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে বাংলায় পাসের নম্বর আদায় করে প্রমোশন পেয়েছিল। এদিকে ছেলেরা আমাকে রেলস্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার জন্য হেডমাস্টারের কাছে ছুটি চেয়েছিল, কিন্তু তা মঞ্জুর হয়নি। রেলস্টেশন ছিল স্কুল থেকে ২ ফার্লং-এর অনধিক দূরে। ট্রেনের সময় হয়ে আসছে দেখে আমি ঐ 'সর্দার' ছেলেটাকে বললাম, "একটা লোক ডেকে দাও ত আমার ট্রাঙ্কটা বয়ে নিয়ে যাবে।" তার উত্তর হল, "লোক? তবে আমরা আছি কেন ?" এই বলে ট্রাঙ্কটা মাথায় তুলে নিয়ে আগে আগে চললো। আর সঙ্গে সঙ্গে সব ক্লাশ থেকে সব ছেলে বেরিয়ে পিছে পিছে ছুটলো। তাই দেখে হেডমাস্টার মশায় এবং অন্যসব শিক্ষকও স্টেশনে এসে পৌঁছলেন। ছেলেরাই

www.pathagar.com

আমার ট্রাঙ্কটা ট্রেনে তুলে দিল; আরেক অনুরক্ত ছেলে ওদের বাগানের গোলাপ ফুল থেকে বেছে একটা ছোট bouquet বা ফুলের তোড়া তৈরি করে রেখেছিল, সেটা আমার হাতে দিল। আমি আনন্দ-বিষাদের অশ্রু-মোচন করতে করতে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ঐ ফুলের 'বুকে'টা থেকে ঝরে পড়া পাপড়িগুলো আমি আমার চেম্বার্স ডিকশনারীটার পাতার মাঝে মাঝে গুঁজে রেখেছিলাম। দশ-পনর বছর পর্যন্ত সেগুলো রক্ষা করতে পেরেছিলাম, পরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। জ্যোৎস্নাকুমার রায় নামক সেই ছেলেটাও প্রায় ২০/২৫ বছর পর্যন্ত চিঠিপত্র লিখত, আমিও তার জওয়াব দিতাম। কিন্তু শেষে কি যে হলো, তার আর উদ্দেশ পেলাম না।

যা হোক, আবার পরিত্যক্ত প্রসঙ্গের খেই ধরা যাক্। দৌলতপুর মহসিন স্কুল থেকে বিদায়ের কাল বোধহয় ১৯১৯ সাল। ঢাকা কলেজের ছাত্র-বন্ধুরা আমাকে ফ্রী বোর্ড দিতে চেয়েছিল। আমি এতে তাদের সদিচ্ছার প্রশংসা করেও প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, তার অজুহাতে বলেছিলাম "আমি ত গ্রাজুয়েট হয়েছি, কোনও ক্রমে আহারের ব্যয় নির্বাহ করতে পারবই, আপনারা কোনও উপযুক্ত আণ্ডার গ্রাজুয়েটকে এই সাহায্য দিলে আরও সমীচীন হবে; কারণ এতে তারই অধিক উপকার হবে।"

১৯২০ সালের ১০ই অক্টোবর আমার বিবাহ হয়। এরও একটা ইতিহাস আছে। ১৯১৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সহপাঠী কাজী আকরাম হোসেন আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আমরা উভয়েই কলকাতার বেকার হোস্টেলের সান্নিধ্যে ইলিয়ট হোস্টেলে থাকতাম। তাঁর সঙ্গে আমি অঙ্গীকার করেছিলাম যে, "আমি কোনও না কোনও সময়ে তোমাদের বাড়ীতে (পায়গ্রাম কসবায়) তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব।" এই পায়গ্রাম কসবা দৌলতপুর থেকে তিন-চার মাইল দূরে। তাই, পূর্বের অঙ্গীকার স্মরণ করে আকরাম হোসেনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। এঁর চাচার বাড়ীতে (মৌলবী বাড়ীতে) মসজিদ ছিল (এখনও আছে)। আমি একদিন মসজিদের প্রাঙ্গণে আছর-এর নামাজের সময় আজান দিয়ে মসজিদে ঢুকে নামাজে শরীক হয়েছিলাম। এই মসজিদে (আমার ভবিষ্যৎ নানা-শ্বশুর) কাজী মুহম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব এবাদত করতেন। তিনি আজান শুনে খুব খুশী হয়েছিলেন। তবু আমাকে আরও পরীক্ষা করবার জন্য 'শাহনামা-'র কোনও এক স্থান থেকে আমাকে পড়তে বললেন। আমি ত পুরো 'শাহনামা' তখনও পড়িনি, তবু ফার্সীতে কিছু জ্ঞান ছিল বলে কোনও রকমে পড়ে গেলাম। তিনি বললেন, "হাঁ, পড়েছ ঠিকই, কিন্তু 'শাহনামা' পড়তে হয় জোশের সঙ্গে, ভাবের অনুগমন করে", এই বলে তিনি অতি চমৎকারভাবে সেই অংশটা আমাকে পড়ে শুনালেন, সুললিত কণ্ঠে। আমি বুঝলাম, বীরত্বের বাণী কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়।

এর কিছুদিন পরে আকরাম হোসেন সাহেব আমাকে চিঠি দিয়ে জানালেন,—"বড় চাচাজান তোমাকে খুব পছন্দ করেছেন, আর আমাকে বলেছেন, তোমার মত ছেলের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, তাই সম্ভব হলে তোমাকে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করতে পারলে উনি সুখী হবেন। এই ইঙ্গিত পেয়ে আমি তোমাকে জানাচ্ছি, বর্তমানে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দুইটি সুযোগ্যা মেয়ে আছে একজন আলীপুর চিৎলের (চেতলা) জমিদার-কন্যা, কিছু কম হলেও দেখতে বেশ সুশ্রী; আর একজন কলকাতা ওলিউল্লা

www.pathagar.com

লেনের (তালপুর এলাকার) শামসুল ওলামা আতাউর রহমান খানবাহাদুর সাহেবের পুত্নী, উর্দু, বাংলা এবং কিছু ইংরেজীও জানে, আর বঙ্কিমবাবুর "যুগলাঙ্গুরীয়" ও "রাধারাণী"-র উর্দু অনুবাদ করে উর্দু পত্রিকায় ছাপিয়েছে, এর বর্ণ কিছুটা মলিন হলেও চেহারায় দীপ্তি আছে।"...আমরা দু'জনই তখন সুপাত্রীর খোঁজে ছিলাম। আমি ওদের মধ্যে মলিন কন্যাটাকেই পছন্দ করলাম, আর আকরাম নিজে সুন্দরী কন্যাটাকেই পছন্দ করলো। যা হোক আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি জিৎ আমারই হয়েছিল। যতদূর জানি আমি বিবাহিত জীবনে আকরামের চেয়ে অধিক সুখী হতে পেরেছিলাম। আমার স্ত্রীর নাম ছিল সাজেদা খাতুন। ইনি উর্দুতে আমার কাছে চিঠি লিখতেন, কাজেই এঁর দৌলতে আমার বেশ কিছুটা উর্দু চর্চাও হয়েছিল, আর আমার সাহচর্যে সাজেদা বিবিরও বাংলা জ্ঞান বৃদ্ধি হলো।

কিন্তু শুধু জ্ঞান দিয়ে ত মানুষের প্রকৃতি চেনা যায় না। আমি এই সেগুনবাগানের যে বাড়ীতে রয়েছি, সে বাড়ীর প্ল্যান থেকে শুরু করে চূণ-সুরকি-বালু-সিমেন্ট কোথায় পাওয়া যাবে এবং কনট্রাকটরের কামলাদের কাজকর্ম ঠিকমত চলছে কিনা এসব দেখাশোনার কাজ উনিই (আমার স্ত্রী) করেছেন। কোথায় ইঁটের গাঁথনি শিথিল হলো, কোথায় চূণকাম হলো না, কোন মজুরটার কাজে ঘাটতি হলো, এসব তদারক উনিই পূর্ব-অভিজ্ঞতার দরুন সুচারুরূপে করতে পারতেন। অর্থাৎ কত ধানে কত চাল হয়, এসব উনি কলকাতার দালান বাড়ীতে বসতকালেই লক্ষ করেছিলেন, তাই বিল্ডিং-এর কনট্রাকটর ওস্তাগারদের গাফলতি চট করে ধরে ফেলতে পারতেন। কাজ খুব সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হয়েছিল। এর জন্য তিনি রোজ অন্ততঃ ৩/৪ ঘণ্টা করে সরেজমিনে উপস্থিত থাকতেন আর আমি সর্বদা নিশ্চিন্তভাবে লেখাপড়ার কাজ করে যেতে পারতাম—নইলে হয়ত শিক্ষাক্ষেত্রে আমি অধিক উন্নতি করতে পারতাম না। এই বাড়ীর একতলা তৈরি শেষ হয় ১৯৩২ সালে। আমরা তখনই নিজের বাড়ীতে উঠে আসলাম। তখন এই বাড়ী দেখে তিনি আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন, "এই সুন্দর বাড়ীটা আমাদের আপন বাড়ী! হাজার শুকুর আল্লাহ্‌র, আলহামদুলিল্লাহ।" এই কথা শুনে আমার মনেও যে কি খুশি জেগেছিল তা বর্ণনা করা যায় না।

তবে একটা বিষয়ে আমার মনে দুঃখ ছিল—বাজেট ছিল ৬ হাজার টাকা, কিন্তু বাড়ী তৈরি করতে মোট খরচ লাগলো ১০০০০ টাকা;—তাই ওস্তাগার কনট্রাকটররা বাকী প্রাপ্যের জন্য খুব তাগিদ দিতে লাগলো। একদিন বিষণ্ন বদনে ঘরের মেঝেয় বসে আছি দেখে, সাজেদা বিবি জিজ্ঞাসা করলেন, "অমন করে বসে রয়েছেন কেন ?" তখন আমি ঋণের কথাটা বললাম। ইউনিভার্সিটি থেকে ৬০০০ টাকা বাড়ী তৈরি বাবদ ধার নিয়েছিলাম, তাই ওস্তাগার ও কন্ট্রাকটরদের কাছে হাজার চারেক ধার হওয়াতে ওরা জোর তাগাদা লাগাচ্ছে। উনি তখনই উঠে গেলেন আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একটা থলে এনে আমাকে দিয়ে বললেন, "আমার গহনাগাটি এর মধ্যে আছে আপনি কোন বন্ধুলোকের কাছে এগুলো গচ্ছিত রেখে কিছু টাকা এনে অবিলম্বে এদের ধার শোধ করে দেন।" আমি নিতে চাইনে, কিন্তু উনি কিছুতেই ছাড়লেন না। তখন আমি

www.pathagar.com

শ্রীমতী লীলা নাগের বাবা অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীগিরীশচন্দ্র নাগের কাছে গহনাগুলো বন্ধক দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়ে গৃহ-নির্মাতাদের ধার পরিশোধ করে দিলাম।

এখন এই গিরীশ নাগের পরিবারবর্গের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করি। লীলা নাগ ঢাকা কলেজে আমার এক ক্লাস নিচে পড়তেন। এঁর মত সমাজ-সেবিকা ও মর্যাদাময়ী নারী আর কখনো দেখি নাই। এঁর থিওরী হল, নারীদেরও উপার্জনশীলা হতে হবে, নইলে কখনো তারা পুরুষের কাছে মর্যাদা পাবে না। তাই তিনি মেয়েদের রুমাল, টেবলক্লথ প্রভৃতির উপর সুন্দর নক্সা এঁকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এইসব বিক্রি করে তিনি মেয়েদের একটা উপার্জনের পন্থা উন্মুক্ত করে দেন। এঁদের বন্ধু-বান্ধবীরা এইসব সূচীকর্ম বিক্রয়ে সহযোগিতা করতেন। এঁদের একটা সঙ্ঘ ছিল, লীলা ও আমি এই সঙ্ঘের যুগ্ম ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলাম, প্রেসিডেন্ট ছিলেন মিসেস সুজাতা রায়ের স্বামী শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় (ইংরেজীর অধ্যাপক)। শুধু এই নয়, মেয়েদের শিক্ষালাভের জন্য আরমানীটোলা বালিকা বিদ্যালয়, টিকাটুলীতে কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল এবং তৎকালীন নওয়াবী ব্রিজের অপর পারে নারীশিক্ষা মন্দির ইনিই সৃষ্টি করেছেন। আর এঁর কায়েতটুলীর বাড়ীর পাশে একটা প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় খুলে দিয়েছিলেন। সেইটেই ক্রমশঃ বর্ধিত হতে হতে বর্তমানে দোতলা কলেজে পরিণত হয়ে গিরীশ নাগের পূর্বতন গৃহের সর্বাংশ জুড়ে রয়েছে। এই স্থানটি এখনও আমার কাছে পবিত্র তীর্থস্থান বলে মনে হয়। লীলার বিবাহের পর তিনি লীলা রায় রূপে পরিচিতা হন। এঁর দুটো ছোট ভাইকে আমি গৃহশিক্ষকরূপে পড়িয়েছি। আমি উপস্থিত হওয়া মাত্রই গিরীশবাবু গৃহিণীকে ডেকে বলতেন, "ওই দেখ আমাদের কাজী সাহেব আসছেন, শীগগির ওঁর আহারের বন্দোবস্ত কর"। আমার জন্য সর্বদাই দুধ, দৈ, চিঁড়ে, মুড়কি, খৈ বরাদ্দ ছিল। পাকিস্তান হয়ে যাবার পর শ্রীমতী লীলাবতী রায় কলকাতায় চলে যান। সেখানেও তিনি তিন-চারটে স্ত্রী-শিক্ষাভবন চালু করেন। তিনি থাকতেন দক্ষিণ কলকাতার বালীগঞ্জ এলাকায়। আমি ঐ সময় (১৯৩০-৫০ সালে) প্রতি বৎসর উত্তর কলকাতার বরাহনগর এলাকায় ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউটের বৈদেশিক শিক্ষক হিসাবে (আমন্ত্রিত অতিথিরূপে) অবস্থান করতাম। সংবাদ পেলেই লীলাদেবী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন; আর তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিজের হাতে রেঁধে-বেড়ে আমাকে খিচুড়ি পোলাও ইত্যাদি খাওয়াতেন। ঢাকাতেও আমরা যখন ভাড়াটে বাড়ীতে ওঁদের পল্লীতে থাকতাম, তখন আমিও সস্ত্রীক ওঁদের বাড়ীতে বেড়াতে যেতাম, উনিও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, আর আমার স্ত্রীর সঙ্গে নারী-মঙ্গল ও নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। এই মহীয়সী মহিলা ১৯৬০-এর দশকে রোগাক্রান্ত হয়ে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকবার সময় আমার কাছ থেকে একটা শেষবার্তা নেবার জন্য তাঁর দুইজন ভলাণ্টিয়ার পাঠিয়েছিলেন। আমিও শোকার্ত চিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে এই পবিত্র মহিলার রোগমুক্তির প্রার্থনাসূচক বাণী পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় শীঘ্রই তিনি নশ্বর মর্তধাম ত্যাগ করে মহাপ্রস্থান করলেন। পৃথিবীর একটা উজ্জ্বল আত্মা আকাশের তারকামণ্ডলে গিয়ে তার শোভাবর্ধন করলো।

www.pathagar.com

আমরা সেগুনবাগানের বাড়ীতে এসে পড়ার পর একবার আমাদের বাড়ীর পশ্চিম বারান্দায় সিঁড়ি বেয়ে একটা সাপ উঠে এসেছিল। চাকর-বাকররা লাঠি নিয়ে সাপ মারতে ছুটলো, আমিও লাঠি হাতে করে বারান্দা-ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময় সাজু বিবি সর্বশক্তিতে আমার কোমর চেপে ধরে ঠেকিয়ে দিল। এত জোর কোথা থেকে আসলো, আমি ছাড়াতে পারলাম না। বুঝলাম, আমাকে সাপে কামড়াতে পারে, এজন্য প্রেমাস্পদের জীবনরক্ষার জন্য আকস্মিক প্রবল শক্তি দিয়েছিলেন আল্লাহ্তালাই। এটা পতির প্রতি সতী নারীর ভালবাসার জোর।

একবার ইটালী থেকে একজন আর্কিটেক্ট (গৃহ-নির্মাণবিদ্যা-বিশারদ) ঢাকায় এসেছিলেন; তিনি বাড়ী বাড়ী ঘুরে দেখে নির্মাণ-কৌশলে কোথায় কি ত্রুটি হয়েছে দেখছিলেন, স্বাস্থ্য, বায়ু চলাচল, দরজা, জানালা প্রভৃতি সম্পর্কে বা অবস্থানে কি খুঁত আছে সেগুলো অবহিত হবার জন্য। আমাদের বাড়ীতে এসে বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে দেখে তাজ্জব হয়ে বললেন, "এমন সর্ব-সুন্দর ঘরের প্রকল্প কে করেছেন?" আমি বললাম এর সব নক্সা-প্রকল্প, ভিত্তির উচ্চতা, দরজার উপরের তেরছা ঘুলঘুলি, সবই আমার গৃহিণীর ইচ্ছা ও উপদেশক্রমেই হয়েছে। তখন তিনি বললেন, "আমার যত কিছু বিদ্যা ছিল, সবই এখানে প্রযুক্ত হয়েছে"—এই বলে উনি ওই মহিলা আর্কিটেক্টকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন আমার সাজুরানীকে ডেকে আনলাম। ইটালীর বিশেষজ্ঞ তখন তাঁকে নমস্কার করে বললেন, "ধন্য আপনি, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই শহরে এ পর্যন্ত এমন সর্বাঙ্গসুন্দর গৃহ আর একটিও আমার চোখে পড়ে নাই। আপনাদের মঙ্গল হোক!"—এই বলে বিদায় নিলেন।

একবার আমি কয়েকমাস যাবৎ পশ্চিম পাকিস্তানে (করাচীতে) Lord Boyd Orr-এর সভাপতিত্বে যে কৃষি-উন্নয়ন কমিটি (Agricultural Development Committee) হয়েছিল, তার মেম্বর ছিলাম। তখন গবর্নমেন্ট থেকেই বেতন পেতাম, আর মাসে মাসে টাকা পাঠাতাম। তারপর ঢাকায় ফিরে এলাম, একদিন রাত্রিকালে। বাড়ীর কাছে এসে আর ঘর খুঁজে পাইনে। তখন একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দেখুন, এই অঞ্চলে কাজী মোতাহার হোসেনের একটা বাড়ী ছিল, সেটা তো খুঁজে পাচ্ছি না!" তখন তিনি বললেন, "এইটেই তো কাজী সাহেবের বাড়ী।" তারপর তিনি আমাকে চিনে ফেলে বললেন, "আপনি নিজের বাড়ী চেনেন না, এ কেমন কথা!" আসল কথা হলো, বাড়ী যে এর মধ্যে একতলা থেকে দোতলা হয়ে গেছে, সে কথা আমাকে একেবারেই জানানো হয়নি। আমি তখন হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলাম। এই আমার গৃহিণীর তেলেসমাতী কাণ্ড।...পরে তেতলাও উনিই নির্মাণ করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এমন বৌ পেয়ে সংসারের কাজে আমার কখনও মাথা ঘামাতে হয়নি।

এমন কি ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো পরানো এবং কোরানশরীফ পড়ানো আর নামাজ-কালাম শেখানোর কাজও উনিই করেছেন। বস্তুত উনি একাই সন্তানদের বাপ ও মায়ের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

মৃত্যুর প্রাক্কালে উনি পি.জি. হসপিটালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আমি রোজ একবার করে দেখতে যেতাম। কিন্তু নিষেধ করতেন পাছে আমি পথ চলতে চলতে গাড়ী চাপা

www.pathagar.com

পড়ে মারা যাই। এখানেও মনের ভাব এই : 'আমি মারা যাই তাতে খেদ নাই, কিন্তু আমার উনি কেন আমার জন্য প্রাণ হারাবেন ?' হায়! আমি আমার হারামণিকে হারিয়ে কেমন করে প্রাণ ধরি ? এই আমার বিষম সমস্যা। আমি ওর সঙ্গী হতে চাই—আল্লার সন্নিধানে।

'লোকসাহিত্য পত্রিকা'
তৃতীয় বর্ষ, প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা
জানুয়ারি-ডিসেম্বর ১৯৮১
মাঘ ১৩৮৭-পৌষ ১৩৮৮

পাদটীকা

১. এখানে গোপাল চক্রবর্তীর দারোগাগিরির চাকুরী পাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস সম্বন্ধে বিবরণ ছিল যা 'কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা' অধ্যায়ে তাঁর প্রসঙ্গের অনুরূপ বলে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২. গোপাল চক্রবর্তীকে 'বাঘা' উপাধি দেওয়ার যে-কারণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তা 'কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা' অধ্যায়ে বর্ণিত একই প্রসঙ্গের অনুরূপ বলে এখানে পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

৩. "বিখ্যাত Johnson-এর লেখা থেকে"—এখানে হবে "বিখ্যাত Joseph Addison (1672-1719)-এর লেখা থেকে"। অসতর্কতাবশতঃ কাজী সাহেব Johnson লিখেছেন। Coverley Papers হচ্ছে Joseph Addison-এর রচনা।

৪. "চার-পাঁচ বছরের মধ্যে"—কাজী সাহেব শিথিলভাবে এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। তিনি যে-সব মুসলিম মনীষী এবং নেতার নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন আরও অনেক বছরব্যাপী সময়ের মধ্যে। নামের তালিকায় তিনি সময়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি।

৫. মহসিন স্কুলে চাকুরী সংক্রান্ত ঘটনা 'কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথায়' বর্ণিত হওয়ায় এখানে বাদ দেওয়া হলো।

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

১৯১৭ সালে আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। এই কলেজ থেকেই সম্মানসহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তখনও ঢাকা কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ছিল। আমার প্রধান বিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা; আর সহকারী বিষয় ছিল গণিত (পাটীগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, আক্ষিক জ্যামিতি ও কৌণিক ছেদ বা কনিক সেকশন)। এই সঙ্গে ছিল দুটো আবশ্যিক বিষয়—ইংরেজী ও বাংলা। অবশ্য বি.এস. সি. পড়লে ইংরেজী ও বাংলার পরিবর্তে শুধু রসায়নবিদ্যা পড়লেই চলত। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজ ১৯১৫/১৬ সালে আচার্য প্রফুল্ল রায়ের 'আশ্চর্য ব্যবহারে' রসায়নবিদ্যার উপরেই আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। তৎকালীন নিয়ম অনুসারে আরও দুই বৎসর পাঠ করার পর ১৯২১ সালে পদার্থবিদ্যায় এম. এ. ডিগ্রী লাভ করি। ঐ বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রীর পরীক্ষায় আমিই একমাত্র পরীক্ষার্থী থাকাতে ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম।

এই স্থলে আমার এম. এ. ক্লাসের পদার্থবিদ্যার শিক্ষকবর্গের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করছি। আমি Dr. W. A. Jenkins-এর কাছে পড়েছি—উত্তাপ, আলোক, থার্মোডাইনামিক্স, স্থিতবিদ্যুৎ, প্রবহমান বিদ্যুৎ, আণবিক শক্তি, চুম্বকত্ব, দানাবদ্ধ মাধ্যম, বিদ্যুৎকণিকা, যীমানক্রিয়া, মাধ্যমের প্রচাপন, আপেক্ষিকতা (relativity), লরাফিট্‌জিরাল্ড প্রকল্প ইত্যাদি নানা বিষয়। এঁর সহায়তা করেছেন র‍্যাংলার ভূপতিমোহন সেন (B. M. Sen)। এই সময়, ১৯২০ সালের জুন-জুলাই-এর দিকে ঢাকা কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়, এবং সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বোস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করেন, প্রথমে পদার্থবিদ্যার রীডার হিসাবে। এই সময় জেঙ্কিন্স সাহেব কলকাতায় চলে যান ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন হয়ে। এর কিছুদিন আগেই জেঙ্কিন্স সাহেব আমাকে পদার্থবিদ্যার ডিমন্সট্রেটর (বা জুনিয়ার লেকচারার) করে নিয়েছিলেন, কিন্তু তখনও এম. এ. পরীক্ষা আমার সামনে, ১৯২১ সালের প্রথম দিকে। তাই তিনি সত্যেনবাবুকে অনুরোধ করে গেলেন, তিনি যেন আমার আসন্ন পরীক্ষার ব্যাপারে উপদেশ দেন। আর আমাকে বলে গেলেন, "তোমার যখনই কোনও বিষয় দুর্বোধ্য বলে মনে হয়, তৎক্ষণাৎ সত্যেনবাবুর কাছ থেকে বুঝে নিয়ো—ওঁর মত শিক্ষাদাতা আর কাউকেই পাবে না।" আমিও সত্যেনবাবু ও জেঙ্কিন্স সাহেব এই দুইজনের কথাই পালন করেছি। আর কোথায়ও খটকা বাধলেই অমনি সত্যেনবাবুর শরণ নিতাম,—উনি দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই পরিষ্কার করে সন্দেহ-ভঞ্জন করে দিতেন। আর তিনি উপস্থিত না থাকলে ওঁর টেবিলের উপর এক টুকরো কাগজে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টা লিখে দিয়ে আসতাম। উনি এসে কাগজখানার পাশে দুই-একটা বাক্য and etc.লিখে স্লিপখানা বেয়ারাকে দিয়ে আমার

www.pathagar.com

হাতে পৌঁছে দিতেন। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম, তিনি কেমন করে টের পেতেন, ঠিক কোথায় আমার খটকা লেগেছে! এই মহাপণ্ডিতের কাছে আমি আজীবন ঋণী, তাঁর স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসার জন্য। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর ছাত্র না হলেও দাবী করি, আমিই সত্যেনবাবুর "ছাত্রতম" ছাত্র!

এই যে "ছাত্রতম" শব্দটা ব্যবহার করলাম, এ আমার নিজের উদ্ভাবন নয়—এর একটা নজির আছে। একটু গোড়া থেকেই বলি : সত্যেনবাবু ঢাকায় আসবার কিছুকাল আগে এসেছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্; তার প্রায় সমসময়ে এসেছিলেন ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্যার এ. এফ. রহমান, ড. হরিদাস ভট্টাচার্য, ড. মুহম্মদ হাসান, ড. সুশীলকুমার দে, এবং আরও অনেকে। এঁরা সবাই মিলে-মিশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তবে এতগুলো তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহাশয়ের মধ্যে অবশ্যই বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যও ছিল।

একদিন জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট কোনও একটা সামাজিক অনুষ্ঠান করছিলেন। কোনও কারণে আমার একটু বিলম্ব হয়েছে তাই লক্ষ করে একজন ছাত্রকে পাঠিয়ে আমাকে সভায় নিয়ে আসলেন। দেখি লোকে লোকারণ্য—পুরুষদের দলে তিলমাত্র স্থান খালি নাই, তবে মহিলা-মহলে ঠাসাঠাসি কিছুটা কম। অবস্থা দেখে রমেশবাবু উচ্চকণ্ঠে ছাত্রটাকে বললেন, "ওই যে দুইজন লেডীর মধ্যে একটা ছোট্ট সিট খালি আছে ঐ খানেই বসাও—কিছু ইতস্ততঃ করোনা। He (কাজী সাহেব) is the ladiest of the ladies!" এইভাবে একটা টাইটেল পেয়ে গেলাম। এর সাদৃশ্যে আমি নিজেকে সত্যেনবাবুর "ছাত্রতম" ছাত্র বলে অবশ্যই দাবী করতে পারি।

একদিন রমেশবাবুর ছোট ছেলেটা সকাল থেকেই কাঁদা শুরু করেছে—কোলে-কাঁখে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও কান্না থামে না। তখন রাগ করে রমেশবাবুর স্ত্রী দরজার চৌকাঠের উপরকার একটা প্রশস্ত তাকের উপর ছেলেকে বসিয়ে রেখে চলে গেলেন। ছেলেটা কিন্তু কাঁদছেই। সময়টা ছিল বর্ষাকাল, ঝমঝম বৃষ্টি, রাস্তার উপর হাঁটু পানি জমে গেছে। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল, আর চেঁচিয়ে বলে উঠল—"মা! মা! দেখ কেমন করে একটা ছাতা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে!" মা তাকিয়ে দেখলেন, সত্যিই ত মানুষ দেখা যাচ্ছে না, শুধু ছাতাই ত দেখা যাচ্ছে! যাহোক ছাতাই আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে রমেশবাবুর বারান্দায় উঠে আসলো; তখন দেখা গেল এর নীচে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্! অতঃপর কথোপকথন শোনা গেল :

প্রঃ "ড. শহীদুল্লাহ্! তুমি এ অবস্থায় এখানে?"

উঃ "তোমার ভাগনে প্রবোধ-এর সঙ্গে কথা ছিল সকাল ৮টায় এসে একটা বিষয় আলোচনা করব।"

প্রঃ "তা, এই বৃষ্টির মধ্যে কেন? দুপুরে আসলেই পারতে?"

উঃ "তা কেমন করে হয়? আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা পালন না করে কি গোনাহ্গার হব? তা আমি কিছুতেই পারিনে।"

www.pathagar.com

যাহোক, পরে মিসেস্ মজুমদারের দেওয়া শুকনো কাপড় পরে বেলা একটা-দেড়টার সময় নিজের সদ্য শুকানো ধোয়া পায়জামা পরে শহীদুল্লাহ্ সাহেব ঘরে ফিরলেন। অবশ্য ইতিপূর্বে প্রবোধ পালকে পাশের ঘর থেকে ডেকে এনে বাংলা-বিভাগের আলোচ্য বিষয়ের আলোচনাও শেষ হয়ে গেছে। বলে রাখা ভাল, রমেশবাবু ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের পুরাতন সহপাঠী ছাত্র ও বন্ধু ছিলেন।

১৯২০ সালের জুন মাসে শহীদুল্লাহ সাহেব ঢাকায় এসে তৎকালীন 'সেক্রে-টারিয়েট মুসলিম হষ্টেলে'র হাউস টিউটর হিসাবে উত্তর-পশ্চিম কোণের ফটকের উপরতলায় বাস করতেন। আমি তখন ঢাকা কলেজের (বা বিশ্ববিদ্যালয়ের) আধা-ছাত্র, আধা-শিক্ষক। বৈবাহিক সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমার খালু শ্বশুর হতেন। যাহোক, এখন আসল কথায় আসা যাক। কথা হল এই যে আমি কোনও শনিবারে মুন্‌শীগঞ্জে নিমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলাম; পরদিন ফিরতি-পথে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছেই টের পেলাম হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেধে গেছে। তবু রেলে ঢাকা স্টেশনে পৌঁছে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছে ফোন করলাম, নিরাপদে হষ্টেলে পৌঁছবার ব্যবস্থা করার জন্য। উনি প্রথমে গেলেন ইংরেজীর তরুণ অধ্যাপক ডঃ হাসান সাহেবের কাছে—ওঁর মোটরে আমাকে ষ্টেশন থেকে হষ্টেলে নিয়ে আসবার অনুরোধ নিয়ে। কিন্তু হাসান সাফ 'না' বলে দিলেন। তখন শহীদুল্লাহ্ সাহেব তাঁর বন্ধু রমেশ মজুমদারের কাছে গেলেন। উনি শুনে তৎক্ষণাৎ নিজের মোটর নিজেই চালিয়ে বিপদাপদ অগ্রাহ্য করে, ষ্টেশনে গিয়ে আমাকে মোটর-যোগে নিয়ে এসে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের গেটে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে এই দুই অনুরুদ্ধের চারিত্রিক পার্থক্য কত বিপুল!

বলছি গোঁড়া হিন্দু হরিদাস ভট্টাচার্যের কথা। তাঁর মুখে বা জিহ্বায় অর্গল ছিল না বলে বাক্যের দাঁড়ি, সেমিকোলন, কমা অগ্রাহ্য করে একদমে যতটা কুলায় ততদূর পর্যন্ত মেল-গাড়ীর মত চলে একটু থেমেই আবার অনর্গল বক্তৃতা করে যেতেন। তিনি উঁচুদরের পণ্ডিত ছিলেন, তাই জিহ্বার দ্রুত-সঞ্চালন বা গলাবাজির ক্রীড়ায় তিনি অন্য সবাইকে বাজিমাৎ করতে পারতেন। তিনি দর্শনশাস্ত্র পড়াতেন; কিন্তু কি হিন্দুশাস্ত্র, কি মুসলিমশাস্ত্র, কি ইতিহাসশাস্ত্র সর্ববিষয়েই শাস্ত্রী ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি বহুবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে বক্তৃতা করতে গিয়েছেন। এতে বোধহয় নিমন্ত্রণকারীরা ভাল করে আমাদের বৈপরীত্য অনুভব করবার সুযোগ পেতেন। আমি ত ধীরে ধীরে থেমে থেমে (অর্থাৎ চিবিয়ে চিবিয়ে) কথা বলতে অভ্যস্ত,—বহু চেষ্টা করেও জিহ্বার রেলগাড়ী চালান শিখতে পারলাম না।

এইবার আমার অঙ্কের অধ্যাপক বঙ্কিমদাস ব্যানার্জির কথা একটু বলি। তিনি বোর্ডের উপর ছোট ছোট অক্ষরে আঁক লিখে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো পড়ে যেতেন। একবার কলেজের ইন্সপেকশনের জন্য স্যাডলার কমিশনের একজন মেম্বার দরজায় দাঁড়িয়ে বল্লেন, "আমি ক্লাসে ঢুকি ?" বঙ্কিমবাবু বল্লেন, "হাঁ, আসুন,—আর ওই প্রথম সারির বেঞ্চের খালি আসনটায় বসুন!" এই মেম্বরটির ন্যম র‍্যাংলার ডঃ জিয়াউদ্দীন (আলিগড় ইউনিভার্সিটি)। পড়ানোর ধরণ কিছুক্ষণ দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি

www.pathagar.com

কি মনে করেন ছাত্রেরা আপনার কথা বুঝতে পারছে ?" বঙ্কিমবাবু জওয়াব দিলেন, "তা, আপনি ছাত্রদেরকেই জিজ্ঞাসা করুন।" তখন তিনি ৪/৫ জন ছাত্রকে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে দেখলেন, প্রত্যেকেই ঠিক ঠিক জওয়াব দিচ্ছে। অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ যারা পিছনের বেঞ্চে রয়েছে, তারা কি বুঝতে পারছে ?" বঙ্কিমবাবুর ঐ একই জওয়াব, "তা ওদেরকেই জিজ্ঞাসা করুন"—এই বলে আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন। সেদিন আমার আধ মিনিট দেরী হয়েছিল বলে, আমি অনুমতি নিয়ে একদম পিছনের বেঞ্চে বসেছিলাম। তিনি আমাদের differential calculas (ব্যাবকলন) এবং integral calculas (সমাকলন) সম্বন্ধে কয়েকটা Fundamental (মৌলিক) প্রশ্ন করলেন। সেগুলোরও যথাযোগ্য জওয়াব পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়ে যাওয়ার সময় মন্তব্য করে গেলেন, "It is a pleasure to teach such a class and to be taught by such a professor. (এমন একটা ক্লাশে পড়ান অত্যন্ত আনন্দজনক; আর এমন একজন শিক্ষকের কাছে পড়াও ততোধিক সৌভাগ্যের কথা।)...অবশ্য এই মন্তব্যের ফলে, বঙ্কিমবাবু provincial Service থেকে Imperial Service-এ উন্নীত হয়েছিলেন। সম্প্রতি জনাব সৈয়দ মুর্তাজা আলীর সৌজন্যে বঙ্কিমদাস ব্যানার্জি সম্পর্কে কিছু সংবাদ জানতে পেরেছি। তা হল এই যে বঙ্কিমদাস ব্যানার্জি ১৯০১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে অঙ্কে অনার্স পাশ করেন। সেবার আর কেউ অঙ্কে প্রথম বিভাগে অনার্স পাশ করেননি। ঐ ১৯০১ সালেই তিনি অঙ্কে A-গ্রুপে এম.এ. পাশ করেন, তৃতীয় বিভাগে। আশ্চর্যের বিষয়, সেবার A-গ্রুপে কেউ ফার্ষ্ট ক্লাশ বা সেকেণ্ড ক্লাশ পাননি। (সেকালে একই বৎসরে বি.এ. অনার্স আর এম. এ. পরীক্ষা দিতে বাধা ছিল না।) ১৯০২ সালে তিনি B-গ্রুপে অঙ্কে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সেবার ঐ গ্রুপে কেউ প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করেন নি।

আমার ঢাকা কলেজের প্রত্যক্ষ শিক্ষকদের মধ্যে আরও আছেন জেঙ্কিন্স সাহেব, আদিনাথ সেন ও ভূপতিমোহন সেন; এঁরা সবাই বিখ্যাত পণ্ডিত। এস্থলে সবার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হলো না। তবু বলে রাখি আমার আধা-ছাত্র ও আধা-শিক্ষক-রূপ জীবনের স্থায়িত্বকাল Physics, Mathematics and Statistics (পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ও তথ্যগণিত বা পরিসংখ্যান)—এরমধ্যে মিশ্রিতভাবে বিস্তৃত। আমি পদার্থবিদ্যার অনেক সূত্রের বিকল্প প্রমাণ দিতে চেষ্টা করে অনেকক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছিলাম। এ-হচ্ছে বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি দেখে কোনও বিষয়কে দেখবার আকুতি,—এতে দৃষ্টি প্রসারিত হয় এবং বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা জন্মে। অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে (বিশেষতঃ জ্যামিতির ক্ষেত্রে) ম্যাট্রিকুলেশন পড়বার সময়ও অভিনব অঙ্কন করে দুই-একটা সমাধান করে স্কুল-শিক্ষক জ্যোতীনবাবুকে দেখিয়েছিলাম। তবে সবচেয়ে অধিক মৌলিকতা তথ্যগণিতের ক্ষেত্রেই দেখাতে পেরেছি।

আমিই সর্বপ্রথম বিশেষ বিশেষ শর্ত পালন করে পরীক্ষণ-প্রকল্প (design of experiment)-এর একটা পরিচ্ছেদ উন্মোচিত করেছিলাম। সেই পদ্ধতি এখন 'হোসেনের শৃঙ্খলা-নিয়ম' বা (Husain's Chain Rule) বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই

www.pathagar.com

নিয়ম ব্যবহার করে একই পরামাণ-সম্পন্ন একাধিক 'Symmetrical Balanced Incomplete Block Design' পাওয়া গেলে, সেগুলো মূলতঃ একই সমাধান, না শুধু নামবদল করে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে—তা সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যায়। সেগুলো মূলতঃ একই সমাধান হলে সেই সমাধানগুলোকে 'Isomorphic' বলা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্যগণিত (Statistics)— বিষয়ে M.A./M.Sc. স্তরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আমারই চেষ্টায় সম্ভব হয় (১৯৪৮ সালে)। আর আশ্চর্যের বিষয় তখনও কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজেও এই কোর্সটার অস্তিত্ব ছিল না। আমাদের অনার্স কোর্সের পরীক্ষার খাতা পাঠানো হত কলকাতায়। সেখানকার পরীক্ষকদের মন্তব্য হল—"আমাদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণও এমন গুছিয়ে জওয়াব দিতে পারে না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের লেখায় আমরা কোনও ত্রুটি খুঁজে পাইনি।" সেবারে পরীক্ষা দিয়েছিল আমাদের প্রথম ব্যাচের ছাত্রদ্বয়—কাজী ফজলুর রহমান ও মুহম্মদ গোলাম রব্বানী। দুইজনেই এখন প্রতিষ্ঠাবান উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী। পরবর্তী দলসমূহেও ড. আতীকুল্লাহ্, ড. মীর মাসুদ আলী, ড. আনেয়ার হোসেন, ড. আনোয়ারুল হক, ড. গোলাম মুস্তফা, ড. মাহবুব আহমদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদার্থবিদ্যা ও গাণিতিক পদার্থবিদ্যায়ও ড. আবদুল মতীন চৌধুরী, ড. ইন্নাস আলী, ড. আনোয়ার হোসেন, ড. মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি বিশিষ্ট ছাত্রের যশোগৌরবে আমি অতিশয় গর্ববোধ করি।

আমি ১৯৬৫/৬৬ সালে বয়সাধিক্যের ফলে তথ্যগণিত-বিষয়ের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করে I.S.R.T বা Institute of Statistical Research and Training (তথ্যগণিত ও তদ্বিষয়ে গবেষণা ও পরিশিক্ষণ)-এর পরিচালক হিসাবে কাজ করি। ১৯৭৫ সালে জাতীয় অধ্যাপক (বাংলাদেশ) খেতাব পাই; এবং ইতিপূর্বেকার প্রাপ্ত বিশিষ্ট গুণান্বিত অধ্যাপক (বা Professor Emeritus)-এর পদ পরিত্যাগ করি। এই নূতন পদের মাসিক বোনাস (আজুরা) ২২৫০ টাকা এবং প্রাক্তন পদের আজুরা ছিল ৭৫০ টাকা।

ঢাকা কলেজে আমি Sound (স্বর বা শব্দ) বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলাম; সেই সুবাদে ঢাকাস্থ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ও সঙ্গীত একাডেমীর প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। বর্তমানে সরকারের বিভাগীয় কমিশনারের হস্তে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে, এখনও আমি সঙ্গীত একাডেমীর প্রেসিডেন্ট হিসাবেই কাজ করে যাচ্ছি। কাজটি অবৈতনিক হলেও নিঃসন্দেহে মনোরঞ্জক। সঙ্গীতের ঔপপত্তিক দিকের প্রতিষ্ঠার খ্যাতির জন্যই বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে কয়েক বৎসর আগে 'বাংলাদেশের সঙ্গীত ও সাঙ্গীতিক বাদ্যযন্ত্র' সংক্রান্ত একখানা ইংরাজী পুস্তকের বাংলা অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন এবং নিরীক্ষার দায়িত্ব পালন করেছি। আমি স্থানীয় বাংলা একাডেমী এবং নজরুল একাডেমীর আজীবন সদস্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েরও একজন সদস্য; চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও মৈমনসিংহ বিশ্ববিদ্যালয়েও অনেক সময় (বিশেষ করে) সাহিত্যিক বক্তৃতা করবার জন্য আহূত হই। এছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের (ঢাকা শাখার) কয়েক বৎসর যাবৎ প্রেসিডেন্ট ছিলাম,

www.pathagar.com

এবং এখনও একজন সদস্য হিসাবে ধর্ম, মানবতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে এই মিশনের আলোচনাসভায় যোগ দিয়ে থাকি।

আমার যৌবনকালে যখন বাংলাদেশের মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু না বাংলা এই নিয়ে উদ্ভট বিতর্ক হত (পাকিস্তান হবার পরে) তখনও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমর্থন করেছি। এমনকি, বঙ্গ-বিভাগের আগে থেকেই 'মুক্তবুদ্ধি'র অন্যতম পরিপোষক হিসাবে ১৯২৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নামক একটা সার্বজনীন সংস্থা গঠিত হয়েছিল। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এ সংস্থার প্রথম শব্দটাই যখন 'মুসলিম' তখন এটাকে সার্বজনীন বলা যায় কেমন করে? উত্তর : এর শীর্ষস্থানে ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (মস্তিষ্ক), সৈয়দ আবুল হুসেন (হাত-পা-দেহ) কাজী মোতাহার হোসেন (হৃদয়); বন্ধনীর ভিতর যে শব্দগুলো আছে—এগুলোর প্রবর্তন করেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। ইনি আমাদের প্রায় সমুদয় মিটিং-এ উপস্থিত থাকতেন, এবং সময় সময় বক্তৃতাও দিতেন। এই 'সমাজে'র মুখপত্র ছিল 'শিখা' নামক এক বার্ষিক পত্রিকা; এতে বার্ষিক সভায় পঠিত সমুদয় প্রবন্ধ এবং সভাপতির ভাষণ ও সম্পাদকের মন্তব্য লিপিবদ্ধ হত। অন্যান্য সভায় পঠিত বহু প্রবন্ধে সওগাত, মোহাম্মদী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এসব প্রবন্ধের কোনওটাই সাম্প্রদায়িক বা কোনও বিশেষ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করতো না। তবু বুদ্ধি ও জ্ঞানকে উচ্চস্থান দেওয়া হত বলে তৎকালীন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজ যাতে আমাদেরকে নাসারা, নাস্তিক, ইহুদী বা পৌত্তলিক মনে না করেন সেইজন্যই (বোধহয়) সতর্কতা-সূচক 'মুসলিম' শব্দটা অগ্রভাগেই জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ সতর্কতাটুকু সম্ভবতঃ সৈয়দ আবুল হুসেনের কারসাজি; তবু এত করেও আমাদের যে কম ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছে, তা নয়। উপরে শুধু মৈত্র মশায়ের চিহ্নিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ছোট-বড় আরও অনেকে 'শিখা-গোষ্ঠী'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন—তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম মনে পড়ছে শুধু তাই উল্লেখ করছি। যথা : স্যার এ.এফ. রহমান, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো, আবদুর রহমান খাঁ, কবি নজরুল ইসলাম, আবুল ফজল, কবি আবদুল কাদের, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমলতা দাস, ফজিলতুন্নেসা, লীলা নাগ; এবং আরো অনেকেই 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মর্মকথার সমর্থক হিসাবে আমাদের উৎসাহ জুগিয়েছেন। আশাকরি আমাদের অনুল্লিখিত সুহৃদগণ আমার বার্ধক্য-জনিত এই স্মৃতি-ভ্রম অপরাধ ক্ষমা করবেন।

সাহিত্যের চেয়ে বোধহয় দাবাখেলার জন্যই আমার খ্যাতির পরিসর অধিক। সমসাময়িক মুসলিম বন্ধুদের কারো কারো মুখে নাকি শোনা গেছে—"ওঃ, কাজী সাহেব ত দাবাড়ু, ওকে আবার সাহিত্যিক বানালো কে?" আমি এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে যাচাই করে দেখতে যাইনি; তবে কথাটা একেবারে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। আমি ১৯২৫ সালে Statesman কাগজের 'King's Pawn' ছদ্মনামধারী সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত দাবা-সম্পর্কিত ব্যাপক প্রশ্নাবলীর সমাধান করে 'All India Chess Brilliance Championship' বা 'নিখিল ভারতীয় দাবা-বিচিত্রতা প্রতি-

www.pathagar.com

যোগিতার 'মহারথী' খেতাব পেয়েছিলাম। প্রশ্নগুলোতে জটিল-নির্দেশক গোপনীয় নম্বর দেওয়া ছিল। প্রায় ৪/৫ মাস ধরে প্রতি সপ্তাহেই প্রশ্ন পাবার সাতদিনের মধ্যেই জওয়াব পাঠাতে হত। আমি মোট ১০৩ নম্বরের মধ্যে ১০১ নম্বর পেয়ে প্রথম হই; আমার কিশোর-বন্ধু (কলকাতার দাবা-মহারথী সতীশচন্দ্র আড্ডি) ৯৯ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান, এবং একজন ইংরেজি ডি. লেডী ৯৭ কিংবা ৯৮ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এর সাক্ষী-স্বরূপ পুরস্কারের কাপ এখনও বিদ্যমান আছে। আমি দাবা-মহলে Q.M.H. নামে পরিচিত ছিলাম।

এ-সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা বলতে চাই: আমি সর্বভারতীয় 'পত্রযোগে দাবা' (বা Correspondence Chess) খেলায় অন্ততঃ সাতবার খেলে প্রতিবারই প্রথম স্থান অধিকার করে পুস্তকাকারে পুরস্কার পেয়েছিলাম। প্রত্যেক বছরই বিজ্ঞানকন্‌ফারেন্সে নেতা হিসাবে যাবার সুযোগ পেতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ের ডীন হিসাবে তাই মহীশূর,কাশী, এলাহাবাদ, বোম্বে কন্‌ফারেন্সে যোগ দেবার সুযোগ পেতাম। বোম্বাইয়ে ন্যায়রত্নম (?) নামক একজনের সঙ্গে Correspondence Chess খেলতাম। তাই তাঁর নাম-ঠিকানা আমার জানা ছিল। ন্যায়রত্নমের বাড়ীর কাছে এসে একটি দোকানে তাঁর বাড়ী কোনটি জিজ্ঞাসা করতে দোকানদার বললো, "ওঃ ঐ তো উনি কোথায় যেন যাচ্ছেন।" আমি বললাম, "একটু খবর দেবেন কি, যে ঢাকা থেকে Q.M.H. আপনার সহিত দেখা করতে এসেছেন!" দোকানের এক ছোকরা দৌড়ে গিয়ে ন্যায়রত্নমকে খবরটা বলায় উনি তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে আমাকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে চল্লেন। সকাল বেলা উনি কোনও ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াতেন। সেদিন টিউশনি করা ভেস্তে গেল। এইভাবে তিনদিন যাবৎ উনি আমাকে বাড়ীতে রেখে প্রাণ-ভরে দাবা খেললেন; আর প্রত্যহ সাঁঝের আগে সমুদ্রের দৃশ্য দেখাতে নিয়ে যেতেন। তিনদিন পরে, আমি মাইল দশেক দূরে যে বাড়ীতে অন্যান্য বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে অবস্থান করছিলাম, সেখানে আমাকে পৌছিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে আমি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম তাই নিয়ে আমার কন্‌ফারেন্সের সাথীরা বিশেষ উদ্বেগ বোধ করছিলেন। তখন আমার খেলার মান অটুট ছিল, তাই সবগুলো বাজীই জিতেছিলাম। ন্যায়রত্নমের আহ্বানে আরও দু-তিনজন দাবা-বন্ধু আমার সঙ্গে খেলতে এসেছিলেন; তাঁরাও আমাকে হারাতে পারেননি।

কৃষ্ণমাচারী ছিলেন মাদ্রাজের 'Chess News' পত্রিকার সম্পাদক। আমিও প্রতিমাসে তাঁর কাছ থেকে উক্ত পত্রিকাখানা বিনা-মূল্যেই পেতাম। তিনি দাবাখেলার যতরকম প্রারম্ভিক খেলা চালু আছে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতেন। আমি একবার পাঞ্জাবে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করি। তখন তিনি আমাকে অতিথি বানিয়ে নিলেন। প্রথমদিন ওঁর সঙ্গে তিনটি বাজী খেললাম। প্রথমবার আমি দাবার বইয়ের চালই দিলাম। তিনি একটাও ভুল করলেন না, বরং আমার একটি দুর্বল চালের সুযোগ নিয়ে আমাকে মাত করে দিলেন। এরপর থেকে আমি পুস্তকের আদর্শ চাল না দিয়ে, কিছু রকমারী সৃষ্টি করে 'অবস্থা-বুঝে-ব্যবস্থা' (অর্থাৎ Positional game) খেললাম। তাই করে শেষের দুটো বাজিই জিতলাম। পরে উনি নিজে আমার সঙ্গে আর একটি গেম-ও

www.pathagar.com

না খেলে শহরের সমুদয় উচ্চ পর্যায়ের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাকে খেলালেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীগোপালাচারিয়া, দীক্ষিৎ এবং আরও অনেকে। গবর্ণর শ্রীগোপালাচার্য আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়ীতে নিয়েও খেলেছিলেন। আমি একটি খেলায়ও হারিনি। দীক্ষিৎ এবং অন্যান্যদের সঙ্গেও সেই একই ফল হল। তাই দেখে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "How is it. Mr. Husain, that you play badly, but still win every game?" আমি বুঝেছিলাম, মদ্রাজীদের স্মরণশক্তি খুব প্রখর, সুতরাং নিয়মিত খেলাতে ওরা সহজে ভুল করবে না, তাই আমি মাঝে মাঝে নিরাপদ অনিয়মিত (irregular) চাল দিয়ে ওদের খেলার গভীরতা পরীক্ষা করছিলাম। অর্থাৎ প্রত্যেক চালের পর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কোন চালটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই নিরূপণ করবার জ্ঞান আছে কিনা, তাই দেখছিলাম। অনিয়মিত চালগুলোকেই গ্রন্থকীটেরা bad moves (ভুল চাল) বলে মনে করে।

আমি এলাহাবাদ, বেনারস ইত্যাদি স্থানেও খেলেছি, তখন আমার বয়স ৩০/৪০ বছরের মত। সব স্থানেই হার-জিত হয়েছে, কিন্তু জিতের সংখ্যাই বেশী। একবার মুর্শিদাবাদে গিয়ে এক বৃদ্ধ ওস্তাদের কাছে খেলে হেরে গিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে, (তিনি আরো বুড়ো হয়ে গেলে) তাঁকে হারিয়েছিলাম।

আমি দাবাখেলা শিখেছিলাম প্রথমতঃ কলকাতার সুফী সাহেবের কাছে; তারপর ঢাকায় এসে বৃদ্ধ মণ্ডল সাহেবের কাছে। তিনি আমাকে যত্ন করে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাইতে তাঁর অতি বৃদ্ধকালে তাঁর (প্রায়) সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলাম। এই-ত স্বাভাবিক! এরও কিছুকাল পরে আমার পিতৃভূমি বাগমারার পার্শ্ববর্তী হাবাশপুর গ্রামের দাবা-বিশারদ 'গোদা দত্তের' কাছে তিন গেম হেরে শেষে একটা মাত্র জিতেছিলাম।

বাস্তবিকপক্ষে ঢাকা শহরে আন্তর্জাতিক দাবাখেলার প্রচলন প্রধানতঃ আমারই কঠোর পরিশ্রমের ফল। কাজী মুহম্মদ শাকুর,জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, ডাঃ আকমল, ডাঃ মান্নান, প্রফেসর আবদুল হাই, আবদুর রহমান, কম্বর আলী, আবদুস সালেক, কাজী মাহবুব হোসেন—এঁরা সবাই, হয় আমার প্রত্যক্ষ ছাত্র, নয় আমার কোরফা ছাত্র (ছাত্রের ছাত্র)। এখন আমার বয়স অনেক হয়ে গেছে, তাই এখন আমি উল্লিখিত প্রায় সবার কাছেই হেরে যাই। দাবাখেলায় কার স্থান কোথায়, তা নির্ণয় করতে হলে তুলনা করতে হবে ৩০ থেকে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে কার খেলা সমসাময়িক অপর খেলোয়াড়দের তুলনায় কেমন ছিল, তাই বিবেচনা করে।

১৯৫৬ সালে তিনমাসের সফরে আমি আমেরিকার নিউইয়র্ক ওয়াশিংটন এবং অন্যান্য স্থানে গিয়ে সেখানেও স্থানীয় ক্লাবের প্রত্যেকের সঙ্গেই খেলে, অধিকবার জিতেছিলাম। অবশ্য ববি ফিশার সে-সময় ওয়াশিংটনে উপস্থিত ছিলেন না; থাকলে কি হত তা না বলাই ভাল! একটা বিশেষ সৌভাগ্যের কথা এই যে আমাদের ঢাকার তরুণ খেলোয়াড়গণ এখন বেশ লায়েক হয়ে উঠেছেন। আন্তর্জাতিক গ্রাণ্ডমাষ্টার লুটিকভ জনা ত্রিশের সঙ্গে যুগপৎ (Simultaneus) খেলায় কয়েকজন বালক-বালিকা

www.pathagar.com

এবং যুবতীর সঙ্গে পরাজয় স্বীকার করেছেন--যদিও ১৪/১৫ বছরের ঊর্ধ্বতর কোনও পুরুষের কাছেই হারেননি।

Statistics বা তথ্যগণিত সম্বন্ধে আমি যে-সব অভিনন্দন পেয়েছি, তাতে আমি অতিশয় গৌরববোধ করি। এ অভিনন্দন পেয়েছি তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহারথী স্যার রোনাল্ড ফিশার-এর কাছ থেকে। তিনি আমার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "I am particularly struck by the enterprise shown by Mr. Hussain. In order to solve new types of problems he has forged new methods by the application of which he has proved results which I had only guessed without being able to prove. He has gone more deeply into the subject than any previous writer. I whole-heartedly recommend that the Degree of Ph. D. be conferred on him." এই প্রশংসনীয় অভিমত পেয়ে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম এবং কোন্ গুণে আমি এমন ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য পাত্র হলাম, তা আমি সেসময় বুঝতে পারিনি। আবার ফিশার সাহেবই বা আমার যোগ্যতার ব্যাপারে অত্যুক্তি করবেন কেন? কিন্তু অনেক—অনেক পরে আমি তত্ত্বটা সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হয়েছিলাম। 'নতুন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন' কথাটার মর্ম হচ্ছে, আমার শৃঙ্খল নিয়ম, যা এখন 'Husain's Chain Method' নামে সকল উন্নত দেশেই খ্যাতিলাভ করেছে। এ নিয়মটা হঠাৎ আমার খেয়ালে এসেছিল। এই শৃঙ্খল-নিয়মই ফিশার সাহেবের ভাল লেগেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ এর ভবিষ্যৎ সম্ভাব্যতা প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছিলেন, আমি অতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারিনি। যাহোক এর ফলে আমি উদার-হৃদয় ফিশার সাহেবের বন্ধুদের দলে উন্নীত হতে পেরেছিলাম। তিনি তাঁর সমুদয় গবেষণার এক এক খানা প্রতিলিপি আমাকে দান করেছিলেন, আর আমার আহ্বানে তিনবার ঢাকায় পদার্পণ করেছিলেন, আর প্রত্যেকবারই উক্তি করেছিলেন, "I have come here to pay respects to my young friend. Dr. Husain." এ-সম্মান আমার স্বপ্নেরও অতীত। তাঁকে আমি পিতৃবৎ সম্মান করি। আর এইসঙ্গে কলকাতায় প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ডঃ রাজচন্দ্র বোস, ডঃ সমরেন্দ্র ঘোষ, মহীশূরের প্রফেসর মাধব (এ্যাকচুয়ারী) এবং আরো অনেকের বন্ধুত্ব লাভ করি। এসবই আমার ভাগ্যে ছিল। এতে আমি অতিশয় পরিতুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। এসবই সর্বশক্তিমান আল্লার দান।

আগেই বলেছি আমার সম্বন্ধে কথা উঠেছে, আমি দাবাড়ু, না বৈজ্ঞানিক, না সাহিত্যিক? এ-সূত্রে একটা কথা মনে পড়ে গেল। একসময় আমার শিক্ষক ড: মহলানবীশ বলেছিলেন, "কাজী, তোমার সঙ্গে তিনটে বিষয়ে মিল আছে পদার্থবিদ্যা, পরিসংখ্যান আর সাহিত্য।" এখন পদার্থবিদ্যা ত পুরোপুরি বিজ্ঞান; পরিসংখ্যানকে কেউ বলেন বিজ্ঞান আবার কেউ বলেন সাহিত্য। আর সাহিত্য তো সাহিত্যই—তার ভাষা বাংলাই হোক বা ইংরেজীই হোক। এতেও ত কোনও স্থির সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে না। মহলানবীশ সাহেব আরেকটু অগ্রসর হয়ে হয়ত "চারটে বিষয়ে মিল"—বলতে পারতেন, উক্ত তিনটের সঙ্গে গণিত বা অঙ্কশাস্ত্র জুড়ে দিয়ে তবু চতুর্বিধ বিষয়ের মিক্সচার রয়েই গেল। তবে 'বিজ্ঞান'-ও কথায় প্রকাশ করতে গেলে, কথার আর্টটুকু

www.pathagar.com

অগ্রাহ্য করা যায় না। "আমার বিজ্ঞান বিষয়ের পুস্তকেও আর্টের ছিটে আছে"—একথাও অনেক বলেছেন (সত্যেনবাবু পর্যন্ত), আর 'নজরুল কাব্য-পরিচিতি'ও অমিশ্র আর্ট! তাহলে বোধহয় টেনেটুনে কোনও কৌশলে (দাবার চালে) সহৃদয় বন্ধুগণ আমাকে 'সাহিত্যিক' বলেও চালিয়ে দিতে পারেন।

তাছাড়া, আমি নজরুল ইসলামের দোহাই দিয়ে বলতে পারি—সে আমার হাতের রেখা দেখে বলেছিল, "তুমি আবার 'বিজ্ঞান' পড়ছ কেন ? আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার কাব্যিক শক্তি প্রবল, তবে যখন যে-টায় হাত দেবে তাতেই যশ অর্জন করতে পারবে বটে।"

Ph. D, D. Sc. জাতীয় অধ্যাপক ইত্যাদির সোজা পাল্লার উপর যদি শাকের আঁটি হিসাবে সারস্বত সমাজের 'বিদ্যাসাগর' যোগ দেওয়া যায়, তাহলে হয়ত নিছক বিজ্ঞানের থেকে বাংলাসাহিত্যের দিকে পাল্লাটা কিঞ্চিৎ হেলেও যেতে পারে বৈকি!

লোকসাহিত্য পত্রিকা
আষাঢ়-পৌষ-১৩৮৬
জুলাই-ডিসেম্বর-১৯৭৯

www.pathagar.com

আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা

কারো সাহিত্যিক জীবন ঠিক কখন আরম্ভ হয়, বলা যায় না। বাল্মীকির সাহিত্যিক জীবন যে ক্রৌঞ্চমিথুনের বাণবিদ্ধ অবস্থা দেখেই হঠাৎ আরম্ভ হয়েছিল, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বলতে গেলে সাহিত্যের উপাদান বিশ্ব-সংসারে ছড়িয়ে রয়েছে, আর ঘটনার মধ্য দিয়ে অবিরত প্রবাহিত হচ্ছে। এর প্রভাব সকলের মনেই অল্পবিস্তর ক্রিয়া করে থাকে। লোকের, অর্থাৎ পাঠক সাধারণের মনেও সাহিত্যিক অঙ্কুর রয়েছে। অন্যথায় সাহিত্যের সমঝদার থাকত না, অতএব সাহিত্যও পুষ্ট বা সমৃদ্ধ হতে পারত না। তাই সাহিত্য-রচয়িতার একটি প্রস্তুতি-যুগ মানতে হয়। 'নীরব কবি'র অস্তিত্বকে রবীন্দ্রনাথ যেমন অনায়াসে বিদ্রূপের ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন, আমার মন তাতে সায় দেয় না। কারণ, তাহলে আমার মত নীরব সাহিত্যিকের অস্তিত্বও অস্বীকার করতে হবে। অন্য সবার অস্তিত্ব নস্যাৎ হয়ে যায় যাক, কিন্তু নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কে কবে সন্দিহান হয়েছে ? তবু বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে, যখন অহংটা কিছু নিষ্ক্রিয় থাকে, মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, 'সত্যই কি আমি সাহিত্যিক ?' তবে ভেবে দেখেছি, সাহিত্যিকের সংজ্ঞাটা একটু ঢিলে বা আঁট করে দিলেই আমার মত শতসহস্র লোককে 'সাহিত্যিক' বলাও যেতে পারে, আবার না-ও বলা যেতে পারে। তাই ধরে নেওয়া যাক, 'ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড' ক্লাসের সাহিত্যিক না হলেও হয়ত বা সংজ্ঞার হের-ফেরের সুযোগে নিজেকে 'ইণ্টার ক্লাস' সাহিত্যিক হিসাবে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৪৪ কি '৪৫ সালে কোনও উৎসব উপলক্ষে বাংলা আবৃত্তি হবে, তার মহড়া চলছিল আমার বাসস্থানে, অর্থাৎ ফজলুল হক হলের হাউস টিউটরের আবাস ভবনে। একজন সদ্য বি. এ. পাশ গ্রাজুয়েট রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতাটা পাঠ করলো; কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল, এ কবিতার মজাটা কোথায়, সে কিছুই ধরতে পারেনি। তখন নয় বছর বয়সের আমার এক পুত্রকে ডেকে এনে তাকে দিয়ে পড়ান গেল। এ কবিতা সে আগে কখনও পাঠ করেনি; তবু ছন্দ ও ভাব বজায় রেখে এমন চমৎকার করে পড়লো, যাতে কারো মনে সন্দেহ রইল না যে ছেলেটা পড়তে পড়তেই কবিতার রস পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছে। বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যের সমঝদারীকে তার-যন্ত্রের সহস্পন্দনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বীণার সব তার যদি যথার্থ গ্রামে বাঁধা থাকে, তবেই প্রধান তারের ধ্বনি 'চিকারী'র তারে সহধ্বনিত হয়ে জমজমাট সুরের সৃষ্টি করতে পারে। সাহিত্যিকের হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো যেন বহির্জগতের আঘাতের প্রতীক্ষায় উন্মুখ রয়েছে; সাহিত্যের ছন্দাঘাত ও ভাবাঘাতে সুরেবাঁধা হৃদয়বীণা অমনি ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। এ-ই বোধহয়, সাহিত্যিক আনন্দ ও সমঝদারীর গোড়ার কথা। আর একটি কথা এই,—যার হৃদয়ে সাহিত্যিক চিকারীর

www.pathagar.com

উন্মেষ হয়নি, তাকে অনেক শিখিয়ে পড়িয়ে বি. এ. এম. এ. পাশ করানো গেলেও সাহিত্যিক করে তোলা যাবে না। প্রবাদ আছে ঈসা পয়গম্বরের গর্দভ মক্কা ঘুরে এলেও যে-গর্দভ সেই গর্দভই থাকে। কথাটা আর কোনো বিষয়ে খাটুক আর নাই-ই খাটুক সাহিত্যের ব্যাপারে নির্ঘাত সত্য।

কিন্তু এর থেকে যেন কেউ মনে না করেন যে সাহিত্যে শিক্ষার মূল্য কিছুই নেই। শিক্ষার মূল্য যথেষ্ট আছে; তবে শিক্ষার পানি উপযুক্ত ক্ষেত্রে বা পাত্রে পড়া চাই। নইলে ফসলও ফলবে না, কুণ্ডও ভরে উঠবে না। ধর্ম-শিক্ষার ব্যাপারে ত স্বয়ং আল্লাও স্বীকার করেছেন—শ্রুতিহীন, বাক্‌হীন, দৃষ্টিহীন যারা, তাদেরকে উপদেশ দেওয়াও যা না দেওয়াও তাই: তারা কখনই গ্রাহ্য করবে না। আল্লাহ্‌র কথা অবশ্য 'সন্দেহ-বিমুক্ত' নিত্য-সত্য—শুধু ধর্মক্ষেত্রে নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রে। তবু ভরসার কথা, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমার মত অপুষ্ট মানুষদেরও একেবারে নিরাশ হবার কারণ নেই।

সাহিত্যের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। এর মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প প্রভৃতি সবক্ষেত্রে বিচরণ করবার মত সজারু, খরগোস, মৃগ বা অলি-পতঙ্গ খুব কমই আছে। তবু যে কোন একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ নিবিড়ভাবে ধরে থাকতে পারলে—অর্থাৎ উক্ত অঙ্গের বিশেষ স্পন্দনটার সঙ্গে নিজের সুর বেঁধে নিতে পারলে—হয়ত বা ইণ্টারক্লাসের ক্ষুদে সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা ঘেঁষাঘেঁষি আসনের দাবী চলতে পারে। যাদের হাত বড়, তারা বড় আম ধরুক, ছোটদের ছোট হাতে বড় আম ধরে রাখা যাবে না। কথাটা কত সহজ, তবু বহু লোকের সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে অনেক বিজ্ঞ 'সাহিত্যিক'ও একথাটা বুঝতে চান না বা বুঝতে পারেন না।

সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার বহু রূপ। উপরে যা বর্ণনা করা হলো সে হয়ত দেখে শেখার অভিজ্ঞতা। এ-ছাড়া ঠেকে শেখার অভিজ্ঞতাও সাহিত্যিক জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা। প্রতিদিনের সাহিত্য সাধনায় যখনই মনের ভাব প্রকাশ করবার মত শব্দটা পাওয়া যায় না, পরে বহু চিন্তা, আলোচনা বা আকস্মিক উদ্ভাসনা দ্বারা কথাটা ধরা পড়ে, তখনই সেটা ঠেকে শেখার পর্যায়ে পড়ে। এ ব্যাপারে আমি যে কত গুরুজন, বন্ধুবান্ধব বা পথের সাথীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষালাভ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। অবশ্য ঠেকে শেখারও একটা শর্ত আছে ঃ সাহিত্যে প্রয়োগ করবার সময় কোনও বিশেষ শব্দ, বাক্যাংশ বা বাগ্‌ভঙ্গী ঠিক লাগ-সই হচ্ছে কিনা এ বোধটা অন্ততঃ জন্মান চাই। এই বোধ না থাকাতে আজকালকার অনেক নামজাদা সাহিত্যিক পণ্ডিতও নির্বিচারে ও নির্বিকারে অপপ্রয়োগ চালিয়ে যাচ্ছেন। হয়ত তাঁরা মনে করেন, নতুন যুগের লেখকদের পুরানো যুগের কায়দা-কানুন মেনে চলবার কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। কথাটা যুগান্তকর প্রতিভাশালী লেখকদের বেলায় অবশ্যই খাটে। তবে, সবাই যদি প্রতিভাশালী হয়ে ওঠেন, তবে সাহিত্যিক অরাজকতার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা, এমন কি তা-ই হয়ে উঠেছে! সব রজনীই যদি শবে-কদর হতো, তাহলে শবে-কদর বে-কদর হয়ে পড়তো এই প্রাচীন বাণীটা আমাদের নবীন লেখকরা (এবং কোন কোনও নবীনপন্থী প্রবীণ লেখকও) বে-মালুম ভুলে যাচ্ছেন। সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে এটা আমার এক বিশেষ অভিজ্ঞতা,—তাই এখানে এ কথাটা উল্লেখ না করে পারলাম না।

www.pathagar.com

জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তার স্মৃতিই সাহিত্যের উপকরণ। অভিজ্ঞতা যাদের মনে সঞ্চিত হবার অবকাশ পায় না, তাদের সাহিত্যিক হবার প্রচেষ্টা দুরাশা বৈ কি! তবে, সুখের বিষয় জীবনের সব স্মৃতিই কেউ ভোলে না। বিশেষ করে বাল্যস্মৃতি সহজে মুছে যাবার নয়। কাজে কাজেই প্রায় সকলেই এই স্মৃতি-সংযোগেই সাহিত্যের অল্প-বিস্তর সমঝদার হয়ে থাকেন। আর যাঁরা বাল্যস্মৃতিগুলোকে পুনঃ পুনঃ উদ্‌ঘাটিত করে সেই সব উপকরণে নিজের এবং আর সবার জন্য একটা স্বতন্ত্র কল্প-জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁরাই বোধহয় কাব্য-উপন্যাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে মনোজগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জগতের ঘটনাদির সংমিশ্রণ করে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিক হতে পারেন। হয়ত এঁদেরই ক্ষুদ্র এক শাখা, যাঁরা কল্পনা ভালবাসলেও বাহুল্য বর্জন করতে চান, যাঁরা কাব্য উপন্যাস উপভোগ করতে পারলেও এ সবের নির্যাসেই তৃপ্ত তাঁরা হয়ত রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে অধিকতর সংস্পর্শ রেখে প্রবন্ধ রচনা করেন, এমন কি কেউ কেউ প্রবন্ধ-সাহিত্যও রচনা করে থাকেন। সাধারণ ভাবে বলা যায়, যে রচনা মানুষের সুপ্ত স্মৃতিকে জাগ্রত বা উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তা-ই সাহিত্য বলে গণ্য। একদিকে প্রবন্ধের শীতল মেরুমণ্ডল, অন্যদিকে কাব্য-উপন্যাস-উপাখ্যানের উষ্ণ বিষুবমণ্ডল, এই দুয়ের মাঝখানে বোধহয় নাটক, নাট্য-কাব্য ও ছোটগল্পের নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল। এ-গুলোতে প্রবন্ধের সংযমও আছে, আবার ঘটনার প্রবাহের উদ্দামতাও আছে।

মোট কথা, সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ ধারা পাঠক সমাজকে বিশিষ্ট ধরনের আনন্দ দান করে, আর সেই সঙ্গে তাঁদের মানসিক পটভূমিও প্রসারিত করে দেয়। বিশেষ করে মাঝে মাঝে বিরাট প্রতিভাশালী সাহিত্যিকরা প্রচলিত ধারা অপ্রত্যাশিতভাবে বদলে দিয়ে নতুন ধারার প্রতিষ্ঠা করেন। আমার মত সাধারণ পাঠক এঁদের সৃষ্টি-রহস্যের অতল-তলে পৌঁছতে না পেরে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। এমন কি, জাঁদরেল সমালোচকরাও প্রথমে প্রচণ্ড হৈ-হল্লা করলেও অবশেষে এঁদেরকে স্বীকার করে নিতে (বা, অন্য কথায়, তাঁদের সমালোচনার বাঁধা-ধরা নীতিগুলোর একটু আধটু রদবদল করে নিতে) বাধ্য হন। কোনও ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারে কয়েক যুগ এমন কি, কয়েক শতাব্দীও কেটে যেতে পারে। জীবনকালে শরৎ-রবীন্দ্র-নজরুল-সাহিত্যের কিঞ্চিৎ স্পর্শ লাভ করে বুঝতে পেরেছি, এঁদের সান্নিধ্য বিশেষ উদ্দীপক বটে, কিন্তু চেষ্টা করলেও এঁদের অনুকরণ করা যায় না। নিজের ভিতরে যদি কোনও সাহিত্যিক স্ফুলিঙ্গ থাকে, আর তা যদি কোনও প্রতিভাবান সাহিত্যিকের উজ্জ্বল বর্তিকার অন্ততঃ কিছুটা সহধর্মী হয়, তবেই সেই স্ফুলিঙ্গে একটু বিশেষ রঙ ধরতে পারে, নতুবা সৃষ্টি-ব্যাপারে লাভের খাতায় 'নৈব নৈবচ'।

মনে পড়ে, ১৯১২ সালে কুষ্টিয়া স্কুলে থার্ড ক্লাসে (বর্তমানে অষ্টম শ্রেণীতে) পড়বার সময় আমার শ্রদ্ধেয় মাষ্টার জ্যোতীন বাবুর উৎসাহ ও আদেশে শহরের একটা উন্মুক্ত রচনা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলাম। রচনার বিষয় ছিল 'দামোদরের বন্যা'। দামোদর দেখিনি, বাঁধ বাঁধা নদীও তখন দেখিনি। কেবল, খবরের কাগজে একটু আধটু বর্ণনা পড়েছিলাম। আমার ভাষা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে একটু হাল্কা আর রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কিছু ভারিক্কি। সে যুগে চোস্ত ভাষা বলতে বঙ্কিমী

www.pathagar.com

ভাষাই বুঝাত; গতানুগতিক রচনা প্রবেশিকার থেকে মুখস্থ করা ভাষা আমার রফ্‌ত ছিল না, তবে হয়ত লেখার মধ্যে স্থানীয় বন্যা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের কিছুটা পরিচয় ছিল। বোধ হয়, এই কারণে আর অতি বিশুদ্ধ সমাসবদ্ধ মার্জিত ভাষার জোরেই (প্রতিযোগীদের মধ্যে কয়েকজন বি. এ., এম. এ. ক্লাসের ছাত্র থাকা সত্ত্বেও) প্রাইজটা আমি পেয়েছিলাম। আজ পরম প্রীতি-শীল শিক্ষক শ্রীযুক্ত জ্যোতীন্দ্র মোহন রায়কে আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম উন্মেষক হিসাবে সর্বাগ্রে স্মরণ করি। কলেজজীবনে রাজশাহীতে জনাব মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, আর ঢাকায় জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন এই দুজনই আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বিশেষ করে শামসুদ্দীন সাহেবই নাছোড়বান্দা হয়ে আমার দ্বারা দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়ে নিয়ে নিজে উদ্যোগী হয়ে সওগাত পত্রিকায় ছাপাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে বি. এ. পড়বার সময় ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে 'সুন্দর' নামে একটা প্রবন্ধ লিখি। দেখা যায় ততদিনে ভাষাটা অনেকটা রাবীন্দ্রিক হয়ে এসেছিল আর ভাবও প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের থেকে ধার করা। যাহোক, প্রবন্ধটা ইদানীং আবার পড়ে দেখেছি, তাতে আর যা-ই ত্রুটি থাকুক, অন্ততঃ ভাষাগত ত্রুটি খুঁজে বের করা কঠিন।

এ সময়কার সাহিত্যিক সংস্পর্শের মধ্যে ডাঃ লুৎফর রহমান, আর কবি গোলাম মোস্তফার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লুৎফর রহমান সাহেব তখন (১৯২০) জোর-ওয়ারগঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন, আর 'রায়হানা' নামক একখানা উপন্যাস সবে মাত্র প্রকাশ করেছিলেন। সে সময় আমি মাত্র পনর দিনের জন্য হেডমাস্টার হিসেবে জোরওয়ারগঞ্জ স্কুলে যোগ দিয়েছিলাম। ডাক্তার সাহেব অমায়িক ব্যবহার আর ছাত্রদের শারীরিক, নৈতিক আধ্যাত্মিক সর্ববিধ উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা দ্বারা সকলেরই মনোহরণ করেছিলেন। গোলাম মোস্তফা সাহেবের কবিখ্যাতি তখন ছাত্রমহলে বিশেষ ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। তাই আমি 'স্কুলিঙ্গ' কুড়োবার জন্য পদব্রজে তাঁর স্বগ্রাম মনোহরপুরে গিয়েছিলাম। কবি বাড়ীতে ছিলেন না, কবির বৃদ্ধ পিতা বিশেষ খাতির যত্ন করে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। এই সময় পাংশার জনাব রওশন আলী চৌধুরী, আর ইয়াকুব আলী চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে এবং উল্লাপাড়ার এলাকাধীন বেলতৈল গ্রামে জনাব বরকতউল্লাহ সাহেবের গ্রামবাসী ঔপন্যাসিক জনাব নজীবর রহমান সাহেবের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। এঁদের সমাজচেতনা আর মুসলিম-জাগরণ প্রচেষ্টায় দেশের প্রভূত উপকার হয়েছিল একথা সকলেই জানেন। জনাব ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সঙ্গে জীবনে কেবল একদিন মাত্র দেখা হয়েছিল, ছাত্র-জীবনে (১৯১৭ সালে) ঢাকার আর্মানীটোলা পিকচার প্যালেস হলে। শিরাজী সাহেব বুকের উপর দুই হাত রেখে অনর্গল বক্তৃতার যে 'অনল-প্রবাহ' সৃষ্টি করেছিলেন, তা শুনে বিস্ময় আর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েছিলাম। কিন্তু এ দেখা ছিল দূর থেকে 'বিজয়-কেশরী' দেখার মত। ১৯৪৬ সালে বা তার দুই এক বছর আগে-পাছে কবি কায়কোবাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। এ পরিচয়ও অনেকটা দূর থেকে সালামের মত। কারণ তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবধান প্রায় দুই যুগের। তাঁর যুগে হেম-নবীনই ছিলেন সাহিত্য বা কাব্যের দিক্‌পাল; আমাদের কালের দিক্‌পাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কায়কোবাদ রবীন্দ্রনাথের

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠতা বা বৈশিষ্ট্য কোনও দিনই ভাল করে বুঝে উঠতে পারেন নি; আর কালধর্মের আবর্তনে আমরাও হেম-নবীনের দলকে কোনও দিনই পুরোপুরি শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারিনি। এ-রকম ঘটনা হয়ত সাহিত্যিক ট্রাজেডী, কিন্তু এর এলাজ নেই।

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব আমার স্বগ্রামের লোক। তাই, বাল্যকাল থেকেই তাঁর সঙ্গে চেনাশুনা। তিনি শহরের স্কুলে পড়তেন, আর ছুটিতে মাসখানেকের জন্য গ্রামে বেড়াতে আসতেন। তিনি আমাকে একটি বুদ্ধিমান ভাল ছেলে বলে স্নেহ করতেন, সময় সময় তর্কশাস্ত্রের হেঁয়ালী দিয়ে যুক্তিশক্তির পরখ করতেন। ইংরাজী লেখার সময় এ-বি-সি-ডি প্রভৃতি গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে স্থান সংক্ষেপ করা যায়, এ কায়দা তিনিই আমাকে শেখান। এতে আমার শ্রদ্ধা আর বিস্ময় বাড়বারই কথা; এ ছাড়া, তাঁর উড়ানো 'ঢাউশ' ঘুন্নির উচ্চতা, গ্রাম্যতা-মুক্ত শহুরে ভব্যতা এবং চিন্তার বৈশিষ্ট্য বা মৌলিকতা আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করতো। পরে চাকুরী জীবনে অর্থাৎ যৌবন কালেও অনেকদিন ঢাকায় একসঙ্গে থেকেছি। তাই তিনি সাক্ষাৎভাবে আমার স্কুলের শিক্ষাদাতা না হলেও, অনেকাংশে বিশেষ করে চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে গুরু-স্থানীয় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই সময় জনাব আবুল হুসেন সাহেবও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হয়ে আসেন। এঁরা এবং আবদুল কাদির, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন, শামসুল হুদা, আবদুস সালাম প্রভৃতি কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র মিলে ১৯২৬ সালে একটি মুসলিম সাহিত্য-সমাজ গঠন করেন। 'বুদ্ধির মুক্তি' ছিল এই সমাজের মূলমন্ত্র। এই সময় একটা আল মামুন সমিতিরও প্রতিষ্ঠা হয়। এই সব সমাজ বা সমিতির মিটিং-এ মুসলিম সমাজের বহু চিন্তার বিরুদ্ধে গরম গরম প্রবন্ধ পাঠ করা হত। চিন্তাশীল ছাত্রেরা স্বভাবতই এতে উৎসাহী হয়ে উঠল। এই বছরেই মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক সভার আয়োজন করা হয়। এর পিছনে কর্মশক্তি ছিল আবুল হুসেনের, চিন্তাশক্তি ছিল আবদুল ওদুদের, নৈতিক সমর্থন ছিল নব-যুগের, আর (কারও কারও মতে) হৃদয়শক্তি ছিল মোতাহার হোসেনের।

আমি তখন সময়ে অসময়ে ওস্তাদী গানের কসরৎ করে অনেকের দিবা-নিদ্রা বা নৈশ-নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতাম। বোধ হয় এই অপরাধে আবুল হুসেন সাহেব আমাকে সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা রচনা লিখতে বললেন। তাই, দীর্ঘদিন সাহিত্যিক অ-চর্চার পর এই বার্ষিক সম্মেলনের অজুহাতে 'সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধ দিয়ে আমার একগুচ্ছ সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল। সেই সঙ্গে অনেক বাদানুবাদ,—আত্ম-মত সমর্থন আর পরমত ক্ষালনের পালা—অনেক দিন ধরে চললো। আবদুল ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' ও 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা', আবুল হুসেনের 'নিষেধের বিড়ম্বনা' ও 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ', মোতাহার হোসেনের 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ' ও 'নাস্তিকের ধর্ম' এবং আরও অনেকের ঝাঁঝালো ধরণের প্রবন্ধসম্ভারের আলোচনায় পূর্ব-বাংলা গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো।

এই সময় লক্ষ করলাম, আমার ভাষার বঙ্কিমী ও রাবীন্দ্রিক ভাব কেটে গিয়ে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য এসে পড়েছে। দীর্ঘ সমাস, আর দুরূহ শব্দ বিদায় নিয়েছে; ভাষা হয়ে উঠেছে সহজ, প্রাঞ্জল আর বাহুল্যবর্জিত বা অনাড়ম্বর—যাতে পরিমাণ মত মূর্চ্ছনা থাকলেও গিটকারীর প্রাধান্য নেই।

www.pathagar.com

অবশ্য, দুই দল হতে কখনই বিলম্ব হয় না। অতএব এই সুযোগে মৌলানা সম্প্রদায় এম. এ. বি. এ. বার-এট-ল প্রমুখ সরকারি চাকুরে দল এঁরা সব জোট বাঁধলেন মাসিক মোহাম্মদীর নেতৃত্বে; আর মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিবাদীর দল (বা তথাকথিত 'কাফের' ও 'মুতাজিলা'র দল) জোট বাঁধলেন মাসিক সওগাতের সহযোগিতায়। অবশ্য উভয় দিকেই বড় বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক আসরে নামলেন। আবার অনেকে অবলীলাক্রমে দো-দিল বান্দার ভূমিকা গ্রহণ করতেও ত্রুটি করেন নি। যা-হোক এর ইতিহাস লিখবার সময় এটা নয়। তবে বলা আবশ্যক, 'তাজা বতাজা'র গায়ক কবি নজরুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত গীত 'আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালী' 'নবীনের আসার পথে' ফুল-ডালি 'উজার করে' দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় সভায় উপস্থিত সকলেই—তা, তিনি সওগাত-পন্থীই হোন, বা মোহাম্মদী-পন্থীই হোন—গানটি শুনে একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। সমস্ত মজলিস গুলজার হয়ে উঠেছিল। অন্ততঃ সে সময়টা সঙ্গীত জায়েজ কি না-জায়েজ, এ প্রশ্ন কেউই উত্থাপন করেন নি।

না বুঝে সমালোচনা করা, বা কারো লেখার আজগবী অর্থ-বিকৃতি করে তাই নিয়ে ঝগড়া করা আমাদের একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই, ইসলামকে ভাল করে বুঝে দেখবার চেষ্টাকে, বা এর সঞ্চিত কুসংস্কার অর্জন করবার আবেদনকেও অনেকে ইসলামের প্রতি হামলা বলে ভুল করেছিলেন; আবার অন্যদিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংস্কারের উন্মাদনায় সাধারণ জন-মতের প্রতি সহানুভূতিহীন অবাঞ্ছিত উক্তিও উচ্চারিত হয়েছে। ফলে সনাতনপন্থীদের কাছ থেকে কিছু কিছু জোরজবরদস্তিরও সূচনা হয়েছিল। এ অবস্থায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব, বিশেষ বিপৎপাতের সম্ভাবনা উপেক্ষা করেও আপোশরফা করতে চেষ্টা করেছিলেন, এবং বহুলাংশে সফলও হয়েছিলেন। এজন্য সাহিত্য-সমাজের সকলেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। যাই হোক, আট দশ বছরের প্রচেষ্টায় প্রগতিবাদীরাও কতকটা ইসলামের মর্ম অনুভব করতে পেরেছিলেন, আবার সনাতনবাদীরাও কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তিবাদীদের সঙ্গে হাত-মিলাবার জন্য খানিকটা অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন। এর ফলে উভয়ের মধ্যেকার ব্যবধানটা যে কিছু হ্রস্ব হয়েছিল, এই নীট্ লাভ।

এই সুযোগে নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার কিছুটা অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। এর ফলে কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতির উৎসমুখেরও কিছুটা অনুভূতি জন্মে। তাতে হয়ত সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমার লেখায় কিছু সজীবতা এসে থাকবে। আমার জীবনে আন্তরিকতার অভাব বোধহয় কোনদিনই ছিলনা, নজরুলেরও তাই। একারণে, নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দিনগুলো আমার সাহিত্যিক জীবনের অমূল্য সঞ্চয়। দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা (বৈজ্ঞানিক হিসাবে) আগে থেকেই ছিল, কিন্তু নজরুলের সংস্পর্শে এসে হয়ত মানুষকে আরও নিকট করে আপন বলে ভাবতে শিখেছি। এই দুর্লভ মানবীয় অনুভূতি যদি সত্যিই কিছুটা এসে থাকে, তবে তার ষোল আনা না হলেও অন্ততঃ বারো আনাই যে নজরুলের প্রভাবে হয়েছে, এ কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করবো।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী আমার রচনাগ্রন্থ 'সঞ্চরণ'-এর উচ্চ প্রশংসা করে বিশেষ উৎসাহিত করেছেন। শরৎ চ্যাটার্জি, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার,

www.pathagar.com

অন্নদাশঙ্কর রায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়—এঁরাও অত্যন্ত স্নেহ ও প্রীতি প্রকাশ করেছেন। আর, এখন যাঁরা পঞ্চাশ-ষাটের কোঠায় পা দিয়েছেন এমন অনেক নওজওয়ানের কাছে থেকেও সেকালে যথেষ্ট প্রীতি ও সম্মান লাভ করেছি। এঁদের সকলের কাছই আমি কৃতজ্ঞ। আর যাঁরা সংবাদপত্রের স্তম্ভে মন-খুলে গাল দিয়েছেন, তাঁদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। আমার লেখার কিছু কিছু নিশ্চয়ই এঁদের কাছে ত্রুটিপূর্ণ বা আপত্তিকর বোধ হয়েছে, হয়ত বা কারো কারো মনে আঘাতও দিয়েছে,—এসব অবশ্য আমার অজ্ঞাতসারেই হয়েছে। তাঁরা প্রকাশ করে না বললে আমি জানতেই পারতাম না। এঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে পরবর্তী লেখায় হয়ত বা আরও কিছু সংযত ভাবে বা সহানুভূতির সঙ্গে লেখনী চালনা করতে পেরেছি।

আমিও অনেকের লেখার সমালোচনা করেছি, অনেক সময় নিন্দাও করেছি। তবে পারতপক্ষে গুণের দিকটায় বেশী নজর দিয়ে দোষের দিকটা শুধু ইঙ্গিত করেছি, শোধরানোর উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে যে কোথাও আমার বিচারের ভুল হয়নি, তা কেমন করে বলবো : আমার কাছে যা ভুল বলে ঠেকেছে, তাকেই আমি ভুল বলেছি, আসলে সেটা ভুল না-ও হতে পারে। এখানে আমি নিরুপায়। কায়কোবাদ যখন রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করেন, তখন তিনি নিজের কাছে সাচ্চাই থাকেন। তবে কথা এই, নিজের যুগ-কে পেরিয়ে তিনি হয়তো নতুন যুগের রূপটা দেখতেই পান না। আমিও যে-যুগের লোক, সে যুগের সব সংস্কার কাটিয়ে নবীনের নবতর রূপ দেখতে পাইনে বলে হয়ত বিলকুল সাচ্চা 'দিল'-এই অনেক সময় অযথা নিন্দা করে থাকি। এসব স্থলে আমি নবীনের নিজের কথা শুনতে চাই; হয়ত তাতে পুরোনো চোখে নবীন আলোক ভালোও লেগে যেতে পারে।

বলাবাহুল্য, সাহিত্যের অনেক ক্ষেত্র আমার কাছে অপরিজ্ঞাত। যেমন, অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, আধুনিক গদ্য-কাব্য আমার ধাতে সয়না। এর কারণ কি ? প্রকৃতি ভেদে কোন কোন ছেলের মুখে দুধ রোচেনা, কোন কোন জন্তুর পেটে ঘি হজম হয় না; আবার শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করে বলা যায়, কেউ বিড়াল দেখলে চিড়বিড়ায়, কেউ বা মুখ-খোলা শুয়োর বরদাশ্‌ত করতে পারে না। বোধ হয়, এসব অকারণেই ঘটতে পারে তার কারণ খুঁজবার বৃথা চেষ্টা না করে বরং নবীনের কাছে দৃষ্টিদান প্রার্থনা করি, যেমন করে ইউসুফের জামার গন্ধে বৃদ্ধ ইয়াকুবের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছিল।

পরিশেষে বলতে চাই, বাল্যকাল থেকে এপর্যন্ত যে-সব বাংলা বই ভাল লেগেছিল, তার মধ্যে পদ্যমালা, শিশুশিক্ষা (তৃতীয় ভাগ), সীতার বনবাস, কপালকুণ্ডলা, প্রভাত-চিন্তা, উদভ্রান্ত প্রেম, জিজ্ঞাসা, মহাশ্মশান কাব্য, যমজ-ভগিনী কাব্য, বিষাদ-সিন্ধু, শ্রীকান্ত, পারিবারিক প্রবন্ধ, আবদুল্লাহ্, নবী-কাহিনী, মানব-মুকুট, জঙ্গনামা, মেসবাহুল ইসলাম, আনোয়ারা, গল্পগুচ্ছ, সবুজপত্র, মহুয়া, শেষের কবিতা, রক্তরাগ, বুলবুল, নকসী-কাঁথার মাঠ, লাল সালু, পথের পাঁচালী, সাত সাগরের মাঝি, বিশ্বনবী, কাশ-বনের কন্যা, আর বনি-আদমই বেশী করে মনে পড়ছে। এর থেকে যুগধর্ম, রুচির পরিবর্তন বা বিচিত্র সংমিশ্রণের সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বহু লোকের সংস্পর্শে, বহু

www.pathagar.com

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেই সাহিত্যিক জীবন পরিপুষ্ট হয়। এঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাই সে-চেষ্টা না করে বরং বাল্যকালে দেখা ঝোপঝাড়, পথ-প্রান্তর, ফকির-বোষ্টম, পাল্কী-বেহারা, চাঁদ-তারা, মেঘ-বিদ্যুৎ, নালা-ডোবা, ফেরিওয়ালা, সাপুড়ে এবং বাল্য-সাথীরা মনের চোখে যে অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিল,—আজো চোখ বুঁজলেই স্বপ্নে যাদের দেখতে পাই—সেই পরম আপনাদের কাছে বিদায়কালীন সালাম জানিয়ে যাই।

www.pathagar.com

একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত চিন্তা

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলার ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই দিন ঢাকা শহরের ছাত্রগণ এবং সাধারণভাবে যাদের মাতৃভাষার প্রতি দরদ আছে এরূপ বহু নাগরিক ও পল্লীবাসী বুকের রক্ত দিয়ে তাদের মায়ের মুখের বুলিকে মর্যাদার আসনে বসাবার দাবী উত্থাপন করেছিল। তখনও পূর্বপাকিস্তান নাম চালু হয়নি। বঙ্গের জনবহুল বৃহত্তর অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে ভারত সরকারও নিজেদের ক্ষুদ্রাংশের নাম পশ্চিম বাংলা রেখে পাকিস্তানী অংশকে শুধু বাংলা বলে অভিহিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের পূর্বাঞ্চল জনবহুল হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের অধিকর্তারা পাকিস্তান বলতে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানই বুঝতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের করাচী লাহোর পেশোয়ার পরিদর্শন করিয়েই তাঁদের পাকিস্তান-ভ্রমণ সমাপ্ত করে দিতেন, পাকিস্তানের যে আর-একটা অঞ্চল রয়েছে সে-কথা তাঁদের মনেই পড়ত না।

পাকিস্তান অর্জনের সময় যদিও কায়েদে আজমের তৎপরতা, কর্মদক্ষতা ও দৃঢ়তার ফলে বাংলার লোকেরাই সর্বান্তঃকরণে একযোগে মুসলিম তাহজীব-তমুদ্দুন সংরক্ষণের জন্য ভোট দিয়েছিলেন, তবুও তৎকালীন প্রভাবশালী পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ ভাবতেন কেবল পশ্চিম-পাকিস্তানের তথা পাঞ্জাবের নেতৃবৃন্দই যেন নবার্জিত পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, একমাত্র তারাই দেশপ্রেমিক মুসলমান, আর বাঙলার লোকেরা হিন্দুর ভাই, হিন্দুয়ানীই তাদের মজ্জাগত, সুতরাং তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এমনকি আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে খুন-খারাবীর উত্তেজনা-প্রদানকারী প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কোনও আলেম ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে অবাধে নিজের অনুগত কর্মীদের সহযোগে অনবরত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছেন, তার কোন রোকটোক নাই।

পূর্বাঞ্চলের ছাত্রেরা ও সর্বসাধারণ যখন বাংলা ভাষাকেও উর্দু ভাষার সাথে সমমর্যাদায় রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আন্দোলন করে তখন স্বয়ং কায়েদে আজম পর্যন্ত ঢাকায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে বিপুল জনসমাগমের সম্মুখে বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন "Urdu and nothing but Urdu shall be the state language of Pakistan." এই ঘটনার পর কার্জন হলে অনুষ্ঠিত কোন এক সভায় কায়েদে আজমের কাছে ছাত্রেরা প্রতিবাদ করাতে তিনি ছাত্রদের বিশেষভাবে তিরস্কার করেছিলেন। এরপর বহুদিন যাবৎ অন্যান্য নেতারাও এমনকি বাংলাদেশের কোনও কোনও নেতাও এই মতের প্রতিধ্বনি করেছিলেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের আমলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে এই আন্দোলন স্তব্ধ করবার জন্য ছাত্র-আন্দোলন-

www.pathagar.com

কারীদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। নূরুল আমিন সাহেব এই দুর্ঘটনার জন্য কদাপি ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই। তবে পরবর্তীকালে তিনি এর জন্য দায়ী নন বলে সাফাই গেয়েছেন বটে।

যা হোক এইসব ঘটনার থেকে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত পাকিস্তানেও বর্তমানে নবীনে-প্রবীণে শাসকবর্গ ও শাসিতের মধ্যে এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিশেষ গ্লানিকর মতবিরোধের অস্তিত্ব রয়েছে। বর্তমানে যারা ছাত্র আছে, ভবিষ্যতে তারাই দেশের নেতা হবেন; কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে বা অবস্থার চাপে বা অন্য কোন কারণে মনে হয়, ছাত্র থাকতে থাকতেই এঁদের অন্ততঃ এক বিশিষ্ট দল রাজনীতিতে নেমে পড়েছেন। দেশ চালানোর জন্য যে শিক্ষা, জ্ঞানার্জন, চরিত্রগঠন (বা অন্য কথায় শৃঙ্খলা ও পরমত-সহিষ্ণুতা) প্রয়োজন; নিপুণ শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, ব্যবসা-পরিচালক, শিল্প-পরিচালক, উকিল, মোক্তার, জজ, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি বৃত্তিধারী অসংখ্য জনদরদী লোকের আবশ্যক, সে-চিন্তা ও সেজন্য কালক্ষয় করবার ইচ্ছা যেন অন্তর্হিত হয়েছে। দুঃখের বিষয় মনে হচ্ছে বর্তমান ছাত্রবৃন্দের পূর্ববর্তী ছাত্রদলের কিয়দংশ মানবীয় কর্তব্য, লোকহিতের কথা ভুলে গিয়ে সম্ভবতঃ শুধু আপনস্বার্থ আত্মতোষণমূলক ব্যাপারেই অধিকতর লিপ্ত ছিলেন। দুর্নীতির অভিযোগে ৩০৩ জনের যে লিষ্ট বের হয়েছে তাদের বিচার এখনও হয়নি, তবুও এদের অর্ধাংশও যদি দোষী বলে সাব্যস্ত হয় সেটা হবে নিতান্তই করুণ উদ্‌ঘাটন। আমি আজীবন শিক্ষাকর্মে লিপ্ত ছিলাম ছাত্রদের সঙ্গে অনেক মেলামেশাও করেছি, একাডেমিক শিক্ষা দিতেও পারতপক্ষে ত্রুটি করিনি, তবু নিজেকে দোষী বলে মনে হচ্ছে—সব ছাত্রের মধ্যে সৎপ্রবৃত্তির উদ্বোধন করতে সক্ষম হইনি এটা নিদারুণ ব্যর্থতা।

পরম্পরাক্রমে ছাত্ররাই দেশোদ্যানের উৎকৃষ্ট ফসল। কিন্তু চারা-অবস্থাতেই যদি এই ফসল ভাবে আমি ফলবান হয়েছি, তাহলে সে হবে অলীক চিন্তা। অনেক ক্ষেত্র-কর্ষণ, মৃত্তিকা-চূর্ণন, পরিপোষক সার, মাটির রস, আকাশের সূর্যতাপ চাই আগে, তবে ত পাওয়া যাবে প্রতীক্ষিত ফল।

কিন্তু প্রতীক্ষার সময়টা অবহেলায় কাটালে আর কি সে-সময় ফিরে পাওয়া যাবে? কেমন করে ধরবে ফল? বোধ হয় এই বোধেই নজরুল গেয়ে উঠেছিলেন :

"ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফল-পতাকা ?"

দেশের তরুণ-সমাজ, ছাত্রদল আর প্রবীণ-সমাজ, উলামা, রাজনীতিক, সমাজ-কর্মিগণ আজ রাস্তায় রাস্তায় গাড়ী-বাড়ী পোড়াচ্ছেন, স্কুল-প্রাঙ্গণে বা পল্টন ময়দানে গলাবাজী লাঠালাঠি ও চাকুবাজী করছেন, ব্যবসায়ীরা ভেজাল-খাদ্যের বিষ ছড়াচ্ছেন, আর পুলিশ বসে বসে তামাসা দেখছেন, এমন অবস্থায় ভেবে পাওয়া যায় না দেশ কোনদিকে চলেছে। এ যেন বাত্যায় তাড়িত নৌকার মত ইতস্ততঃ ছোটাছুটি; কোন লক্ষ্য নেই। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হলে ইসলামিক নীতি বা গণতান্ত্রিক নীতির কোনটাই হয় না।

যেখানে 'আমি প্রধান, তুমি কিছুই নও,' 'আমি যা বলি তা যদি না মান তবে তোমাকে জাহান্নামে পাঠাব' ইত্যাকার ভাব, সেটা ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ মাত্র।

www.pathagar.com

বিশ্বযুদ্ধের নিধন-যজ্ঞের পর মনে হয়েছিল এসব 'বাদ'-এর মৃত্যু হয়ে এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তা নয়। এখন দেখা যাচ্ছে :

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

সত্যি তাই দেখছি পৃথিবীব্যাপী বিক্ষোভ, কুরুক্ষেত্র, কারবালা, গ্যালিপোলি, লেনিন-গ্রাড, নাগাসাকী, বয়েফ্রা ও ভিয়েতনাম জেগে উঠেছে সর্বত্র।

শহীদ বরকতের ঘটনায় ছিল এক বৃহৎ আদর্শ, তেমন বৃহৎ আদর্শের খাতিরে সংগ্রামকে 'জেহাদ' বলা যায়, এতে যাঁরা প্রাণ দান করেন তাঁরা সত্যিই শহীদ, সার্থক এঁদের মৃত্যু। কিন্তু মোচীগেট, আরামবাগ, রাজশাহী ও পল্টন ময়দান প্রভৃতি স্থানের সাম্প্রতিক ঘটনায় তেমন কোন আদর্শই দেখা যায় না—কেবল স্বার্থ, স্বমতের প্রতিষ্ঠা আর ক্ষমতাদর্পই যেন এ-সবের নিয়ন্ত্রক; এসব হত্যাকাণ্ড, নিঠুর উত্তেজনার কোন মহৎ উদ্দেশ্য দেখা যায় না। প্রত্যেক রাত্রিকেই 'শবে কদর' বললে যেমন 'শবে কদর' 'বেকদর' হয়ে যায়, তেমনি করে প্রত্যেক উত্তেজনাকেই জেহাদ বললে বা প্রত্যেক উপলক্ষেই হরতাল করলে প্রকৃত জেহাদের ইজ্জত নষ্ট করা হয়, আর হরতাল বে-তাল হয়ে পড়ে।

তাই বলি ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আলোচ্য বিষয় হবে, সাম্প্রতিক কালে আমরা মাতৃভাষা বাংলার উন্নয়ন বা শ্রীবৃদ্ধির জন্য কি করেছি, কি করা কর্তব্য, কি করতে পারিনি এবং কেমন করে এর প্রকৃত সেবা করা যায়। সেইসব আলোচনা ও কর্মপন্থা অবলম্বন করাই প্রকৃত উপায়, এইভাবেই শহীদ বরকত ও তাঁর সহকর্মী অন্যান্য শহীদদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রকাশ করা উচিত।

'জেগে আছি', একুশে সংকলন-১৯৭০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শান্তিনিকেতনে তিনদিন

এবার শান্তিনিকেতনে সাহিত্য-মেলায় যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। গত পাঁচ বছরে পূর্ববাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছিল। দায়িত্ব অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছিলাম, কিন্তু নানা কারণে মনের মত করে তা সম্পাদন করতে পারিনি। যাহোক, সাহিত্যিক কসরত প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না,—প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাবসম্পদে পুষ্ট শান্তি-নিকেতনটা একবার নিজের চোখে দেখা, আর দশ পাঁচজন চিন্তা-নায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়া।

ভিসা অফিসের হাঙ্গামা দিকদারি পার হয়ে শেষকালে ঠিক রওয়ানা হবার আগের দিন ভিসা হস্তগত করে কলকাতা গেলাম। তারপর শিয়ালদা থেকে বেলা গোটা দশেকের সময় এক্সপ্রেস ট্রেনে বোলপুর রওয়ানা হলাম। রেলগাড়ীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে একথা বলা উচিত যে ঐ ট্রেনে অনেক নামকরা সাহিত্যিক শান্তিনিকেতনে সাহিত্য-মেলায় যোগ দেবার জন্য যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ওদুদ সাহেব এবং গোপাল হালদারের সঙ্গে আমার পূর্বেই পরিচয় ছিল। অপরিচিতদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী এবং আরও অনেকে। ওদুদ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের সঙ্গে ট্রেনেই পরিচয় করিয়ে দেবেন কিনা। আমি আপত্তি করাতে পরিচয় তখনকার মত বন্ধ রইল। যদি জিজ্ঞাসা করেন, আপত্তির কি কারণ ? তাহলে হয়ত ঠিক জওয়াব দিতে পারব না। তবে মনের অস্পষ্ট ভাবটা ছিল এই রকম—পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের চেষ্টা সচরাচর ব্যঙ্গকৌতুক বা করুণার উদ্রেক করে থাকে; কিন্তু অপরিচিত সাহিত্যিক-সাহিত্যিকাদের সঙ্গে খর্বশ্রবার* আলাপন প্রচেষ্টা কি রসের উদ্রেক করে, সে বিষয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশেষ কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এমত অবস্থায় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে তাড়াতাড়ি পা বাড়ানো কি ভাল ? তাছাড়া পরিচয় ব্যাপারে আমার একটা বদ্ধ-সংস্কারও আছে : পাঁচ মিনিটে ২০ জনের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল; হয়ত নমস্কার, সালাম-আলায়কুম বা মাথা নাড়া গোছের অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হল : কিন্তু সেটা কি পরিচয় ? পরিচয় হয় তখন, যখন দুই পক্ষেই গরজ বা আগ্রহ থাকে। তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বা যোগাযোগ চাই।

গঙ্গার ব্রিজ পার হয়ে বর্ধমান ডিঙ্গিয়ে প্রায় দেড়টা দুটোর সময় বোলপুর ষ্টেশনে পৌছানো গেল। অনেক আদর আপ্যায়ন এবং হৃদ্যতার পরিচয় তখন পাওয়া গেল অভ্যর্থনা কর্তৃপক্ষের কর্মী ও কর্মিণীদের কাছ থেকে। বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতন প্রায় ২/৩ মাইল হবে। অল্পক্ষণেই আমরা যার যার নির্দিষ্ট বিশ্রামভবনে পৌছে গেলাম। ঐ বাড়ীতে আমরা ছিলাম পাকিস্তানের চারজন আর হিন্দুস্থানের দুইজন। পাকিস্তানীদের

* কাজী মোতাহার হোসেন কানে কম শুনতেন।

www.pathagar.com

মধ্যে বাউল কবি মনসুরউদ্দিন এবং তরুণ কবি শামসুর রাহমান ছিলেন। আর ভারতীয় দুই জনই বিখ্যাত নাট্যকার, পূর্ব বাংলার লোক, এখন কলকাতার বাসিন্দা। একজন শচীন সেনগুপ্ত, পূর্ববাস খুলনা জেলায়, আর একজন তুলসী লাহিড়ী, পূর্ববাস রংপুরে। এঁদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমেছিল, তা "শুধু পথিকে পথিকে পথের আলাপনই" নয়, কারণ, এতে হৃদয়ের স্পর্শ ছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়, মনের সঙ্গে মনের কোলাকুলি—হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর বা মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের পরিচয়ের চেয়ে উঁচু।

এখানে আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছিলেন কয়েকটি ছাত্র আর ছাত্রী। এঁদের সকলের নাম মনে নেই বলে কারোরই নাম উল্লেখ করলাম না। এঁদের শোভন স্বচ্ছন্দ ব্যবহার আর সেবাযত্নের নিখুঁত পরিপাট্য দীর্ঘকাল স্মরণ রাখার মত। মনে পড়ে প্রায় বিশ বছর আগে শান্তিনিকেতনের মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো এক লেখিকার একটা ঝাঁঝালো সমালোচনা পড়েছিলাম। তাতে তিনি এঁদের শুধু ফ্যাশন দুরস্ত বিলাসিনীরূপে চিত্রিত করেছিলেন। বাস্তবে কিন্তু দেখলাম অন্য রকম—অত্যন্ত অনাড়ম্বর, গৃহকর্মে সুপটু, পরিবেশনে কুশলা এবং আলাপে রুচিশীলা। শান্তিনিকেতনের পরিবেশের সঙ্গে এঁরা যেন বেমালুম মিশে গেছেন। দুই একজনকে দেখলাম বেশ ফুলের কদর বোঝেন—খোঁপায়, কানে, যেখানে যেমন সাজে প্রকৃতির অকৃপণ দানের সদ্ব্যবহার করতে জানেন।

শুধু যে ছাত্র-ছাত্রীরাই তত্ত্বাবধান করেছিলেন তা নয়, কর্তৃপক্ষীয়েরাও একাধিকবার সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসাবাদ এবং আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়, লীলা রায়, বীণা দে, প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখা করতে এসেছিলেন। একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল যে এঁদের মধ্যে বেশ একটা সহজ সামঞ্জস্য জন্মেছে, যার ফলে প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, অথচ নির্বিরোধে সব কাজই হয়ে যাচ্ছে—কোনটারই ত্রুটি হচ্ছে না, যেন সুরে বাঁধা বীণার বিভিন্ন তারের ঝঙ্কারে রাগিণীর পূর্ণরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। একদিন জোছনা রাত্রে ছাদের উপরে বসে তরুণতরুণী, বৃদ্ধবৃদ্ধার কবিতা আর সঙ্গীত চর্চা হয়েছিল, দৃশ্য কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র উদ্‌ঘাটনের মত। আমার ধারণা ছিল, বোলপুরে হয়ত ছোট ছোট পাহাড় আছে। কিন্তু আসলে একটা উঁচু টিলাও চোখে পড়ল না। তবে মাটি লাল, আর জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের মত শক্ত হয়ে গেছে। লাল মাটি আর লাল রাস্তা দেখে মনে পড়ল, 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ'—সত্যি মন ভুলাবার মত।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বোটানি বিভাগের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে শান্তিনিকেতনের কোথায় কি আছে মোটামুটি দেখে নিলাম। সকলের আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে বাড়ীখানা তৈরি করেছিলেন তারই নাম 'শান্তিনিকেতন'। এ থেকেই সমস্ত পল্লীটার নাম হয়েছে শান্তিনিকেতন। দেবেন্দ্রনাথ এই বিশেষ স্থান কেন নির্বাচিত করেছিলেন তার একটা ইতিহাস আছে। লর্ড এস. পি. সিংহের পিতৃকুলের সঙ্গে মহর্ষির বন্ধুতা ছিল। একবার তিনি পাল্কী করে বোলপুর থেকে ৮/১০ মাইল দূরবর্তী সেই বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছিলেন। যাবার সময় পথে এই নির্জন জায়গাটার বিজন সৌন্দর্য তাঁর ভাল লেগে যায়। তাঁর বন্ধু ছিলেন ঐ অঞ্চলের

www.pathagar.com

জমিদার। তাঁকে বললেন, ঐ জায়গাটা তাঁর পছন্দ হয়েছে, ঐখানে তিনি বাড়ী তৈরি করে অবসর যাপন করবেন। সে কেমন করে হয় ? ওখানেতো চোর ডাকাতের আড্ডা। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সংকল্প ত্যাগ করলেন না। তাঁর আগ্রহ দেখে বন্ধু ঐ স্থানটা (প্রায় ২ বর্গমাইল) তাঁর কাছে বিক্রয় করেন। তারপর তৈরি হয় 'শান্তিনিকেতন' এবং তার পাশে গড়ে ওঠে 'আম্রকুঞ্জ', 'ছাতিমতলা' প্রভৃতি। আম্রকুঞ্জে বার্ষিক বসন্ত-উৎসব হয়; ছাতিমতলার বেদীতে বসে মহর্ষি উপাসনা করতেন। ঐখানে আরও বড় মণ্ডপ-ঘর আছে, তার নাম তালধ্বজ। তালগাছটা ঘরের মধ্যস্থল ভেদ করে ছাতার মত শোভা পাচ্ছে; বোধহয় 'তালচ্ছত্র' নাম দিলে বেশ খাটত। তালগাছটার বন্ধনদশা দেখে মনে হয়েছিল ওটা বোধহয় আসলে এক দৈত্য ছিল। কবে কোন রাজকুমারী হরণ করে মাথার জটাজুটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। সেই অপরাধে কোন রাজর্ষি অভিশাপ দিয়ে একে তালগাছে পরিণত করেন। পাছে আবার কখন মন্ত্রবলে জ্যান্ত হয়ে পালিয়ে যায়, এই ভয়ে তার পদমূলে গৃহের মায়া সৃষ্টি করে কঠিন বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন।

এখন ওখানে পাকা রাস্তা, ঘর-বাড়ি, পানির কল, বিজলী বাতি, এইসব হয়েছে। আগে কিন্তু জংলা জায়গা ছিল, শাল, মহুয়া, বৈঁচি প্রভৃতি পাহাড়ী গাছ ছাড়া অন্য গাছ অল্পই ছিল। এখন দেশ-বিদেশের অনেক রকম গাছ-গাছালি আমদানী করা হয়েছে, রীতিমত পানি সরবরাহের ফলে স্থানটা বেশ শ্যামল-শ্রী ধারণ করেছে! একটু দূরের ঊষর ভূমি লক্ষ করলেই বোঝা যায় আগেকার অবস্থা। রাস্তায় পাথরের মত শক্ত ছোট ছোট লাল 'খোয়া' দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো কি ইটের চূর্ণ ? শুনলাম তা নয়—ওগুলো খোয়াই—অর্থাৎ বৃষ্টির পানিতে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে মাটির ভিতর থেকে আপনা থেকেই দানার মত শক্ত শক্ত খোয়াগুলো বের হয়। বুঝলাম প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থারও মিল রয়েছে। মনের অগোচরে চিন্তারও কণাগুলো লুকিয়ে থাকে। স্বভাব-সঙ্গত শিক্ষার বারিপাতে মনের চিন্তাগুলো আপনা আপনিই দানা বাঁধে—ইট ভাঙার মত হাড় ভাঙা খাটুনি ছাড়াই মহতের সংস্পর্শে এ ব্যাপারটি ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ নামকরণে ওস্তাদ ছিলেন। 'উদীচী', 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী', 'কোণার্ক' এগুলো উত্তরায়ণের উত্তর এবং পূর্বদিকের কয়েকখানা ছোট ঘরের নাম। 'উদীচী'তে উদয় সূর্যের প্রথম আলো পড়ে। 'পুনশ্চ'তে কি হয় ঠিক বুঝতে পারলাম না। 'শ্যামলীর' সর্বাঙ্গ এমন কি ছাদ পর্যন্ত শ্যামল মৃত্তিকায় তৈরি, কিন্তু তার উপরে যে রঙের প্রলেপ আছে, তা শ্যামল নয়, ঘোর কৃষ্ণ। বোধহয় শ্যাম এবং কৃষ্ণ আসলে অভিন্ন বলেই এই ব্যবস্থা। 'কোণার্ক' এক কোণে পড়ে রয়েছে অভিমানিনী বধূর মত। 'তালধ্বজে'র কথা আগেই বলা হয়েছে।

আম্রকুঞ্জের মত একটি শালবীথিও রয়েছে। বহু যত্নে সাজান এইসব কুঞ্জ আর বীথি। এক জলদ্বীপ আছে, ছোট্ট একটা জলাশয়ের মধ্যে। একটা সেতুর উপর দিয়ে জলদ্বীপে যাওয়া যায়। জলে আছে কলমী, কুমুদ, পদ্ম প্রভৃতি জলজ ফুল আর দ্বীপে আছে 'বালাখানা' নয়—শুধু একখানি ঘর। অনেক সময় সুন্দর 'যাদুমণি' ঐ ঘরখানিতে বসেই লণ্ঠন জ্বেলে 'জাগরণের' কত 'বিভাবরী' যাপন করেছেন, মানসসুন্দরীর ধ্যানে বা কাব্যলক্ষ্মীর নির্মাল্য রচনায়।

www.pathagar.com

তেহরান থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ পারস্য মডেলে এক দৃষ্টিশোভা বাগিচা তৈয়ার করেছেন। সেখানে নানা জাতীয় ফলফুলের গাছ আছে। রঙ্গন, অশোক, পলাশ, কাঞ্চন, সোনাঝুরি, নীলমণিলতা, কুরুবক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আগে জানতাম পলাশ বুঝি কেবল অনুরাগ-রাঙাই হয়, কিন্তু তার বেদনা-হলুদ রূপের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল এখানে। অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা হয়েছে এক রকম বাবলা জাতীয় গাছ, যার পাতা হেলালী নিশান হয়ে ওড়ে, আর ঝরাফুল জমিতে সোনার আস্তরণ বিছিয়ে যায়। কবি এর নাম দিয়েছেন 'সোনাঝুরি'। 'কুরুবক' এক রকমের ভায়োলেট রঙ-এর ফুল। 'নীলমণিলতা' এসেছিল বিলেত থেকে; কবির দেওয়া নামেই এ ফুলের রঙ আর সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

শান্তিনিকেতনের পাঠ্যতালিকা, বিষয়-বিভাগ প্রভৃতির কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারিনি। একে ত অন্য কাজ বা হুজুগে সময় কম ছিল, দ্বিতীয়তঃ ছুটির সময় বলে অফিসগুলো বন্ধ ছিল; কাজেই কর্তৃপক্ষীয়েরাও মেলার আয়োজনের মধ্যে বিশেষ উদ্যোগ করে এ-সব সংগ্রহ করে দিতে পারেননি। মোটামুটি বুঝলাম, এখানে বি. এ. পর্যন্ত কলাবিভাগের প্রচলিত সব বিষয়েই অধ্যাপনা হয় এবং বি. টি. পড়বার ট্রেনিং স্কুল আছে। বাংলা বিভাগে নিশ্চয়ই এম. এ. পর্যন্ত পড়বার বন্দোবস্ত আছে। কিণ্ডারগার্টেন এবং প্রাইমারী শিক্ষারও ভালো ব্যবস্থা আছে। স্কুল ঘর এবং আসবাবগৃহের দেওয়ালে অনেক ছবি আঁকা রয়েছে, যাতে ছোট ছেলে মেয়েদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। চিত্র এবং ভাস্কর্যের সঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয় হয় রাস্তায় চলতে চলতে আর দেওয়ালের লেখায়। 'দেওয়ালের লেখা' পড়তে পারা অবশ্য খুব বড় একটা গুণ। চোখ খোলা রাখলেই এ-গুণের উন্মেষ হয়। যতদূর বুঝলাম আর্টের ছন্দের সঙ্গে জীবনের ছন্দের মিল রাখবার আনুষঙ্গিক চেষ্টার কার্পণ্য হয়নি। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল রয়েছে। আর অধ্যাপকদের জন্যও ছোট ছোট অনেক পাকা বাড়ি রয়েছে। আমরা কমের পক্ষে ত্রিশ চল্লিশজন অতিথি গিয়েছিলাম; কিন্তু তাতে স্থানের অসঙ্কুলান হয়নি। দেড় মাইল দূরে আছে শ্রীনিকেতন। সেখানে কৃষি ও বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে, যার প্রধান লক্ষ্য পল্লী উন্নয়নমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা। বন্ধের মধ্যে একটু আধটু ঘুরে যা দেখা যায় দেখলাম। একটা দেওয়ালে পরিষ্কার হরফে একটা কবিতা লেখা রয়েছে যাতে এই প্রতিষ্ঠানের মূল ভাবটা ফুটে উঠেছে। কবিতাটি এই :

ফিরে চল মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে।
হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে ডাক দিল যে গানে গানে।
দিক হ'তে ঐ দিগন্তরে কোল রয়েছে পাতা
জন্ম মরণ তারি হাতের অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা, সাগর পানে আত্মহারা রে
প্রাণের বাণী বয়ে আনে।

www.pathagar.com

সত্যিই ত ধরণী ফুলের হাসিতে, পাখির গানে, আমাদেরকে ডাক দিচ্ছে ওর কোলে টেনে নেবার জন্য। পাশ দিয়ে ময়ূরাক্ষী আত্মহারা হয়ে সাগরপানে ছুটে চলেছে। সাগরের সঙ্গ লাভ হলে তাকে ত আর নদীর মৃত্যু বলা যায় না; সেইত জীবন।

সাহিত্য সভাগুলোর অধিবেশন হয়েছিল 'সঙ্গীত-ভবনে'। উঁচু একটা মণ্ডপ, তার সামনে মস্ত বড় প্রাঙ্গণ, তাতে তিন চার হাজার লোক অনায়াসে বসতে পারে। মণ্ডপটিতে ঢালা বিছানা আর মধ্যস্থলে সভার পরিচালকদের জন্য ছোট ছোট তিনটি বেদী, আর ঠেশ দেবার জন্য বড় বড় তাকিয়া। মণ্ডপের পিছন দিকে অর্থাৎ প্রাঙ্গণের উল্টো দিকে বারান্দা, আর আরও পিছনে সঙ্গীতভবনের অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ। প্রাঙ্গণ থেকে যাতে পিছনের লোক চলাচল না দেখা যায় সেজন্য বরাবর নীলাম্বরীর টানা পর্দা দেওয়া হয়েছিল। পর্দার ঠিক উপরে আর নিচের দিকে সুদৃশ্য শিল্পকার্য দেখা যাচ্ছিল। মোটের উপর পরিবেশ মনোজ্ঞ, কিন্তু থিয়েটারী নয়।

প্রতিদিন সভা আরম্ভের আগে আগে আশেপাশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে একটু আধটু আলাপ হত। বলা বাহুল্য, আমি এ ব্যাপারে বেশী সুবিধে করতে পারিনি। কারণ দশজনের মধ্যে খামখা চেঁচানো কিংবা অন্যকে চেঁচাতে বাধ্য করা বিশেষ রুচিকর ব্যাপার নয়। আমি প্রধানতঃ চোখটাই খোলা রেখেছিলাম, কানের ব্যবহার বিশেষ করে সঙ্গীতের জন্য রিজার্ভ ছিল। রোজই তিন চারটে করে গান হত কিন্তু তা যেন মোটের উপর কেমন প্রাণহীন বলে মনে হল। নিশ্চিতই এটা কানের দোষ হবে, গানের ততটা নয়। সভাস্থলে সচরাচর এমন দুই চারজন থাকেন যাঁদের পরিচয় জানবার জন্য প্রবল আগ্রহ হয়। ইন্দিরা দেবী, বীণা দে, লীলা রায়, রথীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর, আবদুল ওদুদ, নরেন্দ্র দেব, প্রভাত মুখোপাধ্যায় এঁরা এই পর্যায়ের লোক। এঁদের কেউ কেউ ঊর্ধ্ব গগনের লোক, কেবল শাহীন পাখীরাই সে ঊর্ধ্বে উঠে তাঁদের পরিচয় পেতে পারে। অন্নদাশঙ্কর, আবদুল ওদুদের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। লীলা রায় আর বীণা দে সহজ হৃদ্যতায় অনায়াসে পরকে আপন করে নিতে পারেন। নরেন্দ্র দেবকে ভারিক্কি লোক বলে বোধ হল, আর সামনে এগোবার তেমন সুযোগও হল না। এটাকে আমি ক্ষতি বলেই বিবেচনা করি। প্রভাত মুখোপাধ্যায় ঋষিকল্প লোক। তবু কোথাও যেন তাঁর সঙ্গে একটা গভীর আত্মীয়তা বোধ করেছিলাম। ইনি এমন লোক যাঁকে দেখলেই মনে হয় সকলের চির-চেনা। দাড়ির আকর্ষণে (!) আমরা দুইজনে পরস্পর সান্নিধ্য লাভ করবার সুযোগ পেয়েছি। মনে হচ্ছিল এই শান্ত সমাহিত লোকটার মধ্যে যেন রবীন্দ্রনাথের আত্মার সৌন্দর্য অধিষ্ঠিত রয়েছে। আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন মুকুল দে, আর্টিস্ট, প্রবীণ লোক, মিশুক আর রসিক। এঁর লেখিকা কন্যা মঞ্জরী দে একখানা বই 'নবমী' উপহার দিয়েছিলেন। তাতে বুঝলাম আর্টিস্টের সূক্ষ্ম দৃষ্টির সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের মনের সংমিশ্রণ হয়েছে। কলেজের ছাত্রী গৌরী দেবী ভাষণ সংগ্রহ করছিলেন, বক্তৃতার সারাংশ লিখছিলেন এবং অতিথিদের অভ্যর্থনাদি ব্যাপারে যেন জেনারেল ম্যানেজারের কাজ করছিলেন। তাঁর কাছে এবং তাঁর সহকর্মী-সহকর্মিণীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। অন্নদাশঙ্কর এবং লীলা রায়ের সদাশয়তার কথা

www.pathagar.com

উল্লেখ করে বর্ণনা করা যায় না। কাজেই সে চেষ্টা করব না। দোলের দিন বৈকালে তাঁর বাড়ীতে এক বাউল কবির গান শুনলাম, মোহিত হয়েই শুনলাম, না শুনেই মোহিত হলাম ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। বোধহয় কৃত্রিম রাগবিস্তারের চেয়ে সহজ গ্রাম্য গানই আমার মত গ্রাম্য লোকের বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়। নিধুবনে হরির সঙ্গে হোলি খেলার গান, আর গৌরাঙ্গের প্রেমের ইস্কুলে পড়বার আহ্বান, সত্যিই সহজ বাঙালি মনকে উদাস করে দেয়। ঐ দিনই সকাল বেলা দোলের মহফিলে একটা ছোট চক্রে সমবেত সঙ্গীত হচ্ছিল, তাও আকর্ষণীয় হয়েছিল। খবরের কাগজে দোলের পিচকারীর ব্যাপার নিয়ে মারামারি সংবাদ জানা যায়। এ ব্যাপারটা বড়ই অপ্রীতিকর। এর কারণ একদিকে মাত্রাবোধের অভাব, অন্যদিকে রসবোধের অভাব। সৌমাত্রিক হলে উৎসব যে কত প্রীতিপ্রদ হতে পারে তা দেখতে পেলাম শান্তিনিকেতনে গোলাবী-আপেলী মুখের আবীর মাখা হাসিতে, বাঙালি ইজিপসিয়ান আমেরিকান যুবকের রঙীন দেহের ত্বরিত গতিতে, সীমন্তিনীদের সীমন্তও পদপ্রান্তের রক্তরাগে অধ্যাপকদের লাল কপালের অকুঞ্চিত ভঙ্গীতে আর দাড়িয়ালদের মেহদী রাঙা দাড়ির জৌলুসে। দোলের দিনই রাত্রিকালে চিত্রাঙ্গদা নাটকের অভিনয় দেখলাম। নাট্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের রূপ উৎসারিত হয়ে উঠছিল। নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট ঐতিহ্য পুরোপুরি বজায় রয়েছে বলেই মনে হল। ঘটনাসংস্থানে গানগুলোও চমৎকার লাগল। বাস্তবিক এক এক পরিবেশে এক এক জিনিস এমন জমে ওঠে যে অন্য পরিবেশে তার সে আকর্ষণী শক্তি আর থাকে না।

আগেই বলেছি, আমি বরাবর দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলাম। তাই কে কি প্রবন্ধ পাঠ করলেন বা অভিভাষণে কে কি বললেন সে সবের কিছুই বলতে পারব না। শীঘ্রই হয়ত সাহিত্য মেলার বিবরণ বের হবে আর তার এক কপি হস্তগত হবে, এই আশায় রয়েছি। শ্রোতাদের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ করে একথা পরিষ্কার বুঝলাম যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের রচনা সবগুলোই ওখানে বেশ সমাদৃত হয়েছে। মনে হয় এদিকে কি সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হচ্ছে না হচ্ছে সে সব খবর ওদিকে খুব অল্পই যায়। তাই এঁরা আগ্রহের সঙ্গে আমাদের বিবরণ শুনলেন; আর আমরাও যে কিছু একটা করছি, আর তা যে তাঁদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের তুলনায় নিতান্ত নগণ্যও নয়, এ কথা অনেকেই স্বীকার করলেন। বিশেষ করে শচীন সেন মশায় বললেন, প্রবন্ধ সম্ভারে আমাদের বিষয় বৈচিত্র্য তাঁদের চেয়ে বেশী বই কম নয়। পূর্ববাংলার সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধেও তাঁদের সংশয় হয়ত অনেকটা কেটে গেছে। তাঁদের তরফ থেকে আমরা সাহিত্যিক সহযোগিতার প্রত্যাশা করতে পারি, সকলেই একথা বিশেষ করে বললেন। চিন্তার ক্ষেত্রে এই যে একটা সহানুভূতি আর সহযোগিতার ভাব, এর মূল্য সামান্য নয়। আমরা কি চাই, আমাদের আদর্শ কি, এ সম্বন্ধে আমাদের সুষ্ঠু ধারণা থাকা দরকার, তাঁদেরও দরকার। অন্ততঃ আর্ট এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমকক্ষের মত মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হলে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়। আশা করি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই রকম মিলনের সুযোগ আরও সুপ্রচুর হবে।

'সওগাত', বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

www.pathagar.com

ঢাকার সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য

গত চল্লিশ বছর ধরে আমি ঢাকায় আছি। এই চল্লিশ বছরে আমি স্থানীয় অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক কর্ম-প্রচেষ্টা নিরীক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছি, তার মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, চিত্রকলা, গৃহসজ্জার জন্য ব্যবহৃত শিল্পকার্য, ধর্মোৎসব এবং সব রকমের সঙ্গীত। এর মধ্যে সঙ্গীতই আমাকে আকর্ষণ করেছে সবচেয়ে বেশী। ক্ষণকালের জন্যে হলেও সঙ্গীত মানুষের মনকে পার্থিব দুঃখ ও অশান্তি থেকে মুক্ত করে নিয়ে যায় স্বর্গীয় আনন্দের রাজ্যে। এই আনন্দকে যেমন সহজে উপলব্ধি করা যায়, তেমন সহজে বর্ণনা করা যায় না। তবু আমার যতদূর স্মরণ হয়, ঢাকার সঙ্গীত সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব।

ধ্রুপদ-সঙ্গীত আজ অবহেলিত এবং বিলুপ্ত প্রায়। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে এ-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ ইমদাদ খান। তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট ও ব্যঞ্জনাময়, যদিও খুব সম্ভব বয়সের জন্যে তেমন জোরালো ছিল না। তাঁর একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের কথা আমার এখনো মনে আছে। সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের শ্রীপঞ্চমীর রাত্রি। মিটফোর্ড হাসপাতালের বিপরীত দিকে এক মেডিক্যাল মেসে দুঘন্টারও বেশী সময় ধরে তিনি মহেন্দ্র বসাকের পাখোয়াজ সহযোগে ধ্রুপদ-সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন। তিনি এমন একটা আবহের সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাঁর কণ্ঠস্বর, পাখোয়াজ এবং বিমুগ্ধ দর্শকদের আবেগময় হৃদয়-স্পন্দন সেদিন এক হয়ে গিয়েছিল। খেয়াল, ঠুংরি এবং টপ্পার মত হাল্কা সঙ্গীতের তুলনায় ধ্রুপদ-সঙ্গীত যে কতো উচ্চস্তরের এবং কতো মনোমুগ্ধকর, তা সেদিনই আমি প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম।

গত ৪০ কি ৫০ বছরে খেয়াল-সঙ্গীতের নামজাদা শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মোহাম্মদ হোসেন (খ্যাতনামা খেয়াল-শিল্পী তোসাদ্দাক হোসেন খানের সাগরেদ,) চারু ওস্তাদ (নওয়াবপুরে তিনি একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন), গৌর ওস্তাদ (মোহাম্মদ হোসেনের সাগরেদ), ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ (একটি সঙ্গীতজ্ঞ ঘরানা পরিবারের লোক), ওস্তাদ সালামত হোসেন (তোসাদ্দাক হোসেনের পরিবারের লোক) বলধার জমিদারের পৃষ্ঠপোষিত ওস্তাদ ভোলাগিরি, ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন (খসরু) এবং আরও কয়েকজন। ৫০ বছর আগে যে-সব ওস্তাদ ঢাকায় এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবের কালে খানের নাম এখনো স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তানের উপর তাঁর সুন্দর দখল ছিল এবং উদারা থেকে তারা পর্যন্ত আড়াইটি অক্টেভে তিনি পরিষ্কারভাবে তাঁর কণ্ঠস্বর খেলাতে পারতেন। জোহরা বাই এবং জানকী বাইয়ের (চাম্পান ছুরি) সঙ্গীতের আসরও উল্লেখযোগ্য। ঢাকার শঙ্খনিধিদের আমন্ত্রণে তাঁরা এখানে আসতেন, বিশেষ করে ঝুলনের সময়।

www.pathagar.com

উপরে যে-সব খেয়াল-শিল্পীর কথা বলা হলো, তাঁদের কেউ কেউ ঠুংরি সঙ্গীতেরও চর্চা করতেন। এ ছাড়া এ-সঙ্গীত শোনাতেন পচা ওস্তাদ, বিরাজ ওস্তাদ, এবং বাইরে থেকে আগত শিল্পীরা, যেমন ত্রিপুরার শচীন্দ্র দেববর্মণ এবং কলকাতার দিলীপকুমার রায় ও কবি নজরুল। রেণুকা সেন, রানু সোম এবং কল্যাণী দাসও তাঁদের সুমিষ্ট গান শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন।

টপ্পা-সঙ্গীত একালে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন মাঝে মাঝে এ-সঙ্গীত শোনাতেন। এ-সঙ্গীত তিনি শিখেছিলেন হাসনু মিঞার কাছে। তাঁর সুমিষ্ট ও সুউচ্চ কণ্ঠস্বরের জন্যে তিনি স্মরণীয়। এ ছাড়া আমার টপ্পা-সঙ্গীত শোনার সুযোগ হয়েছে সিতারী হাফিজ মিঞার কাছে এবং খ্যাতনামা ওস্তাদুল-ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের কাছে। কয়েকটি হৃদয়স্পর্শী টপ্পা-সঙ্গীত শুনিয়ে তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন।

ঢাকা হচ্ছে তবলচীদের একটি বড় কেন্দ্র। স্মরণীয় কালের মধ্যে সবচেয়ে বড় তবলচী ছিলেন ওস্তাদ প্রসন্ন বণিক। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের শিল্পী। তাঁর সাগরেদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুড়াপাড়ার জমিদার রায়-বাহাদুর কেশব ব্যানার্জী। প্রসন্ন বাবুর সাথে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে। তখন তাঁর শ্রবণ-শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তখনো তিনি স্বহস্তে তবলা বাজিয়ে কেশব বাবুকে তবলা শিক্ষা দিতেন এবং শুধু চোখে দেখেই তাঁর ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিতে পারতেন। কেশব ব্যানার্জী নিজে সঙ্গীতের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক এবং শিল্পী ছিলেন। বাইরে থেকে এসে যে-সব বিশিষ্ট শিল্পী খেয়াল বা ঠুংরি গাইতেন, তিনি তাঁদের সাথে সঙ্গত করতেন। কায়েতটুলীর গোলাপ ওস্তাদজী ছিলেন আরেকজন নামকরা সঙ্গতিয়া। রায়বাহাদুর এবং গোলাপ ওস্তাদজীর বিশেষত্ব ছিল স্বর-সামঞ্জস্যের সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং সঙ্গীতের নিগূঢ় মর্ম অনুধাবনের ক্ষমতা। আরেকজন তবলা-শিল্পী ছিলেন নওয়াবপুরের বারীন্দ্র বসাক। ঢাকার অন্যান্য তবলচীদের তুলনায় তিনি ছিলেন বেশী ক্লাসিক্যাল-ধর্মী। যেকোন ওস্তাদজীর সঙ্গে তিনি সঙ্গত করতে পারতেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী প্রসন্ন বণিকের শিষ্য। নওয়াবপুর ছিল তবলচী ও পাখোয়াজীদের কেন্দ্রস্থল। নওয়াবপুরের তবলচীরা সাধারণতঃ বাজনার উপর জোর দিতেন। তারা জোরে তবলা বাজাতেন বলে অনেক সময় কণ্ঠসঙ্গীত চাপা পড়ে যেত, আর তার ফলে সঙ্গীতের মাধুর্য ক্ষুণ্ন হতো। এ-প্রসঙ্গে লালাজী এবং গোঁসাইজীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা ধুন, চানধুন, শোয়াইয়া, ফেলিয়া, পরাণ, আড়ি এবং তেহাইয়ে সুদক্ষ ছিলেন, কিন্তু তাঁরা প্রায়ই সঙ্গীত-শিল্পীদের সাথে তাল রেখে চলতে পারতেন না।

যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন ভগবান সেতারী। তিনি একজন সত্যিকারের শিল্পী ছিলেন। প্রেরণার আবেশ এলে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নতুন নতুন রাগের মূর্ছনা সৃষ্টি করে যেতেন। বিভিন্ন রাগের বাজনার সাথে তাঁর শরীর দুলতো, আর মনে হতো তাঁর শরীরও যেন তাঁর যন্ত্রের অংশবিশেষ। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফলপট্টির হাফিজ ওস্তাদ। সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্যে তিনি

www.pathagar.com

তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করেছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি পাঞ্জাবের কোনো এক সঙ্গীত-কেন্দ্রে সেতার বাজাতে শিখেছিলেন। তাঁর ছেলে ছোটে মিঞা ১২ বছর বয়সে সেতার বাজাতে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিল। এ-বয়সে অবশ্য কেবল টেকনিকই প্রাধান্য পেয়ে থাকে; বয়স বাড়লে তবেই শিল্পানুভূতি জাগে। ছোটে মিয়া পরে প্রকৃতই শিল্পদক্ষতা অর্জন করেছিলেন, কারণ কয়েক বছর পরে তিনি নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঢাকায় আগত শিল্পীদের মধ্যে হায়দার হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯২৫ সালের কাছাকাছি সময়ে ময়মনসিংহের গৌরীপুর থেকে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ২০। ঢাকায় তিনি কিছুদিন ছিলেন। তিনি ছিলেন ওস্তাদ এনায়েত খানের পরিবারের অন্তর্গত। সেতারে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা ছিল। খাজা আজম সাহেব ছিলেন সেকালের ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে সঙ্গীতের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক। তাঁর বাড়ীতে একবার তিনি সেতার বাজনার এমন দক্ষতা দেখিয়েছিলেন যে, ভগবান সেতারীকে (তিনি সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন) কিছুতেই সেতার বাজাতে রাজী করানো যায় নি।

ভগবান সেতারীর ভাই (যাঁর নাম আমি ভুলে গেছি) একজন বিশিষ্ট এসরাজ-শিল্পী ছিলেন। আরেকজন এসরাজ-শিল্পী ছিলেন সিলেটের পিলু বাবু। বর্তমানে খাজে দেওয়ান এলাকায় ইস্টবেঙ্গল সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের অফিস যে বাড়ীতে আছে, সেই বাড়ীতেই তিনি থাকতেন। তাঁর হাতে এসরাজ যেন মানুষের মতো আবেগভরে কথা কয়ে উঠতো।

বেহালা বাদনের জন্যেও ঢাকা বিখ্যাত। সাধারণতঃ একজন রাজমিস্ত্রী বেহালা বাজায় আর ছোট ছোট ছেলেরা তালে তালে গান গায় এবং ছাদ পেটায়। রাজমিস্ত্রীর সাথে সাথে ছেলেরাও গান গায় অথবা ধুয়া ধরে। ছাদ পেটানোই এখানে তবলার কাজ করে। খ্যাতনামা ধ্রুপদিয়া ইমদাদ ওস্তাদের জীবন আরম্ভ হয়েছিল এ-রকম একজন বালক-শ্রমিক হিসাবেই। এতে বোঝা যায় যে, সঙ্গীতে যার প্রকৃত আগ্রহ ও প্রতিভা আছে, তার পক্ষে ছাদ-পেটানো-গান সঙ্গীত শিক্ষার পক্ষে কতখানি কার্যকরী হতে পারে। এ-প্রসঙ্গে এও লক্ষ করার বিষয় যে সঙ্গীতের তাল-লয়ের সঙ্গতি-অসঙ্গতি সম্পর্কিত তত্ত্ব না জানা থাকা সত্ত্বেও একজন নিরক্ষর শিল্পী কিরূপ মহৎ শিল্প-দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে, যা থেকে রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ আনন্দে করেন "পান সুধা নিরবধি।" কার্জন হলের এক স্মরণীয় অনুষ্ঠানে পাক ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম বংশীবাদক কুমিল্লার আফতাবুদ্দিন খান বাঁশী শুনিয়েছিলেন। তাঁর বাঁশীর মোহিনী জাদুতে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হারমোনিয়ামেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। হারিমোনিয়ামের নাম করা ওস্তাদ আখতার ও সালামের হারমোনিয়াম বাজানো শোনার সুযোগও আমার হয়েছে। আখতারের হারমোনিয়াম বাজানো শুনেছিলাম মাহুতটুলীতে তাঁর বাড়ীতে এবং সালামের বাজনা শুনেছিলাম দিলকুশায় খাজা আজমের বাড়ীতে। তাঁদের কৃতিত্ব ছিল এইখানে যে, তাঁরা বড় বড় সঙ্গীত-শিল্পীদের সব রকম ক্লাসিক্যাল রাগ সঠিকভাবে রূপায়িত করতে পারতেন, এবং গায়কেরা যখন নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে থামতেন, তখনো তাঁরা বিভিন্ন রাগ রূপায়িত করতে ও তাল অক্ষুণ্ন রাখতে পারতেন।

www.pathagar.com

অন্যান্য সঙ্গীত যথা কাওয়ালী, মর্সিয়া, কীর্তন, ভাসান, ঢপ, ভাটিয়ালী, বারমাস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতে চাই না। যেটুকু বলা হয়েছে তা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে,বহুকাল থেকেই বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গীত ও নৃত্য ঢাকার অধিবাসীরা উপভোগ ও চর্চা করে এসেছে। ওস্তাদদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন মুসলমান, কিন্তু তাৎপর্যের বিষয় এই যে, হিন্দু শিক্ষিত-সমাজই তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। প্রধানতঃ সরস্বতী পূজা ও ঝুলন যাত্রা উপলক্ষেই ওস্তাদদের নিয়ে আসা হতো। ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে কমার্শিয়াল একাডেমীতে ওস্তাদদের একটা বড় কেন্দ্র ছিল। বিভাগ-পরবর্তীকালে সঙ্গীত-শিল্পে ভাটা পড়েছে। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিল এবং রেডিও পাকিস্তান এর এই নিম্নগতি কিছু পরিমাণে রোধ করতে সক্ষম হয়েছে। বুলবুল একাডেমীও এ-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছে। একাডেমীতে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত এবং নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এইসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং বিশিষ্ট শিল্পীদের সমাগমে ক্লাসিক্যাল ও অন্যান্য সঙ্গীতের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ আবার ফিরে আসবে, পশ্চাদ্‌গামিতার অবসান হবে এবং সঙ্গীত-শিল্প নতুন বিকাশের পথে অগ্রসর হবে।

রচনাকাল : ১৯৫৬

www.pathagar.com

সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-প্রতিভা মহাসাগরের মত বিস্তীর্ণ। তাই ঝিনুক দিয়ে সাগর সেঁচবার চেষ্টা না করে কেবল আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব।

মাইনর স্কুলে থাকতে পড়েছিলাম পাঠ্য-বইয়ে উদ্ধৃত দুটো কবিতা—'খাঁচার পাখী' আর 'অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী'। যা হোক প্রথমটি পড়ে বেশ আমোদ লেগেছিল—গল্পের আমোদ; আর পাখী দুটো যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। কিন্তু লেখক সম্বন্ধে বালকমনে কোন উচ্চ ধারণা হয়নি; কারণ, সবই ত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এতে আর বাহাদুরী কি ? দ্বিতীয় কবিতাটি পড়ে বেশ ভালো লাগলো,—কী কথার গাঁথুনি, কী প্রশান্ত দেশপ্রেম, আর কী শ্রুতিমধুর রচনা। বেশ সমীহ হল, হেডপণ্ডিত মশায় সমাসাদি ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন, আর কবিতাটা মুখস্থ করালেন। একটা লেখার মত লেখা বটে, যার-তার কাজ নয় এমন লেখা। এ হল ১৯১১ সালের আগেকার কথা।

এরপর হাইস্কুলে পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে ছিল 'কথাসার', 'সীতার বনবাস' আর মণি গঙ্গোপাধ্যায়ের : 'কাদম্বরী'। একেবারে জমজমাট ক্লাসিক্যাল আবহাওয়া। কাদম্বরীর একটা সুদীর্ঘ ভূমিকা ছিল, রবীন্দ্রনাথের লেখা। ক্লাসে সেটা পড়া হল না বাড়ীতেই পড়ে নিলাম; একেবারে অবাক লাগল। ভাষা ছিল কোমলে-কঠোরে মিশানো, আর যুক্তি ছিল শাণিত। সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা, এর মধ্যে প্রবন্ধটা আর দ্বিতীয় বার পড়বার সুযোগ হয়নি তবু এখনো মনে আছে,—কাদম্বরীর গল্পের শ্লথগতির সঙ্গে কালোয়াতি গানের 'চলত রাজকুমারী'র তানাশ্রিত আবর্তিত গতির তুলনা। মোট কথা, রাজসভার 'তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী' বা গগনের 'জলধরপটল' সংযোগের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটাই আমার মনোহরণ করেছিল বেশী। পরবর্তী কালে, অলক্ষেই আমার রচনার ভাষাও যে এই ভূমিকার প্রথম-বিস্ময় দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছে তা এই স্মৃতিকথা লিখবার সময় আজকেই হঠাৎ স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি। অবশ্য পরে এই প্রথম দোলার পোষকতাও হয়েছে।

কলেজ-জীবনে 'সবুজপত্রে'র মারফত রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনার সঙ্গে আর একটু পরিচয় হয়। কথ্যভাষার ব্যবহার এবং ইংরেজী বাক্যরীতির আংশিক অনুকরণ প্রথমে একটু বে-খাপ্পা ঠেকলেও অল্পদিনেই কান-সওয়া হয়ে গেল। একটি প্রবন্ধ পড়লাম ("পদ্মায় তখনও রেলপুল হয়নি" বলে আরম্ভ)—তাতে ছিল লোকের মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষার মধ্যে সমতলতা আর অবাধ চলাচল সম্বন্ধে সুপ্রযুক্ত আলোচনা। আমার মন তাতে পুরাপুরি সায় দিল। এই হল আমার গোপন শিষ্যত্ব। প্রায় ঐ সময়েই আর একটি প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে লিখেছিলেন, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর কোন সামাজিক মেলামেশা নেই, আছে কেবল রাজনৈতিক প্রয়োজনের সম্পর্ক। প্রাণের স্পর্শহীন মুখের ডাকে তারা যে

www.pathagar.com

সব সময় সাড়া দেবেই এ আশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। এমন সহৃদয়ভাবে আর কোনও সাহিত্যিক মুসলমান সমাজের কথা এবং হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক মানবীয় সম্প্রীতির কথা ভেবেছেন বা প্রকাশ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

কলেজে পড়বার সময় রবীন্দ্রনাথের কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, শিশু-সাহিত্য, সাহিত্য-সমালোচনা ইত্যাদির সঙ্গে সাধ্যমত পরিচয় রাখবার চেষ্টা করেছি, আর মুগ্ধ হয়েছি তাঁর বহুমুখী প্রতিভা দেখে। রবীন্দ্রসঙ্গীতও অনেক শুনেছি, এক সময় কিছু অভ্যাসও করেছিলাম,—যেমন অনেকেই করে থাকে। সে-সময় থিয়েটারসঙ্গীত আর ডি.এল.রায় ও রজনী সেনের গানের খুব প্রচলন ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হল রবীন্দ্রসঙ্গীতের অজস্র ধারা। 'আমার মাথা নত করে দাও', 'জীবন যখন শুকায়ে যায়', 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'সে কোন বনের হরিণ', 'অল্প লইয়া থাকি তাই', 'কেন যামিনী না যেতে', 'সত্য-মঙ্গল-প্রেমময় তুমি', 'দাঁড়াও আমার আঁখির আগে', 'অন্ধজনে দেহ আলো', 'তোমার রাগিণী জীবনকুঞ্জে', 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী', 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি', 'শ্রাবণ-ঘন-গহন মোহে', 'নিশীথরাতের বাদল ধারা', 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে', 'জনগণমন-অধিনায়ক'—প্রভৃতি শত শত গানের প্লাবনে দেশের লোকের চিত্ত অভিষিক্ত হয়ে গেল।

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ একবার ঢাকায় আসেন। তখন আমি সদ্য ঢাকা ইউনি-ভার্সিটিতে অধ্যাপক হয়েছি। সন্ধ্যার ঠিক আগখানে কবি আসলেন সেক্রেটারীয়েট মুসলিম হলের (বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের) প্রাঙ্গণে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুন্দর দেহ, শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত আলখাল্লা-পরিহিত সৌম্যমূর্তি দেখে মনে হল, চৌথা আসমান থেকে ঈসা পয়গম্বর যেন আবার আবির্ভূত হলেন। তিনি ছেলেদের সঙ্গে কিছু গল্পগুজব করবার পর আমাদের অনুরোধে একটি গান গাইলেন—"বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে"। সত্যিই সে-সময় পশ্চিম আকাশে রক্তিম রবি অস্তমিত হচ্ছিল। কবি পশ্চিম দিকে মুখ করেই বসেছিলেন, বোধ হয় অস্তায়মান সূর্য দেখেই তিনি গানটা ধরেছিলেন। ঐ পরিবেশে অনুরাগরঞ্জিত স্বভাবমধুর ধ্বনির ব্যঞ্জনায়, আর সুঠাম দেহের ঈষৎ আন্দোলনভঙ্গীতে যে কী মর্মস্পর্শী সঙ্গীতসুধা নিঃসৃত হয়েছিল তা বর্ণনার অতীত। ঐ দিন মনে হয়েছিল, জীবনে যেন এক সুমহৎ সার্থকতার স্পর্শ পেলাম।

১৯৩৭ সালে আমার একখানা প্রবন্ধ-পুস্তক পাঠিয়েছিলাম কবির কাছে। আশা করতে পারিনি যে, কবি এই ক্ষুদ্র উপহারের প্রতিও কিছু মনোযোগ দেবেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কবির সেক্রেটারী জানালেন, বইখানা কবির হস্তগত হয়েছে। পরে উনি নিজেই আপনাকে চিঠি দেবেন। কয়েকদিনের মধ্যেই কবির আশীর্বাদবাণী পেলাম। কবি আমার ভাষার সরলতা, স্বাভাবিকতা আর মত প্রকাশের সাহসিকতার কথা উল্লেখ করে আরও লিখবার উৎসাহ দিলেন। কবি ত আর জানেন না, আমি তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সহজের সাধনা করেছি, আর সাহসিকতার বল পেয়েছি। আজ রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে অমর কবির অক্ষয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

রচনাকাল : ২৬-২-১৯৬১

www.pathagar.com

স্মৃতিপটে নজরুল

কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ কবে হয়েছিল, ঠিক মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে কলকাতার তালতলা বাজারের কাছে কোন এক গলিতে বস্তি এলাকার একতলা কোন ক্ষুদ্র কোঠায় একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আর একবার মেডিক্যাল কলেজের সামনে কলেজ স্ট্রীটের* কোন মেস-এর দুতলায়। তখন তাঁর ঝাঁকড়া চুল আর আয়ত দুটো চোখই আমার সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এরপরে কারমাইকেল হোস্টেলের কোন এক নৈশ অনুষ্ঠানেই বোধহয় সর্বপ্রথম তাঁর গান শুনি, এই সময় তাঁর হারমোনিয়াম বাজানোর কৃতিত্ব দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলাম। আরও পরে ইউরোপীয় এসাইলাম লেন, পানবাগান স্ট্রীট, বাগবাজার এলাকা, ইসমাইল স্ট্রীট, ইলিয়ট রোড, এণ্টালী, জেলিয়াটোলা, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, মানিকতলা এবং চিৎপুর রোডের উপরকার হিজ মাস্টারস ভয়েস অফিস, ওয়েলেসলি রোডের উপরকার সওগাত অফিস এবং জোড়া গীর্জা অঞ্চলে মঞ্জু সাহেব ওস্তাদের গানের মজলিশেও নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। পরে দু-একবার ওঁর সঙ্গে চিৎপুরে হিজ মাস্টারস ভয়েস অফিসে গিয়েছি। এই ঘটনাগুলো সবই কলকাতা অঞ্চলে আর ১৯২০-২১ থেকে ১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যে ঘটেছিল; কিন্তু এখানে সেগুলোকে কালক্রমিক-ভাবে সাজানো হয়নি। ১৯২৭ সালের আগে নজরুলের সঙ্গে আমার যে-সব দেখাশুনা হয়েছিল তা অনেকটা দূর থেকে কোন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে সাধারণ গুণগ্রাহী লোকের সাক্ষাতের মত। কিন্তু ১৯২৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি যখন নজরুল ইসলাম আমাদের নিমন্ত্রণে ঢাকায় এসে এখানকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন গীতি গাইলেন আর সে-সুরের বিপুল উচ্ছ্বাসে উপস্থিত সুধীগণ এমন কি মোল্লা-মৌলবীগণ পর্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠলেন তখন সেই জাদুকরী প্রভাবে সকলের সঙ্গে আমিও মোহিত হয়ে গেলাম। এইবারই প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার সত্যিকার পরিচয় এবং হৃদ্যতা জন্মে। এ হয়ত সঙ্গীত-শিল্পীর প্রতি সাধারণ সঙ্গীত অনুরাগীর স্বাভাবিক আকর্ষণ।

আমাদের মধ্যে বয়সেও মোটামুটি সাম্য ছিল। আমি ওঁর চেয়ে মাত্র দুবছরের বড়। তাই অনায়াসে গোড়া থেকে 'আপনা-আপনি' না হয়ে 'তোমা-তুমি'-র মত বয়স্যসুলভ সম্পর্কই গড়ে ওঠে।

সাহিত্য সম্মেলনে আমিও 'সঙ্গীত-চর্চায় মুসলমান' শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। আমার প্রবন্ধ শুনে মোল্লা-সম্প্রদায়ের মুখ থেকে যে-উক্তি বেরিয়েছিল সে

---

* বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিস, ৩২ কলেজ স্ট্রীট।

www.pathagar.com

হল—"ও বাব্বাহ! দাড়ির মধ্যেও এত কুফরী ?" আর নজরুলের গান শুনে যে-উক্তি বেরিয়েছিল তা হল, "বা! বা! কী সুন্দর ইসলামী গান—ঠিক যেন গযল!" খুব সম্ভব :

দখিনের হালকা হাওয়ায় আস্‌লে ভেসে সুদূর বরাতী।
শবেরাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বলল দীপালি ॥
তালিবন ঝুমকি বাজায়, গায় "মোবারকবাদ" কোয়েলা।
উলসি উপচে প'ল পলাশ অশোক ডালের ঐ ডালি ॥

এবং

এল কি অলখ্-আকাশ বেয়ে তরুণ হারুন-আল রাশীদ।
এল কি আল-বেরুনী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী ॥
সানাইয়া ভয়রোঁ বাজায়, নিঁদ-মহলায় জাগলো শাহজাদী।
কারুণের রূপার পুরে নূপুর পায়ে আস্‌ল রূপওয়ালী ॥
খুশীর এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিরীঁ।
লাল এ লায়লি-লোকে মজনুঁ হর্দম চালায় পেয়ালী ॥

প্রভৃতি চরণে উর্দু-ফার্সী সাহিত্যের পরিচিত উপমা-রূপকাদির সমাবেশে, আর শাহী দরবারের সানাই, রূপওয়ালীর নূপুর ঝঙ্কার, শিরী-ফরহাদ ও লায়লি-মজনুর মজলিসে শরাব সাকীর উৎসবের উল্লাসে 'পলাশ অশোক' থেকে উপচে পড়া, 'ফুল-ডালি'তে হিন্দুয়ানীর সামান্য গন্ধটুকু মালুম হয়নি।

এরপর নজরুল ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উক্ত মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনেও ঢাকায় এসেছিলেন। আমি তখন বর্ধমান হাউসের হাউস টিউটর হিসেবে উক্ত ভবনের দোতলায় বাস করতাম। নজরুল ইসলাম সেবার মাসাধিককাল আমার সঙ্গে ছিলেন। বাসগৃহের সংলগ্ন একটা ছোট কামরায় তিনি থাকতেন। আমার বড় মেয়ের বয়স তখন পাঁচ বছর। নজরুল তাকে গান শেখাতেন, 'এ আঁখি জল মোছ পিয়া ভোল ভোল আমারে', 'কে বিদেশী বন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,' 'কি হবে জানিয়া বল কেন জল নয়নে'—ইত্যাদি। আমিও সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলাবার চেষ্টা করতাম বটে, কিন্তু ঠিকমত মীড়-গমক আদায় করতে পারতাম না।

এবারে বনগাঁর (ঢাকার বনগ্রাম লেন) অধিবাসিনী প্রতিভা সোম ওরফে রানু সোম (বর্তমানে বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী) এবং রমনা হাউসের অধিবাসিনী উমা মৈত্র ওরফে নোটন—(ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল সুরেন্দ্র মৈত্রের কন্যা) এই দুজনের সঙ্গে কবির বিশেষ পরিচয় হয়। রানু ও নোটন দুজনেরই পিতামাতা ও পরিবারবর্গের সঙ্গে আমার ও আমার পরিবারবর্গের সবিশেষ পরিচয় ছিল। রানুর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ও সুরেলা ছিল। নজরুল একে গান শুনিয়ে আনন্দ পেতেন। তিনি "কল্যাণীয়া বীণাকণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু" নামে তাঁর 'চোখের চাতক' উৎসর্গ করেছিলেন। রানুকে গান শেখাবার পেছনে কবির আর একটা উদ্দেশ্য ছিল দিলীপ রায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। দিলীপ রায় ইতিপূর্বে টিকাটুলির অধিবাসিনী রেণুকা সেনকে গান শিখিয়েছিলেন। তার কয়েকটা কীর্তন ইতিপূর্বে রেকর্ডে উঠেছিল। সে-সবের মধ্যে একটা গান হচ্ছে—

www.pathagar.com

'পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ।' বাস্তবিকই গানটা মিষ্টি কণ্ঠের মোলায়েম সুরের আড়ম্বরহীন মর্যাদায় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নজরুল চেয়েছিলেন রানুকে দিয়ে দিলীপের সাগরেদ রেনুকার চেয়েও উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের রেকর্ড-সঙ্গীত গাওয়াবেন। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।

এ-প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য। সে হচ্ছে, আমাদের দেশের লোকের মনোবৃত্তি। দিলীপ রায়ের সঙ্গে রেণুকার সম্পর্কের বিকৃত অর্থ করে কলকাতার সাহিত্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা দিলীপ রায়ের নাম দিয়েছিলেন 'কানুরে!' আর 'রানু'র সঙ্গে নজরুলের সম্পর্কের বিকৃত অর্থ করে সজনীকান্তের শনিবারের চিঠিতে বেরিয়েছিল 'কে বিদেশী বনগাঁ-বাসী বাঁশের বাঁশী (লাঠি ?) বাজাও বনে।' আর নওজওয়ান হিন্দু ছোকরারা একজন মুসলমান (বা মুসলা) যুবক প্রতিভা সোমকে দিন নেই, রাত নেই, যখন-তখন গান শেখাতে আসবে তা সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেনি—হয়ত তাদের কাছে এ-ব্যাপার নিজেদের পৌরুষের উপর আঘাত বা চ্যালেঞ্জের মত মনে হয়েছিল। তাই একদিন রাত দশটা-এগারটার মত সময়ে রানুদের ঘর থেকে গান শিখিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় অন্ধকারে পাঁচ-সাত জন যুবক নজরুলকে লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমণ করে। নজরুলও জওয়ান-মর্দ মানুষ, বেতের মুঠোওয়ালা একটা লাঠি কেড়ে নিয়ে তাদেরকেও দু'এক ঘা কষে লাগিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসেন বর্ধমান হাউসে। দেখলাম, জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে। হাতে-পিঠে রক্ত আর পিটুনির দাগ। অবশ্য এ নিয়ে কোন দিক থেকে আর উচ্চবাচ্য হয়নি। নজরুল রানুকে যে-সব গান শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে এইগুলো মনে পড়ছে : 'যাও যাও তুমি ফিরে (এই) মুছিনু আঁখি', 'ছাড়িতে পরান নাহি চায়, তবু যেতে হবে হায়', 'আঁধার রাতে কে গো একেলা, নয়ন-সলিলে ভাসালে ভেলা', 'আমি কি দুখে লো গৃহে রব', 'না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়', 'নাইয়া কর পার কূল নাহি জল-সাঁতার' ইত্যাদি বহু ঠুংরী খেয়াল কীর্তন এবং বিভিন্ন জাতীয় গান।

প্রিন্সিপাল মৈত্রের মেয়ে নোটন ছিল অপরূপ সুন্দরী। দিলীপ রায় ঢাকায় এসে প্রধানত প্রফেসর সত্যেন বোসের বাড়ীতেই উঠতেন। ইনি সেখানে এবং প্রফেসর বোসের বন্ধুদের বাড়ীতেও গানের আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে গান গাইতেন। তাই তিনি আমাদের বাড়ীতেও দুই-একবার এসে গান শুনিয়েছেন, তা ছাড়া মৈত্র মশায়ের বাড়ীতে, রূপবাবুর বাড়ীতে, ধানকোড়া জমিদার-বাড়ীতে এবং অন্যত্রও—কার্জন হল, জগন্নাথ হল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও গান করতেন। তবে কণ্ঠসঙ্গীতে নোটনের তেমন অনুরাগ ছিল না। সে ছিল চিত্রশিল্পী ও সেতারী; বিখ্যাত সেতার-শিল্পী হায়দর আলীর কাছে তার সেতার-শিক্ষা বিকশিত হয়। তাই দিলীপ রায়ের বা নজরুলের গানের সঙ্গে নোটন সেতারের সঙ্গত করতেন। এর বাপ-মা দুজনেই কিছুটা বিলিতি ধরণের ব্রাহ্ম ছিলেন। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতির অনুরাগীরা এঁদের বন্ধু শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। তা ছাড়া টেনিস ও দাবা খেলাতেও নোটনের অনুরাগ ছিল। নজরুল এই পরিবারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। আমি অনেকবার শুনেছি নজরুল কী গভীর আবেগে, মীড়, মূর্ছনা প্রভৃতি অলঙ্কারকে ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাগ থেকে রাগান্তরে গিয়ে আবার পূর্ব রাগে ফিরে আসতেন। ভিতরের প্রবল আবেগ বাইরে সুরের

www.pathagar.com

নব-নব প্রকাশে নিপুণভাবে বিকশিত হত—শুনে অবাক লাগতো। নজরুল ইসলামের 'নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া—পরাণ পিয়া', 'আজি ও কুসুম হার সহি কেমনে ?', 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে' প্রভৃতি বহু গানের সঙ্গে নোটন সেতারের সঙ্গত করেছেন। সে-সময় সস্ত্রীক মৈত্র মশায়, সত্যেন বাবু এবং আমিও বহুদিন এঁদের সঙ্গে সঙ্গীতালাপ উপভোগ করেছি। ...নজরুলের 'চক্রবাক' গ্রন্থখানা নোটনের নামে নয়, নোটনের বাবা "বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু'র নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। আমি জানি, নোটনের কাছ থেকে নজরুলের প্রতি কোন প্রকার বাহ্য পক্ষপাতিত্ব, সাড়া, অনুরাগ বা বিরাগ লক্ষ করা যায় নি। তাইতে মনে হয়, 'চক্রবাকে'র অনেক কবিতায় যে হতাশার সুর, অভিমানী কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি লক্ষ করেই হয়েছে বলে মনে হলেও খুব সম্ভব তাতে কবি নজরুলের মনের নানা মিশ্র-ঘটনার স্মৃতির একটা সমবেত (resultant) ছাপ পড়েছে। এ সম্পর্কে স্মরণীয়—

—ওগো ও কর্ণফুলী,
উজাড় করিয়া দিনু তব জলে আমার অশ্রুগুলি।
যে লোনা জলের সিন্ধু-সিকতে নিতি তব আনাগোনা,
আমার অশ্রু লাগিবে না সখি, তার চেয়ে বেশী লোনা।
তুমি শুধু জল কর টলমল; নাই তব প্রয়োজন
আমার দু'ফোঁটা অশ্রুজলের এ গোপন আবেদন।

রাখাল গোপাল শ্রীকৃষ্ণের মত দুর্নিবার যে-নজরুল, সে যে "কার আঁখি জলে বেঁচে রবে বলে সকল তেয়াগী" ভিখারী সেজেছিলেন তা কে বলবে ?

এ যাত্রায়ই কবির সঙ্গে মিস ফজিলাতুন নেসারও পরিচয় হয়। নজরুল ইসলাম কিছু কিছু জ্যোতিষী জানেন, এবং হস্তরেখা দেখে ভাগ্য গণনা করতে পারেন, আমার কাছ থেকে এ কথা শুনে ফজিলত নজরুলের কাছে হাত দেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সে ইচ্ছা সহজেই কাজে পরিণত হয়। এইভাবে ফজিলত ও তার ছোট বোন সফীকুন নেসার সঙ্গে নজরুলের দেখাশোনার সূত্রপাত হয়। বর্ধমান হাউসে আমার ভাইবোনসহ অনেক লোক থাকায় আমিও বাইরের ছোট ঘরটায় নজরুলের সঙ্গেই এক বিছানায় শুয়ে রাত কাটাতাম। একদিন প্রাতে উঠে দেখি নজরুল বিছানায় নেই। ব্যাপার কি ? পরে অনেক বেলাতে জানা গেল কখন যেন তিনি আলগোছে উঠে চলে গিয়েছিলেন, দেওয়ান বাজার রাস্তার উপর অবস্থিত ফজিলতের গৃহে। সেখানে কখন গিয়েছিলেন, কতক্ষণ ছিলেন, কি করেছিলেন—সারারাত কি সেখানেই ছিলেন, না সেখান থেকে রমনা লেকের ধারে এসে দিনান্তের বিকাল বেলাকার অভ্যাসটা সম্প্রসারিত করে সেদিনের নিশান্তের শেষ যামটাও সেখানে বসেই লেকের পানি, গাছপালা ও ঘাসপাতা দেখে দেখেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন, এ-সব তথ্য আমি জিজ্ঞাসাও করিনি, জানতেও পারিনি। তবে পরদিন একটা ঘটনা লক্ষ করেছিলাম, ফজিলতের গলার লম্বা মটর-মালার হারটা ছিন্ন। পরে সেটা সোনার দোকান থেকে জোড়া লাগিয়ে আনতে হয়েছিল। এরপরে নজরুল ঢাকা থেকে কলকাতা চলে যান। যাবার সময় সেই

www.pathagar.com

নজরুল-মারা মুঠোওয়ালা বেতের লাঠিটা আমাকে দিয়ে যান। কলকাতা থেকে তিনি আমাকে কয়েকখানা চিঠি লিখেছিলেন এবং আমার চিঠির সঙ্গে ফজিলতের কাছেও একখানা কাব্যিক চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই কাব্য-চিঠির নাম 'রহস্যময়ী'। পরে ঐ নাম বদলিয়ে 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' নাম দেওয়া হয়। আমার কাছ থেকে নজরুলের লেখা চিঠিগুলো নিয়ে অধ্যাপক আলী আশরাফ নজরুল-চরিতের একটা দিক উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন।[১] তাতে ঘটনার কিছু কিছু বিকৃতি থাকলেও বোধ হয় সাহিত্যিক বিচারে যতটা আন্দাজ করা সম্ভব তা তিনি করেছেন। নজরুলকে লেখা আমার চিঠিগুলোর নকল আমার কাছে নেই; আর সে সব চিঠি কি নজরুলের কোন দেরাজে এখন পর্যন্ত রয়েছে ? তারও সম্ভাবনা খুব কম। তবু আমার প্রতি তাঁর মনে যে একটা কোমল সখ্যভাব ছিল, তার একটা পরিচয় এই যে, ১৯৪৩ সালের পরে ঢাকা থেকে কবির সুচিকিৎসার জন্য কিছু চাঁদা তোলা হলে কাজী আবদুল ওদুদ ও আবদুল কাদির প্রমুখ কয়েকজন নজরুলের কাছে সেই টাকা দিতে যান; তখন নজরুল প্রায় সংজ্ঞাহীন। তাঁদের কাছে শুনেছি সে-সময়ও তিনি কয়েকবার 'মোতাহার' 'মোতাহার' নাম উচ্চারণ করেছিলেন। নজরুলের অবচেতন মনে প্রীতির এই স্মরণটুকু আমার কাছে এক মহামূল্যবান সম্পদ। যা হোক উপরে যা বলতে যাচ্ছিলাম সে হলো : শুধু চিঠিগুলো আর রহস্যময়ী কবিতার মধ্যে কবি-চিত্তের যে পরিচয় পাওয়া যায়—যা, আলী আশরাফ আন্দাজ করেছেন বা জাস্টিস আবদুল মওদুদ সাহেব যুক্তিযুক্তভাবে প্রমাণ বা অনুমান করেছেন, তা হয়ত সত্যের কাছাকাছি কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়।[২] আমিও রহস্যময়ীর সব কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারিনি; ছিন্ন হারেরই বা তাৎপর্য কি, তা-ও আমার কাছে 'রহস্যময়'। তবে এ-সব কথার উপলক্ষ ফজিলত হলেও সবটা লক্ষ্য "কারো একার প্রাপ্য নয়" বলেই আমার বিশ্বাস।

নজরুল ইসলামের কবি-প্রকৃতি বিশেষকে নির্বিশেষ করে উপমা, রূপক অলঙ্কার প্রভৃতি যোগে কালাশ্রিত ঘটনাকেও কালাতীত বাণীর মত করে তোলে—তার ইঙ্গিতের কতটুকু দৃঢ়মূল (মহকুমা) আর কতটুকু কল্পমূল (মুতাশাবিহা)তা নির্ণয় করা কঠিন; নির্ণয় করতে যাওয়াও বোধহয় সঙ্গত নয়, আর তার প্রয়োজনও নেই। এ সম্পর্কে কবির 'দাড়ি-বিলাপ' কবিতার কথা স্মরণ করা যায়; যার পাদটীকায় লেখা আছে—"কোন প্রফেসর বন্ধুর দাড়িকর্তন উপলক্ষে রচিত।" এই সুন্দর হাসির কবিতাটাতে কবির সুদূরপ্রসারী কল্পনা নাট্য-সম্ভবা মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে। কাবুলীওয়ালা, ভীরু বাঙালী, ভোজপুরী দারোয়ান, পাঞ্জাবী-বেলুচী-শিখ-বীর-রাজপুত, দরবেশ-মুনিঋষি-বাবাজী-অদ্ভুত, বোকেন্দ্র গন্ধিত ছাগ, শিম্পাঞ্জী, গরিলা, বটবৃক্ষ, রসুন-পেঁয়াজ প্রভৃতি পর্যায় পার হয়ে দিলীপকুমার, কার্জন হল, গানের আসর, গায়িকা বালিকার ভয়, তারপর সুন্দরী এক মহিলার ব্রোচে দাড়ি আটকে যাওয়ার দুর্গতি এবং সবশেষে গানের

১. 'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়' সম্পাদনায় : সৈয়দ আলী আশরাফ।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'য় জাস্টিস আবদুল মওদুদ কর্তৃক 'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়ে'র আলোচনা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

আসরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পংক্তি :

চীৎকারিল নারীদল নব নব সুরে
বানর নরের দল হাসিল অদূরে
ঝিঁঝিট-খাম্বাজে কেহ, কেহ মালকোষে,
হিন্দোলে হুঙ্কারি কেহ ওস্তাদি আক্রোশে।
যত পালাইতে চাই তত বাধে দাড়ি;
দাড়ি লয়ে পড়ে গেল শেষে কাড়াকাড়ি
পুরুষ নারীর মাঝে! ক্ষুরে ও কাঁচিতে
হাসিতে হল্লাতে গোলে কাশিতে হাঁচিতে
লাগিল ভীষণ দ্বন্দ্ব!...যখন চেতনা
ফিরিয়া পাইনু গৃহে, হেরি আনমনা
হাসিছে গৃহিণী মম বাতায়নে বসি।
জাগিতে দেখিয়া কহে, "এত দিনে শশী
হ'ল মেঘমুক্ত, প্রিয়।"
মুকুরে হেরিয়া মুখ কহিলাম আমি,
"আমি কই ?" সে কহিল, "মুকুরেতে স্বামী!"

এমন মজার দাড়িবধ-কাব্যের দাড়ি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান, আর সেই গোবেচারী প্রফেসর বন্ধুটাও হয়ত ভিতরে ভিতরে রসিক-সুজন। কিন্তু যদি আমরা গবেষণা করতে বসি, এই 'অজদেব'টি কে ? গায়িকা বালিকাটির নাম কি ? কার ব্রোচে দাড়ি আট-কালো ? সেই ব্রোচওয়ালীর স্বামী ও শ্যালক বলে কাকে কাকে বুঝাচ্ছে ? দিলীপকুমার কোন সালের কোন তারিখে কার্জন হলে এসে গান করেছিলেন—এ ধরণের গবেষণায় ডক্টরেট থিসিস হতে পারে, কিন্তু কাব্যবোধ-বা রসাস্বাদনের দিক থেকে এর বিশেষ মূল্য নেই। উপরের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর যদি বা পাওয়া যায় তবু তাতে শুধু অলস কৌতূহলের কিছুটা নিবৃত্ত হতে পারে; কিন্তু তাতে কাব্যেরই বা কি, আর কাব্যরসেরই বা কি এসে যায় ?

নজরুল সম্বন্ধে হয়ত আরও কিছু ঘরোয়া সংবাদ দেওয়া সম্ভব, কিন্তু তাতে কি লাভ ? নজরুল ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ উদিত হয়েছিলেন, তারপর রং-বেরং-এর ভেল্কি দেখিয়ে কতজনের মনে হাসি-অশ্রু, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম-বিদ্বেষ, মান-অভিমান, কল্পনা-কৌতুক, উৎসাহ-ভয় উদ্রেক করে, কত নিদ্রিতকে জাগ্রত করে, জাগ্রতকে কর্মরত করে আজ নিজের ভিতরে নিজেই মুদিত হয়ে রয়েছেন। এখন আর "ফুল শাখাতে দোল" দিয়ে কাজ নেই, "উৎপীড়িতের" চিরন্তন "ক্রন্দন-রোল" উত্তরোল থাকতে থাকতেই "বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত" কবি শান্ত হয়ে পড়েছেন, আমরাও এখানে ক্ষান্ত হই।

'নজরুল একাডেমী পত্রিকা'
গ্রীষ্ম, ১৩৭৬

www.pathagar.com

নজরুলকে যেমন দেখেছি

যতদূর মনে পড়ে নজরুলকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯২০/২১ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সামনে কলেজ স্ট্রীটের একটা মেসের দোতলায়। তাঁর পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, মাথায় বাবরি, চিকন কালো বর্ণ, ডাগর ডাগর চোখ আর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। খুব সম্ভব, কাজী আকরম হোসেন সাহেবই আমাকে সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ঐ কামরায় আরও তিন-চারজন লোক ছিল। সহচরদের সঙ্গে তিনি আড্ডায় মত্ত ছিলেন। হাসির হর্‌রা শোনা যাচ্ছিল নীচের থেকেই। সেদিন শুধু পরিচয় হল, আলাপ জমলো না। তিনি নামকরা কবি, আমরা দুজনই এম. এ. ক্লাসের ছাত্র, আমাদের মনে চমক। তাঁর মনেও বোধ হয় বিদ্বানের প্রতি একটু সমীহ! এরপর কলকাতার তালতলায়, ডক্টর লেনে, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে, বেনেপুকুরে, ইসমাইল স্ট্রীটে, পানবাগানে, বাদুড়বাগানে, মানিকতলায়, কড়েয়ায়, জেলিয়াটোলায়, শ্যামবাজারে, আলীপুর রোডে, ক্রীক রো-তে, ইলিয়ট রোডে, আপার সার্কুলার রোডে, মোহাম্মদী অফিসে, সওগাত অফিসে প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে, তাঁর ভাড়াটে বাড়ীতে কিংবা গ্রামোফোন অফিসের কক্ষে তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার সুযোগ হয়েছে। এ-স্থানগুলো এলোপাতাড়িভাবেই উল্লেখ করা হল—কারণ, কালানুক্রমিকভাবে কিছুটা ধারণা থাকলেও সঠিকভাবে বলতে পারব না।

এসব মেলামেশার ফলে বুঝতে পেরেছি,—নজরুল বেশ মিশুক লোক যার সঙ্গে একবার দেখা হয়েছে, তাকে বহুদিন পরে দেখলেও—প্রথম দেখা কোথায় ও কখন হয়েছিল, সেসময় কি কথাবার্তা হয়েছিল, তাও বলে দিতে পারতেন। তাঁর সঙ্গে বিশেষভাবে মেলামেশার প্রথম সুযোগ হয় একবার কারমাইকেল হস্টেলের একটা ফাংশনে, গানের মজলিসে। ঘটনাটা ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যেই ঘটেছিল। নজরুলের হার্মোনিয়ম বাজানোর দক্ষতা, আর দরদী গানের মাধুর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনিও আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, বোধ হয় তাঁর গানের একটা সমঝদার পেয়েছেন ভেবে। আমি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক—মুসলিম অধ্যাপক—এ খুশিটাও হয়ত তাঁকে অনুরাগী করে তুলেছিল। বিশেষ করে আমি তাঁর বাসায় গিয়ে একদিন আবিষ্কার করলাম যে তিনি দাবাও খেলতে জানেন, সুতরাং, বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

জেলিয়াটুলীর গলিতে তাঁর বাসা ছিল একদম রাস্তার পারে। তাই, ভোর থেকেই তাঁর গানের আওয়াজ শোনা যেত; আর তাই শুনতে পেয়ে মুটে-মজুররা পর্যন্ত অনেকসময় সওদা বা বোঝা মাথায় রেখেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে গান শুনতো। গানের ঘরখানা ছিল দোতলায়, সেখানে প্রবেশ করা সহজ ছিল না।—কে ? কেন ? কি কাজ ?

www.pathagar.com

ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নের জওয়াব দিয়ে চিরকুটের উপর নাম লিখে, উপর থেকে নজরুলের মাসীমার কাছ থেকে সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত ঘরে ঢুকবার যো ছিল না। গান চলতে থাকার সময় ত নজরুলের গলা শুনেই জানা যেত তিনি বাড়ীতে আছেন,—তাই 'বাড়ী নাই' 'বাইরে গেছেন' এ-সব অজুহাত চলতো না। অবশ্য তখনও বিশিষ্ট চেনা লোক ছাড়া অন্যেরা সহসা ছাড়পত্র পেত না। কিন্তু ঘর যখন নিস্তব্ধ তখন নজরুল বাড়ীতে থাকলেও গেটের জিম্মাদাররাই অনায়াসে বলে দিত, কবি বাইরে গেছেন। পরবর্তীকালে উপরে উঠবার দরজাতেই 'In' 'Out'-এর তক্তায় প্রায় সর্বদাই 'Out' লেখা থাকতো। তবে, বিশিষ্ট চেনা লোক হলে 'Out' লেখা থাকলেও দর্শনার্থীকে উপরে নিয়ে যাওয়া হতো। আমিও এই সৌভাগ্যবানদের দলেই ছিলাম। কাজেই, আমার নাম বললেই আর ভিতরে প্রবেশে বাধা হত না।

নজরুল হস্তরেখা দেখে ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারতেন। একবার কলকাতার ওয়েলেসলি স্কোয়ারে, আমার শ্বশুরবাড়ীতে—তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমার শ্যালকদের ও আমারও হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এক শ্যালককে বলেছিলেন, "তোমার ভাগ্যে বিদেশযাত্রা আছে।" একথা পরে ঠিকই হয়েছিল। আর একজনের বিষয়ে বলেছিলেন, "এ বহু দূরদেশে চলে যাবে, অজ্ঞাতবাসের মত।"—এর মৃত্যু ঘটেছিল। আমার সম্বন্ধেও বলেছিলেন, "তোমার যশোরেখা খুব স্পষ্ট, বিদেশযাত্রা হবে, কিন্তু অনেক প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হয়ে সফলতা অর্জন করতে হবে।"

১৯২৫ সালে একবার All India Chess Tournament হয়—স্টেটসম্যান কাগজের কর্তারা এর আয়োজন করেছিলেন। দশজন প্রতিযোগী নির্বাচন করা হবে, লোকও ঠিক ছিল। কিন্তু একজন হঠাৎ অন্যত্র চলে যাওয়াতে একটা জায়গা খালি হল। তখন আমি নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করিয়ে সুপারিশ করাতে তিনিও একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একজন ছিলেন রবার্ট পিংলার—যুগোস্লাভিয়ার ন্যাশনাল চেস্ মাস্টার। তিনি সবার সেরা ছিলেন, আর নজরুল ইসলাম ছিলেন সবার নীচে। আমি ভাবলাম, নজরুলকে প্রথমে একটু সুযোগ দিই, পরে সামলে নিয়ে জিততে পারব। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, সুযোগ দেওয়ার পরে তিনি এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন যে আমি হেরেই গেলাম। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, আমি দ্বিতীয় স্থান পেতে পারতাম, কিন্তু শেষে তৃতীয় স্থানে নেমে গেলাম। নজরুল কিন্তু আমার থেকে এক পয়েন্ট আর একজনের থেকে আধ পয়েন্ট, এই দেড় পয়েন্ট মাত্র লাভ করে সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করেছিলেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলো, আমার এক বন্ধু, নাম সতীশচন্দ্র আড্ডি। এ-স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন দাবা প্রতিযোগিতা চলতে থাকার সময় নজরুল প্রতিদিন আমাকে ওয়েলেসলি স্কোয়ার থেকে রাত আটটার সময় স্টেটসম্যান অফিসে নিজের গাড়ীতে তুলে নিতে যেতেন, আর রাত দুটো-আড়াইটায় খেলার শেষে আমাকে বাসায় পৌঁছিয়ে দিতেন।

নজরুল একদিন আমাকে ও আড্ডিকে সাহিত্যিক শরৎ চ্যাটার্জির বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। নির্দিষ্ট দিনে আমাদের দুইজনকে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে

www.pathagar.com

সন্ধ্যার সময় মনোহরপুকুর রোডে শরৎবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ শরৎচন্দ্র দাবাগুটি সাজিয়ে একা একা বসে আছেন আমাদের অপেক্ষায়। উনি বললেন, "তোমরাই দুজনে খেল, আমি শুধু দেখব।" খেলা শুরু হল। আমাদের এক বাজী খেলতে খেলতেই রাত প্রায় বারোটা হয়ে গেল। শরৎবাবু মাঝে মাঝে উভয়দিকে দুই-একটা চাল বাতলাতে লাগলেন। দুজনেই বুঝলাম, উনি কেমন খেলেন। ভদ্রতার খাতিরে, ওঁর চাল গ্রহণ করলে পরিণাম কেমন দাঁড়াবে সেকথা বুঝিয়ে দিয়ে আমরা নিজেদের পছন্দমত চালই দিতে লাগলাম। দুজনেই খুব সতর্কভাবে খেলাতে শেষমেশ বাজিটা চটে গেল। শরৎবাবু 'লাল মন্তি' (লাল-মন্ত্রী)-সম্বলিত একটা চমৎকার গল্প লিখেছেন বলে অনেকের ধারণা, তিনি মস্তবড় দাবা খেলোয়াড়। কিন্তু আসলে তা নয়—তিনি মাঝারিগোছের খেলোয়াড় ছিলেন।

নজরুল ইসলাম হিসেবী লোক ছিলেন না। তাই হাতে টাকা আসলেই অমনি তা খরচ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। অনেকসময় বই-এর কপিরাইট বিক্রয় করে পাওয়া টাকা আঁওদা-বাঁওদা (এদিক-সেদিক) খরচ করে ফেলে শেষে পুস্তক প্রকাশকদের কাছ থেকে ঋণ করে সংসার চালাতেন। তাঁর মন ছিল সাম্যবাদী। "আমি যখন বন্ধুবান্ধবের জন্য খরচ করতে বা তাঁদের সাহায্য করতে দ্বিধা করিনে, তখন তাঁরাই বা কেন আমার অভাবের সময় আমাকে সাহায্য করবেন না ? টাকা আমার দরকার ছিল, ওঁরা তা দিয়েছেন, কিন্তু তা আবার ফেরত দিতে হবে,—এ কেমন কথা ?" তিনি ছিলেন বেহিসেবী মানুষ—তাই তাঁর পক্ষে মোটরগাড়ী কিনে, দশ-পাঁচজন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে শহরে শহরে ঘুরে বেড়ানো, বা নিজের খরচায় টিকিট করে দল বেঁধে ঢাকা, চট্টগ্রাম বা কুচবিহারে ভ্রমণ করে বেড়ানো আশ্চর্যের কথা নয়। তাঁর মনটা ছিল বড় উদার। কাউকে তিনি পর ভাবতেন না, সবাই তাঁর আপন; সবাই তাঁর সমান। 'আমার সম্পদ তাঁদের সম্পদ, তাঁদের সম্পদও আমার সম্পদ।' টাকার মত সময়ও যথেচ্ছ ব্যয় করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। হয়ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অমুকের বাড়ীতে বা অমুক শহরে নিমন্ত্রণে যাবেন; কিন্তু সেসব তাঁর মনে থাকতো না। হয়ত গান-বাজনার আসর বসেছে, কোনও বন্ধুর বাড়ীতে, গানের পর গান গেয়ে যাচ্ছেন, আর বাটাভরা পান শেষ করে ফেলছেন—ওদিকে নিমন্ত্রণকারীরা তাঁকে খুঁজে খুঁজে হয়রান! আর এইরকম করাতেই যেন তিনি অধিক আনন্দ পেতেন। শিল্পী হিসাবে তাঁর মনে বিশেষ গরব ছিল। কেউ যদি তাঁকে বলতেন—"এ তোমার কেমন ব্যবহার ? তোমার জন্য রায়বাহাদুর খানবাহাদুররা অপেক্ষা করছেন, তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তাঁদের সঙ্গে নৌ-বিহারে যাবে, আর তুমি এখানে বসে বসে গল্প মারছো ?" তাহলে তিনি অম্লান বদনে জওয়াব দিতেন—"রায়বাহাদুর খানবাহাদুররা অপেক্ষা করবেন না ত কি করবেন ? জাননা আমার সঙ্গে তাঁদের কি সম্বন্ধ ? আমি কবি আজ রাজপথ দিয়ে হাতীতে চড়ে যাব, আর রায়বাহাদুর খানবাহাদুররা রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আমাকে কুর্নিশ করবেন,—এই ত আমাদের মধ্যেকার আসল সম্পর্ক।"

এই সরলমনা কবি, সত্যিই মনেপ্রাণে কবি। কোনও কৃত্রিমতা নেই, উদ্বেগ নেই—নিজের মনে নিজেই বুঁদ হয়ে রয়েছেন। যা যখন মনে আসে, তাই তখন করা চাই।

www.pathagar.com

এই খামখেয়ালী সদানন্দ কবি প্রেমের সাধক। সংসার আনন্দময়—তাই দুষ্ট শিশুর মত নির্বিঘ্নে যা মনে আসে তাই করবার তাঁর অদম্য বাসনা। এই শিশুত্ব-গুণেই তিনি সবার কাছে প্রিয়, তাঁর বিচারের মাপকাঠি আমাদের সাধারণ মানুষের ধারণাতীত, তাঁর নৈতিক বিচার আমরা করতে যাব না, করতে গেলে সেটা তাঁর প্রতি ন্যায়বিচার হবে না।

www.pathagar.com

আমার বন্ধু নজরুল : তাঁর গান

১৯১৯ সালে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' মাসিক 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। সেই তরুণ বয়সে আমার সাহিত্যজ্ঞান তখন কতটুকুই বা। একজন মুসলমানের, যাঁর আবার পদবী কাজী, বাংলা ভাষায় তাঁর দখল দেখে আমি রীতিমত উল্লসিত হয়ে উঠি। মনে মনে এই অদেখা বন্ধুটিকে আমার নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত বলে অনুপ্রাণিত হলাম। তারপর ১৯২০ সাল থেকে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় একের পর এক তাঁর উদ্দীপনাময় কবিতাগুলি প্রকাশিত হতে লাগল। এই ঘটনা স্বপ্নের মত রোমাঞ্চকর বলে মনে হত আমার কাছে। ঐ কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলোর প্রচলিত ধর্ম-নীতি বিরুদ্ধ কথাবার্তা যেমন আমি মেনে নিতে পারতাম না, তেমনি ধর্মাদর্শে সংরক্ষণশীল হয়েও সেগুলোকে যা-তা বলে উড়িয়েও দিতে পারতাম না। ফলে আমার আবেগ ও যুক্তির মধ্যে একটা তোলপাড় লেগে যেতো।

বাংলা সাহিত্যাকাশের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটির সঙ্গে দেখা করতে আমি আগ্রহী হয়ে উঠলাম। শীগগিরই একটা সুযোগ এসে গেলো। আমার কলেজের সহপাঠী কাজী আকরম হোসেনের আত্মীয়-পরিবারের একটি মেয়ের সঙ্গে ১৯২০ সালের ১০ই অক্টোবর কলকাতায় আমার বিয়ে হয়। আমার শ্বশুরবাড়ী ছিল ১১ নং ওয়ালীউল্লাহ্ লেনে—ওয়েলেসলি-স্কোয়ারের পূর্ব দিকের গেটের দক্ষিণকোণ বরাবর। তারিখটা ঠিক কবে এখন সঠিক মনে করতে পারছি না—তবে ১৯২০ কিংবা ২১-এর মধ্যে কোন একদিন হবে; আকরম (আমার স্ত্রীর ইনসান মামু) ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে নিয়ে যান। তাঁর ঘরের সিঁড়িতে পৌঁছবার সরু গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নজরুল যে-ঘরে থাকেন সেই বাড়ীর দোতলা থেকে আমরা তাঁর হাঃ হাঃ হাসির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। ঘরের মধ্যে ৬/৭ জন আগন্তুক পূর্বাহ্নেই উপস্থিত ছিলেন—কবি তাঁর স্বভাবগত প্রাণের উদ্বেল স্পর্শে সবাইকে আনন্দে মাতিয়ে রেখেছিলেন। ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুহাত বাড়িয়ে আমাদের দিকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। এবং আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস আমরা কাজী কি কৈবর্ত তা নিয়ে তিনি আদৌ মাথা ঘামাননি। কিন্তু আমরা দুজনই প্রফেসর—একজন কলেজের, অন্যজন বিশ্ববিদ্যালয়ের—একজন ইংরেজীর, অন্যজন ফিজিক্সের (তখনকার দিনে কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোন শিক্ষককে প্রফেসর বলা হত) শুনে তিনি সত্যিই খুশি হলেন। আমি লক্ষ করলাম যে প্রফেসরদের প্রতি বিশেষ করে মুসলমান প্রফেসরদের প্রতি তাঁর একটা অবিচল শ্রদ্ধা আছে—সে-সময় যাঁদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল। বস্তুতঃ আমাদের এক কাপ করে চা এবং কয়েকটি সঙ্গীত দিয়ে আপ্যায়ন করা হল। নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে (নজরুল) গান করলেন। অপূর্ব নিখুঁত

www.pathagar.com

ভঙ্গিতে তিনি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন; এবং সেইকালে যখন বাঙালি মুসলমান সমাজে সঙ্গীত হারাম না হলেও মকরুহ্ ছিল।

২

একবার এক ব্যাপার ঘটল। স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব দাবা খেলা পছন্দ করতেন। তিনি একদিন নজরুল ইসলামকে, আমাকে ও মিঃ আড্ডিকে নিয়ে তাঁর বাসায় যেতে বললেন আমাদের খেলা দেখবেন বলে। সুতরাং নজরুল ইসলাম মিঃ আড্ডিকে তাঁর নেবুতলা এ্যাভিনিউ (বউবাজার)-এর বাড়ী থেকে এবং আমাকে তালতলা থেকে তাঁর গাড়ীতে তুলে নিয়ে গোধূলি-সন্ধ্যায় ঢাকুরিয়া লেক এরিয়া থেকে অর্ধ-মাইল দূরে অবস্থিত শরৎচন্দ্রের শরৎচন্দ্র এ্যাভিনিউয়ের বাসায় পৌঁছলেন। আমরা দেখলাম বৃদ্ধ ঔপন্যাসিক একটি দাবার ছকের সামনে বসে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। আমরা এক মুহূর্ত দেরী না করে খেলায় বসে গেলাম এবং রাত্রি সাড়ে বারোটা পর্যন্ত একটানা খেললাম। গৃহকর্তা শরৎচন্দ্র ও নজরুল সারাক্ষণ বসে খেলা দেখছিলেন আর নজরুল ইসলাম ও অতিথি-খেলোয়াড়দের প্রচুর পান ও চা জোগাচ্ছিলেন। খেলার ফলাফল হয়েছিল সমান সমান। খেলার পর পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী কিছু খানাপিনা হল। তারপর নজরুল ইসলামের গাড়ীতে করে আমরা ঘরে ফিরে এলাম।

আড্ডি এবং আমি উভয়ে প্রায়ই নজরুলের বাড়ীতে যেতাম; এবং গৃহকর্তারও বাড়ীতে অবশ্য নির্দেশ দেওয়া থাকত যে, কবি বাড়ীতে উপস্থিত নেই, এমন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে যেন আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া না হয়। ব্যাপার হল অনাহূত আগন্তুকেরা এসে কবিকে বিরক্ত করতো বলে উদ্দেশ্যজনকভাবে তিনি তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ পথের উপর একটি "বাড়ী নেই" বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে রাখতেন। আমার মনে হয়, দাবা খেলোয়াড় হিসাবে নজরুল বড় জোর কলকাতার মাঝারি খেলোয়াড়দের সমান ছিলেন। সুতরাং ১৯২৫-এ কলকাতার দাবা প্রতিযোগিতায় তাঁর অন্তর্ভুক্তি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, যদিও আমি ছাড়া অন্য একজন সাধারণ প্রতিযোগী থেকে অর্ধেক পয়েন্ট তিনি জিতে নেন।

৩

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর প্রথম বাৎসরিক সভায় বিশিষ্ট সম্মানীয় অতিথি হিসেবে নজরুল ইসলাম আমন্ত্রিত হন—বিশেষ করে উদ্বোধনী-সঙ্গীত গাইতে এবং 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র তরুণ সদস্যদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিতে। গোয়ালন্দ থেকে লঞ্চে নারায়ণগঞ্জে আসার পথে 'খোশ আমদেদ' (স্বাগতম) নামে উদ্বোধন সঙ্গীতটি তিনি রচনা করেন। করতালির মধ্য দিয়ে গানটি এইভাবে শুরু হয় :

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালী!
ও চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি!!

www.pathagar.com

এখানে নজরুল অতিথিদের যে-কথা বলে সম্বোধন করেন বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় প্রবাদ অনুযায়ী তার তাৎপর্য হল একটি নতুন শিশুর বেহেশত থেকে দুনিয়ায় আসা মানে এক অবিনশ্বর (অতীত) কাল থেকে অন্য অবিনশ্বর (ভবিষ্যৎ) কালে যাওয়ার পথ পরিক্রমামাত্র। ঢাকার প্রগতিশীল তরুণ-তরুণীদের প্রতি এটি ছিল তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। রাষ্ট্র অথবা আভিজাত্যের দ্বারা শোষিত নিষ্পিষ্ট সাধারণ মানুষের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য, মুক্ত ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার জন্য ভবিষ্যতের দিকে উন্নত আদর্শে বলীয়ান হয়ে কুসংস্কারকে পদদলিত করতে তাঁর এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। তরুণদের প্রশংসা করে এমন প্রাণমন মিশিয়ে আবেগ-উদ্দীপনার সঙ্গে গানটি তিনি গাইলেন যে সমস্ত দর্শক ত বটেই এমন কি গানকে দুচোখে যাঁরা দেখতে পারতেন না এমন দুচারজন লোক, যাঁরা সভা পণ্ড করতে এসেছিলেন, তাঁরাও কথা ও সুরের মাদকতায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

৪

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, উক্ত সভায় আমি 'সঙ্গীতে মুসলমানের অবদান' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি। অধিকাংশ দর্শকের মতে আমি নাকি একটা বিস্ময়কর তথ্য উদঘাটন করেছিলাম। আমার সৌভাগ্য এই যে, আমাকে কোন বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়নি। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট, যা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে, নজরুলের সঙ্গে কমপক্ষে তিনটি ব্যাপারে আমার সাধারণ মিল ছিল। প্রথমতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্যায়ে আমাদের জন্ম, দ্বিতীয়তঃ দাবা খেলার প্রতি ঝোঁক এবং তৃতীয়তঃ সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্তি। যতটা মনে পড়ে ১৯২৭ সালে নজরুল যখন ঢাকাতে আসেন তখন তিনি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে সলিমুল্লাহ্‌ মুসলিম হলের একটি কক্ষের নীচের তলায় পূর্বদিকের অর্ধাংশে আস্তানা গাড়েন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ তখন সলিমুল্লাহ্‌ মুসলিম হলের হাউস টিউটর হিসেবে উক্ত গৃহের বাসিন্দা ছিলেন। সলিমুল্লাহ্‌ মুসলিম হলে বড় ডাইনিং হলে সাহিত্য-সমাজের প্রথম অধিবেশন বসে। যা হোক, সভাশেষে নজরুলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সাধারণ পরিচয় থেকে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ঢাকাতে সে যাত্রা তিনি তিনদিন অবস্থান করেন। ঐ সময় উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার জগন্নাথ হলে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কবি সেখানে তাঁর কতকগুলি জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন। যার একটি হল :

কে বিদেশী বন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে ?

৫

১৯২৮ সালে সাহিত্য-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলনীতে তিনি আবার আমন্ত্রিত হন—তাঁর উদ্দীপনামূলক সঙ্গীত ও বক্তৃতা দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য। এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত মার্চ-সঙ্গীতটি গেয়েছিলেন—যার শুরুটা হল এমনি :

চল্‌ চল্‌ চল্‌
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল

www.pathagar.com

নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌॥

এগিয়ে চলার এই অগ্নুদ্দীপক আহ্বান বাঙালির গোটা ইতিহাসকে পুনর্জাগরণের মন্ত্রে উদ্বোধিত করে তুলেছিল। সভাশেষে কবির নিকট আমন্ত্রণ এল বুড়িগঙ্গাতীরের জমিদার রূপবাবুর বিশাল অট্টালিকা থেকে, পুরানো হাইকোর্টের অঙ্গনে অবস্থিত অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের গৃহ থেকে এবং আরও বহু বুদ্ধিজীবী কৃষ্টিমান নাগরিকদের কাছ থেকে, বিশেষ করে কবির কল্লোল-গোষ্ঠীর বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে, যাঁদের মধ্যে প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

এই সময় নজরুল ইসলাম বর্ধমান হাউসের (বর্তমান বাংলা একাডেমী) নীচের তলায় আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতেন। আমি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউস টিউটর হিসাবে তখন ওখানে বাস করছিলাম। এই সব নিমন্ত্রণে অধিকাংশ সময়েই আমি নজরুলের সঙ্গে যেতাম এবং তাঁর গান ও কথাবার্তা উপভোগ করতাম।

রূপবাবুর বাড়ীতে তিনি অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন কারণ ঐ সময় ঢাকার সকল অভিজাত ব্যক্তিই সেখানে জমা হয়েছিলেন। গানটি হল :

বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে কে উদাসিনী।
কে এলে পথ ভুলে এ অকূলে বন-হরিণী॥
কলসে জল ভরিয়া চায় করুণায় কুলবধূরা।
কেঁদে যায় ফুলে ফুলে পদমূলে সাঁঝ-তটিনী॥
হারালি গোধূলি-লগনে, কবি কোন নদী কিনারে,
এ কি সেই স্বপ্ন চাঁদ পেতেছে ফাঁদ প্রিয়ার সঙ্গিনী।

বুড়িগঙ্গার বাড়ীতে ঐ গান প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এক আশ্চর্য সঙ্গতির সৃষ্টি করেছিল। আরও যে একটি গান তিনি গেয়েছিলেন সেটি হল :

জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত অপমানহত।
যত অত্যাচারে আজ বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত জনমন-মথিত বাণী
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত॥

এটা তাঁর কাব্যের একটি প্রধানতম বিষয় যা নজরুল ইসলামকে কাব্যরাজ্যের রাজসিংহাসনে বসিয়েছিল।

www.pathagar.com

৬

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র একজন ভাল কবি ছিলেন। তিনি অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর সনেট ও গান লিখেছিলেন। খুব ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতে পারতেন তিনি। তাঁর স্ত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট ছাড়াও একজন চিত্রশিল্পী ও পিয়ানো-বাজিয়ে ছিলেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা কুমারী উমা মৈত্র ওরফে নোটন সেতার ও পিয়ানোর একজন শিক্ষার্থী ছিলেন। সে সময় তিনি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই. এসসি. পরীক্ষায় পাশ করে বেরিয়ে এসেছেন এবং দাবা খেলায় মোটামুটি শিক্ষালাভ করেছেন। বলাবাহুল্য লন টেনিস খেলতেও তিনি তখন চমৎকার পারদর্শিতা লাভ করেছেন। কিন্তু কোন রহস্যজনক কারণে জানি না তাঁকে বি. এ. কিংবা বি. এসসি. পড়তে দেওয়া হয়নি, অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ঠিক উল্টোদিকে অবিস্থত) ছিল কলেজ রোড নামক প্রধান সড়কের অপর পাশে।

প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় এবং প্রফেসর সত্যেন বসু (ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ) এই পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। দিলীপ রায় ঘন ঘন কলকাতা থেকে ঢাকাতে আসতেন এবং নোটনকে শুধু ব্রহ্মসঙ্গীতই নয় তাঁর নিজের লেখা এক ধরণের উচ্চাঙ্গ রাগসঙ্গীতও শেখাতেন। মৈত্র পরিবারটি ছিল সবদিক দিয়ে উদার; এবং তাঁদের কাছে হিন্দু-মুসলমান বলে কোন কথা ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ের সুধীজনেরা তাঁদের বন্ধু ছিলেন। যেমন উদাহরণতঃ প্রফেসর সত্যেন বোস (একজন হিন্দু), অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন (একজন মুসলমান), প্রফেসর বঙ্কিমদাস ব্যানার্জি (অঙ্কের প্রফেসর, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ চালু হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বদলী হয়ে তিনি সেখানে যান) এবং শহরের অনেক গুণীজ্ঞানীজন অধ্যক্ষ মৈত্রের বাড়ীতে উদার অভ্যর্থনা পেতেন। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও খেলাধূলা ও সঙ্গীতের প্রতি অধ্যক্ষ মৈত্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল। আমিও সময়সময় হাইকোর্টের অন্তর্গত অধ্যক্ষের পারিবারিক লনে আমার প্রফেসর বঙ্কিম বাবু, তাঁর ছেলে অজিত, অন্য একজন প্রফেসর সুরেন ঘোষ (পদার্থবিদ্যা) এবং তাঁর দুই ছেলে ডাকু ও টুকুর সঙ্গে টেনিস খেলতাম। দিলীপ রায় দাবা খেলতে ভালবাসতেন এবং তিনিও আমার একজন দাবা খেলার বন্ধুতে পরিণত হন। আমি নোটনকে দাবা খেলা শিখিয়েছিলাম। দিলীপ রায়ও নোটনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দাবা খেলতেন। বিখ্যাত ওস্তাদ হায়দার খান নোটনকে তিন-চার বছর ধরে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শেখান। নোটন তাঁর সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত গাইতেন এবং সাথে সাথে সেতারও বাজাতেন। তাঁর মাতাপিতা এই কুমারী কন্যাটিকে কতটা স্বাধীন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন উপরের বর্ণনাটি তারই মোটামুটি খসড়া।

৭

১৯২৮ সালে নজরুল যখন ঢাকায় আসেন প্রিন্সিপাল মৈত্র তাঁর গান শোনেন। একজন উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে তিনি বুঝতে পারেন যে, নজরুলের গানের একটা পৃথক

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য আছে। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের বিভিন্ন অলঙ্কার মীড়, গমক, বুঁদ, মূর্ছনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনিব্যঞ্জনা সেতারে এবং কণ্ঠসঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে নোটনকে সাহায্য করতে তিনি নিয়মিত নজরুলকে তাঁর বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানান। নোটন সেতার বাজাতেন অপূর্ব সুরের দ্যোতনা ফুটিয়ে,—এবং নজরুল অর্গানের রিডে সুনিপুণ আঙুলের মৃদু স্পর্শে সূক্ষ্মতম সুরের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে,—নোটনের পক্ষে সেতারে যা ফোটানো সম্ভব হত না—কণ্ঠ মিলিয়ে গান করতেন, আর মিস্টার ও মিসেস মৈত্র সেই অপূর্ব সঙ্গীতের শিল্পসুষমার মাধুর্য তন্ময়চিত্তে উপভোগ করতেন। নজরুল যতদিন ঢাকায় ছিলেন তিনি নিয়মিত প্রতিদিন প্রায় দুঘণ্টা করে মনোরম সঙ্গীত চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন। নজরুল জানতেন দিলীপকুমারও নোটনকে তাঁর নিজস্ব ঢঙে বাংলা গানের কায়দা-কানুন শিখিয়েছেন। ঐসব গান ছিল খানিকটা টপ্পার ধাঁচে লেখা বিশেষ ধরণের ঠুংরী—পিঝাকাটোর নোটের গিটকিরির কিংবা "প্যাসেজ" এর দ্রুত লয়সম্পন্ন। দিলীপকুমারকে ডিঙিয়ে যাওয়ার সংকল্প করেন নজরুল এবং সিদ্ধিও লাভ করেন। ভারতীয় সঙ্গীতের এই দুই সুপরিচিতসঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীতাঙ্গনে সঙ্গীত শিক্ষাদানের কৌশলে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতেন। বিশেষ করে শিক্ষার্থীটি যদি হতেন প্রিয়দর্শিনী। কুমারী মৈত্র নিঃসন্দেহে ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী এবং অভিজাত মহিলা। স্বভাবে তিনি ছিলেন খুবই শান্তশিষ্ট এবং যে-কোন ওয়ার্ডস্বার্থের চোখে কাব্যপ্রেরণা-দায়ী আনন্দের নির্ঝরিণী—Phantom of delight. নজরুল তাঁর গানগুলিকে যে গভীর আবেগে মূর্ত করে তুলতেন তারই পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর "চক্রবাক" কাব্যের 'গানের আড়াল' কবিতায়—

তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান—
এইটুকু শুধু রবে পরিচয়? আর সব অবসান?
অন্তরতলে অন্তরতর যে-ব্যথা লুকায়ে রয়,
গানের আড়ালে পাও নাই তার কোনদিন পরিচয়?
হয়তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয়ত কহিনি কথা,
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা?
হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারি প্রতিধ্বনি
কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রণরণি,—
উপকূলে বসে শুনেছ সে-সুর, বোঝ নাই তার মানে?
বেঁধেনি হৃদয়ে সে-সুর, দুলেছে দুল হয়ে শুধু কানে?
হায় ভেবে নাহি পাই—
যে-চাঁদ জাগালো সাগরে জোয়ার, সেই চাঁদই শোনে নাই
সাগরের সেই ফুলে ফুলে কাঁদা কূলে কূলে নিশিদিন?
সুরের আড়ালে মূর্ছনা কাঁদে, শোনে নাই তাহা বীণ?

www.pathagar.com

৮

কিন্তু নোটনের কাছ থেকে কোন রকম সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নি। তাঁর মুখের ভাবে স্বীকৃতির বিন্দুমাত্র চিহ্ন ফুটে ওঠেনি কখনো। যেন দা ভিঞ্চির মোনালিসার মত তিনি ছিলেন সকল ধরা-ছোঁয়ার বাইরের এক মূর্তিমতী রহস্য। কারও কারও হয়ত মনে হতে পারে উল্লিখিত কবিতাটি প্রতিভা সোম ওরফে রানুকে উপলক্ষ করে লেখা; কিন্তু আমার আদৌ-সন্দেহ নেই যে কবি তাঁর কাব্যপ্রেরণাদাত্রীর পরিচয়টিকে যথাসাধ্য গোপন করার চেষ্টা করেছেন। কেবল নোটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতার জন্য নির্বাক আবেদনের যতটা প্রয়োজন ছিল অন্যের বেলায় ততটা ছিল না। কেননা অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিশতে কবির স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশী।

রানুর সঙ্গে পরিচয়ের ভূমিকা-স্বরূপ শুধু এইটুকু বলতে পারি ঃ রেনুকা সেন নাম্নী টিকাটুলির এক কুমারীর সঙ্গীতশিক্ষার ভার নিয়েছিলেন দিলীপ রায়, গ্রামোফোন রেকর্ডে অতুলপ্রসাদ সেন লিখিত 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' গানটি গেয়ে তখন রেণুকা দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তিনি দিলীপের শিক্ষকতার গুণে এই দুর্লভ খ্যাতিলাভ করেন। এই সময় 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক রসিক সজনীকান্ত দাস দিলীপ ও রেণুকার সম্বন্ধের বিকৃত রূপ দান করে দিলীপের নাম দিলেন "কানুরে"। নজরুল তাঁর শিষ্যা রানুকে দিয়ে রেণুকার চেয়েও সুন্দরভাবে তাঁর স্বরচিত গান রেকর্ড করবার সংকল্প করেন। কারণ এমনিতেই রানুর কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত সুরেলা, চড়া পর্দাতেও তাঁর গান খুবই মিষ্টি শোনাত। রানুর বাবা, মা, অধ্যক্ষ সুরেন মৈত্র, প্রফেসর সত্যেন বোস আমাদের বাসায় প্রায় আসা যাওয়া করতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য প্রফেসর সত্যেন বোস কেবল একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন না, একজন সুদক্ষ বেহালাবাদকও ছিলেন। যা হোক, গল্পে ফিরে আসা যাক, নজরুলের সঙ্গীতভাণ্ডারে সুরের রাগরাগিণীর যত গভীর সূক্ষ্ম কলা-কৌশল ছিল রানুর কণ্ঠে তা তুলে দিতে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। এই উপযুক্ত শিক্ষার্থিনীটি তাঁর সকল বিখ্যাত গানকে সে সময় আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে রানুর কণ্ঠে নিম্নলিখিত গজলটি (মিশ্র ভৈরবী ও আশাবরী) অপূর্ব দ্যোতনায় রূপলাভ করত :

কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে কুসুমবাগের গুল্‌বদনে ॥
*　　*　　*　　*
সহসা জাগি আধেক রাতে শুনি সে বাঁশী বাজে হিয়াতে।
বাহু-সিথানে কেন কে জানে কাঁদে গো পিয়া বাঁশীর সনে ॥
বৃথাই গাঁথি কথার মালা লুকাস কবি বুকের জ্বালা।
কাঁদে নিরালা বনশীওয়ালা তোরি উতালা বিরহী মনে ॥

তাঁর কণ্ঠে পিলুতে (কাহার্বা দাদরা) গাওয়া আরেকটি নজরুল-গীতি উল্লেখযোগ্য :

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা,
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা ॥

www.pathagar.com

আগে মন করলে চুরি মর্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা ॥
চকোরী দেখলে চাঁদে দূর হতে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে তেমনি জলে চলে বলাকা ॥
বকুলের তলায় দোদুল কাজলা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী চরণ ভারি কোমর বাঁকা ॥
তরুরা রিক্ত পাতা আসলো লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলের গলে ঝরেছে বলে ভরেছে ফলে বিটপী-শাখা ॥
ডালে তোর হান্‌লে আঘাত দিস রে কবি ফুল-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফুল-পতাকা ॥

৯

এমন অবস্থায় 'শনিবারের চিঠি'র রসিক সম্পাদক সজনীকান্ত কেমন করে আর নীরব থাকেন ? এই যে দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই—গভীর মনোযোগের সঙ্গে নজরুল প্রতিদিন রানুকে সঙ্গীতের পাঠ দিয়ে চলেছেন, এতে সজনীর মত ব্যক্তির পক্ষে স্থির থাকা কেমন করে সম্ভবপর ? একি দিলীপ-রেণুকার সম্পর্কের চেয়ে আরও গায়ে জ্বালা ধরানোর মত মারাত্মক ব্যাপার নয় ? এমনি জল্পনা-কল্পনায় উত্তেজিত হয়ে নজরুলকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি উপযুক্ত রকমের একটি প্যারোডি লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন। যে-গানটির প্যারোডি লেখা হয় উপরে তার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—"কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে"। সজনীকান্তের প্যারোডিটি এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কিন্তু প্যারোডিটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিণতির ফল শীগগির পাওয়া গেল।

একদিন রাত্রি ১১টা পর্যন্ত আমাদের অতিথি নজরুল ইসলামের জন্য আমরা বর্ধমান হাউসে অপেক্ষা করছিলাম। আরও আধঘণ্টা খানেক পর আমরা সিড়িতে দ্রুত মনুষ্য পদধ্বনি শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম নজরুল ইসলাম তাঁর ঘরে ঢুকছেন—হাতে তাঁর একটি নতুন লাঠি, গায়ের কুর্তায় রক্তের দাগ এবং শরীরে লাঠির আঘাতের চিহ্ন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর এবং কোনরকমে ক্ষতস্থানে পট্টি আদি লাগানোর পর তার কাছ থেকে নিম্নোক্ত ঘটনা শোনা গেল :

সোম মশায়ের বাড়ী থেকে আমি কেবল বেরিয়ে এসে পথে নেমেছি এমন সময় ৭/৮ জনের একটি যুবকের দল ছড়ি ও লাঠি নিয়ে হঠাৎ আমাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করলো। প্রথমটা আমি হকচকিয়ে গেলাম কিন্তু পর মুহূর্তেই একজনের হাত থেকে এই বেতের ছড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে কেমন করে আঘাত ফিরিয়ে দিতে হয় তা একটু তাদের বুঝিয়ে দিলাম। আমার কাছাকাছি যে দুতিন জন ছিল ঐ হায়দরী ঘায়ের দুচারটা খেয়ে সেখানেই ঘুরে পড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে এবং কাছের নবাবপুর স্ট্রীটের পাহারাদার পুলিশের আগমন ভয়ে তারা সব দ্রুত পালিয়ে গেল।

www.pathagar.com

ঘটনাটা ঘটেছিল বনগ্রাম লেনে। এই গলির উপরেই ছিল সোম মশায়ের বাড়ী। স্থানীয় হিন্দু-যুবকেরা সজনীকান্তের প্যারোডিটি সম্ভবতঃ পড়েছিল। এতে তাদের মনে সন্দেহ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। তারা একটা কেলেঙ্কারীর কথা আঁচ করে তার একটা বিহিত করার চেষ্টা করেছিল। রানু হিন্দুর মেয়ে আর নজরুল মুসলমানের ছেলে। সুতরাং তাদের হিন্দু-রক্ত এই সম্পর্কটিকে একেবারে সহ্য করতে পারছিল না। এ যেন ছিল তাদের পৌরুষের উপর আঘাত।

যাহোক ঐ গল্পের ঐখানেই শেষ। এর দুএকদিন পরে নজরুল আমাকে তাঁর সেই ঐতিহাসিক ছড়িটা উপহার দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। আট/ন বছর যাবৎ ছড়িটা আমার সঙ্গেই ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাঁচী থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত লোহার ডাগা নামক এক জায়গায় আমার ঢাকা কলেজের সহপাঠী রুক্মিণীর বাড়ীতে এক সাপ মারতে গিয়ে ছড়িটি ভেঙে যায়। ঘরের মেঝেতে শুয়ে আমরা দুই বন্ধু ঘুমাচ্ছিলাম এমন সময় সাপটি আমাদের দুজনের উপর দিয়ে চলে যায়। রুক্মিণী আমাকে জাগিয়ে দিয়েছিল; ঝক ঝকে মেঝের উপর শুয়ে থাকা সাপটিকে মারা আমার পক্ষে তেমন কঠিন হয় নি।

১০

যতদূর মনে পড়ে ১৯৮২ সালে নজরুলের দ্বিতীয়বার ঢাকা আগমনে কুমারী ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে পরিচয় নিয়ে একই ধরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। ফজিলাতুন্নেসা অসামান্য সুন্দরীও ছিলেন না অথবা বীণানিন্দিত মঞ্জুভাষিণীও ছিলেন না। ছিলেন অঙ্কের এম. এ. এবং একজন উঁচুদরের বাক্‌পটু মেয়ে। তিনি আমার বান্ধবী ছিলেন এবং আমার কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন যে কবি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ। আমাকে তিনি কবির কাছে তাঁর হাতের রেখা দেখাবার জন্যে অনুরোধ করেন। যথারীতি একদিন কবিকে নিয়ে হাসিনা মঞ্জিলের কাছে দেওয়ান বাজার রাস্তার উল্টোদিকে অবস্থিত ফজিলাতুন্নেসার গৃহে আমি উপনীত হই। প্রায় আধঘণ্টা ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কবি ফজিলাতুন্নেসার হাতের মস্তিষ্করেখা, জীবনরেখা, হৃদয়রেখা, সংলগ্ন ক্ষুদ্র রেখাসমূহ এবং সেইসঙ্গে ক্রস, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ সমন্বিত অন্যান্য মাউন্ট, শুক্র, শনি, রবি, বুধ, মঙ্গল ও চন্দ্রের অবস্থানগুলো নিরীক্ষণ করলেন; কিন্তু এগুলোর সম্বন্ধ-সূত্রের ফলাফল নির্ণয় করতে ব্যর্থ হলেন। তিনি একজন জ্যোতিষীর মত সূর্য-চন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তারকার অবস্থান টুকে নিলেন এবং রাত্রিতে তিনি বিশদভাবে এটা নিয়ে পরীক্ষা করবেন বলে জানালেন। ঘণ্টাখানেক পরে আমরা ফিরে এলাম। রাত্রে খাবার পর প্রতিদিনকার অভ্যাসমত আমরা শুতে গেলাম। তখন রাত প্রায় এগারোটা হবে। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর হওয়ার আগে জেগে উঠে দেখলাম নজরুল নেই। বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলাম নজরুল কোথায় যেতে পারে। সকালে নাস্তার সময় তিনি ফিরে এলেন এবং তাঁর অমনভাবে অদৃশ্য হওয়ার কারণ বললেন :

www.pathagar.com

রাত্রে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন জ্যোতির্ময়ী নারী তাকে অনুসরণ করার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু জেগে উঠে সেই দেবীর পরিবর্তে একট অস্পষ্ট হলুদ আলোর রশ্মি দেখলাম। আলোটা আমাকে যেন ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে, আমার সামনে সামনে এগিয়ে চলছিল। আমি বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে কিছুটা অভিভূত হয়ে সেই আলোকরেখার অনুসরণ করছিলাম। মিস ফজিলাতুন্নেসার গৃহের কাছে না পৌঁছান পর্যন্ত আলোটা আমার সামনে চলছিল। তাঁর বাড়ীর কাছে পৌঁছতেই আলোটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি দেখলাম একটি ঘরের মধ্যে তখনও একটি মোমের বাতি জ্বলছে। রাস্তার ধারের জানালার কাছে সম্ভবতঃ পথিকের পায়ের শব্দ শুনে গৃহকর্ত্রী এগিয়ে এসে ঘরের প্রবেশ-দরোজা খুলে দিলেন এবং মিস ফজিলাতুন্নেসার শয়ন-ঘরের দিকে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। ফজিলাতুন্নেসা তাঁর ঘরের দরোজা খুলে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। কুমারী নেসা তাঁর শয্যার উপর গিয়ে বসলেন আর আমি তাঁর সামনে একটি চেয়ারে বসে তাঁর কাছে প্রেম যাচনা করলাম; তিনি দৃঢ়ভাবে আমার প্রণয় নিবেদন অগ্রাহ্য করলেন।

এই হচ্ছে সামগ্রিক ঘটনা—একে মানসচক্ষে নিয়ে আসা কিংবা এর রহস্যোদ্‌ঘাটন করা অত্যন্ত কঠিন। সূর্য ওঠার পর কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : ঐ ঘটনার পর নিরতিশয় ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ি; তাই ভোর বেলা রমনা লেকের ধারে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিলাম।

এটা অবশ্য একটা যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। কেননা নজরুল রমনার লেক ভালবাসতেন এবং লেকের ধারে সাপের আস্তানা আছে জেনেও সেখানে ভ্রমণ করতে যাওয়া তাঁর পক্ষে আদৌ অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আরও একটি বিস্ময়ের ব্যাপার তখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঐদিন দুপুরে লক্ষ করলাম ফজিলতের গলার লম্বা মটর-মালার হারটা ছিঁড়ে দুখান হয়ে গিয়েছে। পরে সেটা সোনারুর দোকান থেকে সারিয়ে আনতে হয়েছিল। অত্যন্ত কাছ থেকে জোরাজুরি ছাড়া এমন একটা কাণ্ড কেমন করে ঘটতে পারে আমার পক্ষে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। নজরুল ইসলাম আমার কাছে ও ফজিলাতুন্নেসার কাছে যেসব দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন তা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় এমন অঘটন কিছু ঘটেছিল যাতে ফজিলতের হৃদয় তিনি জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ঐসব চিঠিপত্র নজরুলের হৃদয়ের গভীর হাহাকার ব্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের সত্যতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এক্ষেত্রে নোটনের ব্যাপারে যেমনটি ঘটেছিল ফজিলতের ব্যাপারেও ঠিক তাই-ই ঘটেছিল।

১১

কুমারী ফজিলাতুন্নেসার বিলাত গমন উপলক্ষে নজরুল 'বর্ষা-বিদায়' নামক একটি কবিতা লেখেন। তাঁর বিখ্যাত প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। কিন্তু কবিতাটি এমন নৈর্ব্যক্তিকভাবে লেখা যে অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে এর ব্যঙ্গার্থ কিংবা রূপকের রহস্যভেদ করা কঠিন। তাঁরা শুধু দেখবেন প্রকৃতি কিভাবে বর্ষা ঋতু থেকে শীত ঋতুতে রূপ পরিবর্তন করছে। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে তিনি তাঁর অনুভূতি

www.pathagar.com

ও অভিজ্ঞতাকে চেতনাশ্রিত কল্পনায় এমনভাবে জারিত করে নিয়েছিলেন যা থেকে তিনি মুক্তোর মত এমন কতকগুলো কবিতা রচনা করেন যা তাঁর অনুভূতিকে বিশ্বচারিত্র্য দান করেছে। অসাধারণ ক্ষমতাবান কবি ছাড়া বক্তব্য বিষয়কে এমন অনিন্দ্যসুন্দর রূপকের আড়ালে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি কবিতাটির নির্বাচিত কয়েকটি পংক্তি এখানে তুলে দিলাম :

ওগো বাদলের পরী!
যাবে কোন দূরে ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরী!
ওগো ও ক্ষণিকা পুব অভিসার ফুরাল কি আজি তব ?
পহিল ভাদরে পড়িয়াছে মনে কোন দেশ অভিনব ?
তোমার কপোল-পরশ না পেয়ে পাণ্ডুর কেয়া-রেণু,
তোমারে স্মরিয়া ভাদরের ভরা নদীতটে কাঁদে বেণু।
ওগো ও কাজল মেয়ে—
উদাস আকাশ ছল ছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে।
কাশফুল সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে
তোমার তরীর উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে।
ওগো ও জলের দেশের কন্যা! তব ও বিদায় পথে
কাননে কাননে কদম কেশর ঝরিছে প্রভাত হতে।
তুমি চলে যাবে দূরে—
ভাদরের নদী দু'কূল ছাপায়ে কাঁদে ছল ছল সুরে!
যাবে যবে দূর হিমগিরি শিরে, ওগো বাদলের পরী
ব্যথা করে বুক উঠিবে না কভু সেথা কাহাকেও স্মরি ?
সেথা নাই জল, কঠিন তুষার নির্মম শুভ্রতা,—
কে জানে কী ভালো বিধূর ব্যথা—না মধুর পবিত্রতা।
সেথা রবে তুমি ধেয়ানমগ্না তাপসিনী অচপল,
তোমার আশায় কাঁদিবে ধরায় তেমনি "ফটিক-জল"।

১২

বাদলের পরীর সঙ্গে আর একটি কবিতার যে অনেকখানি মিল আছে সে কথাটি আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এই কবিতাটিও ফজিলাতুন্নেসার বিলাত গমন উপলক্ষে রচিত। কবিতাটি এমনি :

জাগিলে "পারুল" কি গো "সাতভাই চম্পা" ডাকে।
উদিলে চন্দ্রলেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে!
চলিলে সাগর ঘুরে
অলকার মায়ার পুরে,
ফোটে ফুল নিত্য যেথায়

www.pathagar.com

জীবনের ফুল-শাখে ॥
আঁধারের বাতায়নে চাহে আজ লক্ষ তারা,
জাগিছে বন্দিনীরা টুটে ঐ বন্ধকারা!
থেকোনা স্বর্গে ভুলে—
এ পারের মর্ত্য কূলে
ভিড়ায়ো সোনার তরী
আবার এই নদীর বাঁকে ॥

এই কবিতাটিতে নজরুল তাঁর মনের ভাব গোপন করেন নি, ফজিলাতুন্নেসাকে ফিরে আসার জন্য সরাসরি আবেদন করেছেন। কিন্তু আরও একটি কবিতায় এবং 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক'-এর অনেকগুলি কবিতায় কবি তাঁর অন্তরের গভীর অনুভূতিকে বিভিন্ন অলঙ্কার ও রূপকের আড়ালে ব্যক্ত করেছেন। ফজিলতের প্রতি নজরুলের অনুভূতির তীব্রতা দু'তিন বছরের সময়-সীমায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। সমান্তরাল আর একটি স্তবকে লক্ষ করা যায় কবি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত প্রেমকে সুন্দরতর আর এক জগতে খুঁজে ফিরছেন যেখানে প্রেমে কোন নৈরাশ্য নেই, কোন বেদনা নেই। প্রেমের জন্যে নারীর কাছ থেকে তিনি চেয়েছিলেন পূর্ণ আত্মসমর্পণ কিন্তু কোথাও তিনি তা পান নি। ফলে ধীরে ধীরে তিনি খোদা-প্রেমের দিকে ঝুঁকে পড়লেন :

পরজনমে দেখা হবে প্রিয়।
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও ॥
এ জনমে যাহা বলা হল না,
আমি বলিব না, তুমিও বলো না।
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,
যদি আসি ফিরে, বেদনা দিও ॥

হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়,
রাতের কুসুম প্রাতে ঝরে যায়,
ভালো না বাসিতে হৃদয় শুকায়,
বিষ-জ্বালা ভরা হেথা অমিয় ॥

হেথা হিয়া ওঠে বিরহে আকুলি',
মিলনে হারাই দু'দিনেতে ভুলি',
হৃদয়ে যথায় প্রেম না শুকায়—
সেই অমরায় মোরে স্মরিও ॥

স্পষ্টতঃই, প্রেমের এই বিশ্বাসহীনতা ও ক্ষণস্থায়িত্বের অভিজ্ঞতা কবিকে পার্থিব প্রেমের প্রতি নিরাসক্ত করে তুলেছিল। তাই তিনি অমর এক প্রেমের জগতে আত্মার শান্তি খুঁজে ফিরছিলেন; যেখানে প্রেম কখনও বিচ্ছেদের জ্বালায় কলুষিত হয়ে ওঠে না—শাশ্বত মিলনের আনন্দই যেখানে সদা প্রবাহিত।

www.pathagar.com

১৩

১৯৩০ সালে কবিকে বাঙালি জাতির তরফ থেকে কলকাতা এলবার্ট হলে জাতীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সভায় বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতিত্ব করেন। অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন ব্যারিস্টার এস. ওয়াজেদ আলী এবং কনিষ্ঠতম রাজনৈতিক নেতা সুভাষচন্দ্র বোস, যিনি আই. সি. এস. হলেও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন নি; প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন। আমি দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলাম।

১৯৩১ সালের দিকে নজরুল সিনেমা ও থিয়েটার জগতে প্রবেশ করেন। আমার মনে আছে ঐ সময় যখনই আমি কলকাতায় গিয়েছি তখনই নজরুল আমার ও আমার স্ত্রীর জন্য টিকেটের ব্যবস্থা করতেন। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও অভিনয়ে অংশ নিতেন—যেমন 'ধূপছায়া' ছায়াছবিতে তিনি বিষ্ণুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

এই সময় ঠুংরী সম্রাট ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খান সাহেবের মৃত্যু হলে গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁকে হেড কম্পোজার ও সঙ্গীত-শিল্পীদের ট্রেনার হিসাবে নিযুক্ত করেন। অনেক দফা নজরুল ইসলাম আমাকে সঙ্গে নিয়ে দমদম রেকর্ডিং অফিসে গিয়েছেন। সেখানে আমি কবিকে আঙুরবালা, ইন্দুবালা, আশ্চর্যময়ী, বেদানা দাসী, কমলা ঝরিয়া, কাননবালা (পরবর্তীকালে কাননদেবী), কানা কেষ্ট (কৃষ্ণচন্দ্র দে), কে. মল্লিক (মুহম্মদ কাসেম)-এর মত প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের শিল্পীদেরকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে এবং তদারক করতে দেখেছি। রেকর্ডিং-এর জন্য শিল্পীদের নিয়ে প্রাথমিক রিহার্সাল তিনি কখনো তাঁর নিজের বাসায় অথবা ১০৬ আপার চিৎপুর রোডে সমাধা করতেন।

এর থেকে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন জাগে "নজরুল কি এত উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন যে ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খানের স্থলে ঐসব নামজাদা অভিজ্ঞ শিল্পীদের সঙ্গীত শিক্ষাদানের তিনি উপযুক্ত ?" উত্তর হল : নজরুলের সঙ্গীতের মান প্রশ্নাতীতভাবে সুন্দর এবং যখন তিনি করাচীতে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে সৈনিকতা করছেন তখন একজন সুদক্ষ বংশীবাদক বলে তিনি খ্যাত ছিলেন। ঐ করাচীর পল্টন জীবনে তিনি একজন পশ্চিমা ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখেছিলেন। আমি তাঁকে ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছেও সঙ্গীতের পাঠ নিতে দেখেছি। মঞ্জু সাহেব মুর্শিদাবাদের অধিবাসী ছিলেন, পরবর্তীকালে কলকাতার এণ্টালীতে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। নজরুল তখন পানবাগান লেনে ঐ একই জায়গায় বাস করতেন। এরপরে তিনি মেটিয়া বুরুজের ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খান এবং পরে মহান ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবী ফৈয়াজ খাঁ তখন কলকাতায় এসে বাস করছিলেন।

ঢাকাতে ১৯২৭/২৮-এর দিকে একবার নজরুলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঢাকার উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের ওস্তাদদের (যাদের মধ্যে খেয়াল, ঠুংরী ও টপ্পার অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ আমার ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরীও ছিলেন) সঙ্গে তুলনা করলে সঙ্গীত জগতে আপনার স্থান কোথায় হতে পারে বলে আপনি মনে করেন। নজরুল তখন এই বলে উত্তর দেন : আপনার ওস্তাদজী সঙ্গীতে বি. এ. এবং আমি সম্ভবতঃ একজন ম্যাট্রিক কিংবা বড় জোর আই. এ.। অন্যান্য ওস্তাদদের মত মোহম্মদ হোসেনের তাল, লয়

www.pathagar.com

এবং বিশুদ্ধ রাগের উপর পুরোপুরি দখল আছে। অতি সহজে বাদী সম্বাদী থেকে ঔড়ব, খাড়ব এবং সম্পূর্ণ রাগাদি প্রদর্শনে তানের আরোহণ ও অবরোহণে তাঁর ঐতিহ্যগত স্বাভাবিক ক্ষমতা তর্কাতীতভাবে সুন্দর, কিন্তু আমার এমন কতকগুলো মৌলিকতা আছে যা সঙ্গীতশাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রীপ্রাপ্ত এইসব ওস্তাদেরা তার ধারে কাছেও কোনদিন পৌছতে পারবেন না। এইসব ওস্তাদেরা গানের অর্থ, ভাব এবং আবেদনকে শ্রদ্ধা করেন না এবং সে জন্যেই প্রয়োজনবোধে যেখানে বিশেষস্থানে নাটকীয় শৈল্পিক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন হয়, আন্তরিকতার সংযোগে সঙ্গীতকে মর্মস্পর্শী করার দরকার হয়, সেখানে তাঁরা ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তাঁরা মনে করেন রাগের কাঠামোর বাইরে শিল্পীর কোন স্বাধীনতা নেই। কিন্তু আমি এমন কিছু স্বাধীনতার প্রশ্রয় দিই যাতে গানটি আরও জীবন্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। গানের অন্তরানুভূতি শারীরিক রূপলাভ করে।

আমার মনে হয় কবির এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে সত্য এবং যথার্থ ঐ একই প্রশ্ন আমি কবির ব্যাপারে আমার ওস্তাদজীকে (যাঁর কাছে আমি দুবছর ধরে কণ্ঠসঙ্গীত শিখেছিলাম এবং পরে যিনি আমাকে তিনবছর ধরে সেতারের গোপন রহস্য শিখবার পরামর্শ দিয়েছিলেন) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন : কবি নজরুলের কণ্ঠ তেমন উচ্চাঙ্গের কিংবা সুরেলা নয়। তবে তাঁর কণ্ঠ বেশ জোরালো পৌরুষময় (বুলন্দ)। তাছাড়া তাঁর গলায় অপ্রত্যাশিতভাবে এমন কতকগুলো কাজ ফুটে উঠতে দেখা যায় যার সঙ্গে আমার আদৌ পরিচয় নেই। যদিও সঙ্গীতের মহত্তম শিল্পীরা এই ধরণের কলাকৌশল কখনও কখনও দেখিয়ে থাকেন; তবু তাঁরা আবার মূল রাগের কাঠামোর মধ্যে ফিরে আসেন। বলাবাহুল্য রাগের এই রস কিংবা আত্মার উপর অসাধারণ দখল ছাড়া এমনটি করা কারও পক্ষে সম্ভব হয় না। মোটকথা তিনি তাঁর পথে চলেন আর আমরা চলি আমাদের পথে।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের ওস্তাদেরা সাধারণতঃ এইভাবে কাউকে স্বীকৃতি দেন না। সুতরাং আমার ওস্তাদ যে এই ঔদার্য দেখালেন সেজন্য তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। এই প্রসঙ্গে বলা অকারণ হবে না মোহিনী সেনগুপ্তা নাম্নী রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নজরুল-সঙ্গীতের স্বরলিপিকার একজন মহিলা নজরুলের পরম হিতৈষিণী ছিলেন এবং তিনিই প্রথমে নজরুলকে ধ্রুপদ গানে কিভাবে অস্থায়ী অন্তরা আভোগ ও সঞ্চারী বিন্যস্ত করতে হয় তারই শিক্ষা গ্রহণে মনোনিবেশ করতে এবং ঐগুলো পৃথক পৃথক সঙ্গীতের পৃথক পৃথক স্থান এবং পংক্তিতে কিভাবে সন্নিবেশিত হবে এবং "ন্যাসস্বর" ও "গ্রহস্বর"-এর ভূমিকা গানে কতটা সে-বিষয়ে পরামর্শ ও জ্ঞানদান করেন। সঙ্গীতের এই আঙ্গিকগত কলা-কৌশল শিখবার পরামর্শ নজরুলকে অনুপ্রণিত করে এবং গভীরভাবে সেগুলো অনুশীলন ও শিক্ষালাভে কৌতূহলী করে তোলে। ফলে তিনি বিভিন্ন ওস্তাদদের কাছে পরবর্তীকালে এগুলি শিখবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেন। যদিও একথা সত্যি যে নজরুল অবিকলভাবে একাধারে সঙ্গীতের কোন বিশেষ ধারা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে চর্চা করেন নি; কিন্তু সঙ্গীতের সূত্রগুলো তাঁর অসাধারণ প্রতিভার আগুনে তিনি শোষণ করে নিতে পারতেন এবং অসঙ্গতিপূর্ণ খণ্ডগুলিকে শিল্পীসুলভ আশ্চর্য ক্ষমতাবলে জোড়া লাগাতে সক্ষম হতেন। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিনয় করে তিনি নিজেকে

www.pathagar.com

সঙ্গীত-জগতে ম্যাট্রিক ও আই. এ.-র স্তরে পড়ি বললেও পরবর্তীকালে আরও অধিক শিক্ষা, সাধনা ও অধ্যাবসায়ের দ্বারা এবং তাঁর জন্মসূত্রে অর্জিত সঙ্গীত-প্রতিভার এম. এ. ডিগ্রীর বদৌলতে তিনি তাঁর সময়কার সকল গুণী, বি. এ. পাশ করা, কণ্ঠসঙ্গীতের ওস্তাদদের সমকক্ষতা অর্জন করেছিলেন। দমদম এবং চিৎপুর রোডের রিহার্সাল-রুমে শিল্পীরা যখন কোন গান গাইতেন কবি তখন সেই গান অনুসরণ করে মৃদুভার হাতের কাছে যেটাই থাকতো, হারমোনিয়াম কিংবা অর্গান, সেটাই বাজাতেন এবং শিল্পীদের গাওয়ার মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটিবিচ্যুতি হলে গানের ভাব, ভাষা ও সুর অনুযায়ী গানের শিল্পরূপটি যথাযথ না ফুটলে তিনি হাত তুলে শিল্পীদের থামবার ইশারা করতেন এবং স্বকণ্ঠে গেয়ে সেই স্থানটা সংশোধন করে দিতেন। এবং যেমনটা স্বাভাবিক, তার ব্যাখ্যা এতটাই বিশুদ্ধ হতো যে পণ্ডিতেরা সেটাই অনুমোদন করতেন এবং তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করে গাইতেন। এইভাবে তাঁর গানকে যাঁরা কণ্ঠে তুলতেন তাঁরা বারংবার একটি গানকে সার্থকভাবে রূপায়িত না করা পর্যন্ত গেয়ে চলতেন। অবশ্য, বেদানা দাসী, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া এবং কানন দেবী নজরুলের গায়কীটা যত তাড়াতাড়ি ধরতে পারতেন আঙুরবালা, আশ্চর্যময়ী, কানা কেষ্ট, কে. মল্লিক, আব্বাসউদ্দীন এবং অন্যান্যদের পক্ষে তা ধরতে একটু দেরী হত। কেননা, আপন-আপন গাইবার ভঙ্গী ও একঘেয়ে অভ্যাস তাঁদের পক্ষে ত্যাগ করা কঠিন হত বলে নজরুলের যথাযথ প্রকাশভঙ্গিটা তাঁদের পক্ষে কব্জায় আনা সহজ হত না।

১৪

আব্বাসউদ্দীন, প্রতিভা সোম এবং আরও অনেক নবীন প্রতিশ্রুতিশীল কণ্ঠশিল্পী সঙ্গীতের পাঠ নিতে নজরুলের বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। নজরুল এজন্য মোটেই বিরক্ত হতেন না, তাঁদের সবাইকে বিনা পারিশ্রমিকে সাহায্য করতেন। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, নজরুল তাঁর কতকগুলো বাছাই করা গানের গ্রামোফোন ও জেনোফোনের রেকর্ড (এক ডজনের বেশী) কুমারী ফজিলাতুন্নেসাকে উপহার দিয়েছিলেন; আমাকেও হিজ মাস্টার্স ভয়েসের খান পাঁচেক রেকর্ড দিয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য যে-গতিতে নজরুল একটি নতুন গান লিখে শেষ করতেন সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ব্যাপারটা এমনি বিস্ময়কর। হারমোনিয়াম বাজিয়ে প্রথমে তিনি বিষয় ছাড়াই একটি রাগের সম্পূর্ণ কাঠামোটা তৈরি করে নিতেন। তারপর যে যে শব্দ ঐ সুরের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাপ খায় তেমনি বাছাই করা উত্তম সুরের সাহায্যে তিনি গানটি রচনা করতেন। নজরুল হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে গানটি গাইতে থাকতেন আর গ্রামোফোন কোম্পানীর স্ক্রিপ্ট লেখকেরা সেটা দ্রুতগতিতে লিখে নিতেন, অথবা কবি নিজেই গাইতেন এবং লিখতেন। এইভাবে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একটি রাগের কাঠামোর প্রতিটি অঙ্গের আকার অনুযায়ী সুন্দর সুন্দর পংক্তিগুলি রূপায়িত হয়ে উঠতো একটি সম্পূর্ণ গানের শরীরে। ১৪ নং ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটে অবস্থিত "সওগাত" অফিসে কবি অনেক সময় প্রতিশ্রুত সময়ে তাঁর লেখা লিখতে না পারলে সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন ঘরে আটকে লেখা আদায় করতেন। দেখা যেত আধঘণ্টা

www.pathagar.com

একঘণ্টার মধ্যে লেখক অতি মনোরম আবেগসমৃদ্ধ প্রবন্ধ কিংবা কবিতা লিখে দিয়েছেন।

তরুণ অথবা তরুণী লেখক-লেখিকাদের নজরুল সাহিত্যকর্মের জন্য উৎসাহ জোগাতেন। কখনও তাঁদের লেখা প্রয়োজনমত সংশোধন করে দিতেন অথবা কাউকে লক্ষ্য করে ছোট্ট একটি কবিতা লিখে তাঁকে প্রেরণা যোগাতেন। এইসব তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যাঁদের নাম সহজে মনে আসে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন : হাবিবুল্লাহ্ বাহার, শামসুন্নাহার, সুফিয়া এন. হোসেন (পরবর্তীকালে সুফিয়া কামাল), দক্ষিণ-কলকাতার মেটিয়াবুরুজের জাহানারা বেগম, ফরিদপুরের সুফী মোতাহার হোসেন, কবি আবদুল কাদির (তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র)। হাবিবুল্লাহ্ বাহার ছিলেন নজরুলের বন্ধু এবং ইডেনগার্ডেন ও গড়ের মাঠের ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা দেখার সঙ্গী। সুফিয়া কামাল ও শামসুন্নাহার আমাদের বিখ্যাত লেখিকাদ্বয়; জাহানারা বেগম ছিলেন 'বর্ষবাণী' নামক বার্ষিক সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদিকা; সুফী মোতাহার হোসেন হলেন অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও নজরুল ইসলাম প্রশংসিত বিখ্যাত সনেটকার। আবদুল কাদির 'দিলরুবা' ও 'উত্তর বসন্ত' কাব্যযুগলের কবি এবং 'নজরুল রচনাবলী' ও 'নজরুল রচনা-সম্ভারে'র বিখ্যাত সম্পাদক। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা নজরুল-নিরাময় সমিতির উৎসাহী সদস্য কবি আবদুল কাদির নজরুল সাহায্য তহবিল থেকে কিছু টাকা নিয়ে কলকাতায় কবিকে দেখতে যান নজরুলের চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য করতে। ফিরে এসে তিনি জানিয়েছিলেন নজরুল নাকি কয়েকবার 'মোতাহার' 'মোতাহার' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন। যদিও তখন নজরুল সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রষ্ট। তবু তাঁর অবচেতন মনে হয়ত আজও কয়েকজন বন্ধুর নাম সাঁতরিয়ে ফেরে।

১৫

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মধ্যকার সম্পর্কটি ঠিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ছিল না, ছিল কিছুটা গুরু-শিষ্যের মত এবং তা শুধু কাব্য ও সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয় সঙ্গীত ও সুরের রাজ্যেও। রবীন্দ্রনাথ যে নজরুলকে কতটা স্নেহের চোখে দেখতেন তা "ধূমকেতু"কে আশীর্বাদ করে লেখা তাঁর কবিতা পংক্তিসমূহে সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট :

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু!
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ-চেতন।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস-কে যেমন দেখেছি

১৯২১ সালে নওয়াব স্যার সলিমউল্লাহ্ বাহাদুরের উদ্যোগে 'ঢাকা কলেজ'-কে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত করা হয়। সেইসময় ঢাকা কলেজের বি.এ., বি.এসসি. ও এম. এ., এম. এসসি. ক্লাসের তৎকালীন সুদক্ষ অধ্যাপকদের সহিত দেশ-বিদেশ থেকে আরও বহু সংখ্যক সুযোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত করে বাংলার (তথা ভারতবর্ষের) এই প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের অনুকরণে নিরীক্ষামূলক আদর্শ সর্ব-বিদ্যালয়রূপেই গড়ে তোলা হয়। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ থেকে যে বিদ্বৎমণ্ডলীর সমাগম হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন পদার্থবিদ্যাবিদ্ সত্যেন্দ্রনাথ বোস, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য, রাসায়নিক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ঐতিহাসিক এ. এফ. রহমান, সংস্কৃতজ্ঞ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলাবিদ্ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃতজ্ঞ হীরালাল দে, ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগো, সংস্কৃত ও পালিবিদ্ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পদার্থবিদ্যাবিদ্ রাধাকৃষ্ণান, ব্যবসা-বাণিজ্যবিদ্ পনন্দিকর, উদ্ভিদবিজ্ঞানী মাহেশ্বরী, গণিতজ্ঞ বিজয়রাঘবন প্রমুখ। আর ঢাকা কলেজেই ছিলেন গণিতজ্ঞ ভূপতিমোহন সেন ও বঙ্কিমদাস ব্যানার্জি, ইতিহাসে র‍্যামস বোথাম ও অশ্বিনী মুখার্জি, ইংরেজীতে সত্যেন ভদ্র, বাংলায় অক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত, পদার্থবিদ্যায় ডব্লিউ. এ. জেঙ্কিন্‌স, ইতিহাসে পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (?), সংস্কৃতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ইংরেজীতে আর্চিবোল্ড, বটম্‌লী ও টার্নার, দর্শনে ল্যাংলী, রাষ্ট্রনীতিতে টি. টি. উইলিয়ম্‌স প্রমুখ। অবশ্য বাংলাদেশও তখন ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল।

তখন আমি ছিলাম পদার্থবিদ্যার অধ্যক্ষ জেঙ্কিন্‌স সাহেবের প্রিয় ছাত্র এবং নবনিযুক্ত এসিসটাণ্ট লেকচারার। কিছুদিন পরে ১৯২১ সালেই জেঙ্কিন্‌স সাহেব কলকাতায় এডুকেশন ডাইরেক্টরেটে চলে যাওয়াতে রীডার সত্যেনবাবু পদার্থবিদ্যা বিভাগের কর্তৃত্ব লাভ করেন। জেঙ্কিন্‌স সাহেব সত্যেনবাবুকে বিশেষ করে বলে গিয়েছিলেন, আমার যাতে বিদ্যার উন্নতি হয় সে বিষয়ে যত্ন করতে। আমাকে বলে গিয়েছিলেন,—"সত্যেনবাবু অতিশয় বিদ্বান লোক; যেকোনও বিষয় বুঝতে না পারলেই ওঁর কাছ থেকে বুঝে নেবে।" আমি এ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও আলোকবিজ্ঞানে আমার অনুরক্তি ছিল। Jeans-এর বৃহৎ Electricity পুস্তকের সমুদয় বিষয়বস্তু (উদাহরণ ও প্রশ্নমালা-সহ) তাঁর কাছ থেকে ভাল করে বুঝে নিয়েছিলাম। এই বইয়ের প্রায় সাড়ে তিনশ' অঙ্কের মধ্যে প্রায় ১০০টা তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলাম। তিনি তাতে কখনও বিরক্ত হননি। তাঁর কোনও ছাত্র তাঁকে এত প্রশ্ন করে নাই। সুতরাং আমি দাবী করতে পারি, আমি তাঁর সবচেয়ে বড় ছাত্র—অর্থাৎ শুধু 'ছাত্র' নই, 'ছাত্রতর'ও নই, একেবারে 'ছাত্রতম' (!)। একদিনের কথা বলি। অতি প্রত্যূষ, তখনও সূর্যোদয় হয়নি। আমি খাতাপত্র-বই নিয়ে তাঁর পদার্থবিদ্যার বসবার

www.pathagar.com

ঘরে গিয়ে হাজির। দেখলাম তিনি আগেই এসে আপনমনে অঙ্ক কষছেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন এত সকালে কেন এসেছি। আমি জানালাম, "দুইদিন ধরে একটা অঙ্ক মিলাতে পারছিনে, তাই সকালেই আসলাম।" তিনি অঙ্কটা দেখেই বললেন, "হাঁ এটাত ম্যাক্সওয়েল কষেছেন, mutual induction-এর (পরস্পর প্রবর্তন সংক্রান্ত) অঙ্ক।" এই বলে অঙ্কটা কষতে আরম্ভ করলেন, কিছুতেই মেলেনা। এইভাবে সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল গেল, অঙ্ক হয় না। ওখানে বসেই আমাদের সকালের নাস্তা, দুপুরের খানা, বিকালের টিফিন খাওয়া হল। অবশ্য ঐদিনে তাঁর ও আমার ক্লাস অন্য শিক্ষক দিয়ে করানো হল। বিকালে বললেন, "বেয়ারারা উশ্‌খুশ্‌ করে, ওরা বাড়ী যাবে। চল আমরা তোমাদের টিচার্স কমনরুমে গিয়ে বসি।" সেখানে বসে সাঁঝের চা হল, দুপুররাত্রের খানাও হল, কিন্তু অঙ্কটা হল না। রাত ১২টার ঘণ্টা বেজে গেল, তখন তিনি বললেন, "চল, আমার বাড়ীতে চল, সেখানে ম্যাক্সওয়েল-এর বই আছে।" গেলাম তাঁর বাড়ীতে। তিনি দ্রুতপদে দোতলা থেকে বই নিয়ে এলেন। দেখা গেল, প্রমাণটার মধ্যে রয়েছে একটা পরীক্ষালব্ধ তথ্য। সে কথাটা আমাদের কারোরই মনে হয়নি; তাই অসম্পূর্ণ তথ্য নিয়ে বৃথাই চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর আমাকে উপদেশ দিলেন,—"দেখ কাজী, কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য বারংবার চেষ্টা করবে, ধৈর্য হারিয়ো না। অনেকসময় অকস্মাৎ একটা সমাধানের সংকেত মনে পড়ে যায়; তখন সমাধানটা সহজ হয়। এটাই বোধ হয় 'inspiration'; নবী-পয়গম্বরদের inspiration-কেও হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দৈবযোগেই inspiration পাওয়া যায়।"

তাঁর ছাত্রদের পড়াবার পদ্ধতি ছিল : আগে পদার্থবিদ্যার প্রাসঙ্গিক গণিত কিছুটা পড়িয়ে নিয়ে পরে ছাত্রদের আসল পাঠ হুড়হুড় করে শেষ করিয়ে দেওয়া। একবার বি.এ., বি. এসসি. অনার্স ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার দুইমাস-আড়াইমাস বাকী থাকতে একদিন হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, "দেখ কাজী, আজকাল দেখছি ছেলেরা ঠিকমত ক্লাসে আসছে না, আমাকে দেখলে আরও দূর দিয়ে যায়। বোধহয় অধিকাংশ ছেলে গণিতের সম্মুখীন হতেই ডরায়। পরীক্ষার ত আর ১০/১২ সপ্তাহ বাকী আছে, কিন্তু ওদের আসল কোর্সটা আরম্ভই হয়নি। যাহোক তুমি এই সময়ের মধ্যে ওদের কোর্সটা শেষ করে পড়িয়ে দেও তো। আমি নোটিস দিয়ে দিচ্ছি। আমি জানি তুমি পারবে।" আমি বেশ পরিশ্রম করে ওদের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় শেষ করে পড়িয়ে দিয়েছিলাম।...আসল ব্যাপার এই—প্রফেসর বোস উচ্চমার্গের পাখী, তাঁর কাছে গণিতের সব বিষয়ই সমান সহজ। এ কারণে আমাদের মত সাধারণ লোকের কথা ওরা বুঝতে পারে, আর সবটা না বুঝলেও আরেকটু চেষ্টা করে বুঝে নেয়।...এ সম্পর্কে একটা কৌতুককর কথা মনে পড়ছে—আমার একটি ফুটবল-ক্রিকেট খেলুড়ে প্রিয় ছাত্র, দিগেন দাস, হঠাৎ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, "স্যার, একটা কথা বলবো স্যার?" "তা কেন বল্‌বিনে,বল্‌, কি বলতে চাস?" তখন সে বললো, "স্যার, আপনার আর শশাঙ্কবাবুর পড়ানো আমরা খুব পরিষ্কার বুঝতে পারি।" ভাবলাম, যাহোক আজ একটি ছাত্রের প্রশংসা পেলাম। কিন্তু তখনও ওর বক্তব্য শেষ হয়নি,—বাক্যের শেষার্ধ হল, "কিন্তু স্যার, সত্যেনবাবু এত সুন্দর পড়ান যে তা একটুও বুঝতে

www.pathagar.com

পারিনে।" তখনই গুমর ফাঁক হয়ে গেল। বুঝলাম, এ বক্তব্যের সারমর্ম হল—"আপনি আর শশাঙ্কবাবু কি কচু পড়ান। ওতো আমরা এমনিই বুঝতে পারি।" বুঝলাম, অনেক ছাত্র দেবদেবীর ভক্ত, সাধারণ মানুষের কথা তারা গ্রাহ্য করে না : তাতে রহস্য নেই। বুঝলাম, ওতো ঠিকই বলেছে,—আমরা ত ধর্ম ও সে সম্পর্কীয় অনেক উপদেশ, হিতকথা ও আখ্যান, বিনাবিচারেই মেনে নিয়ে থাকি। উচ্চমার্গের কথা স্বতন্ত্র, তা বুঝবার বা ভাববার দরকার হয় না। যাক, ওরা নিরীহ প্রাণী সুখে থাক।

সত্যেনবাবু তাঁর অনুষদের প্রত্যেকটি শিক্ষকের মন-মানসের কলকাঠি বুঝতে পারতেন এবং অনেকসময় তা পরীক্ষাও করে নিতেন। আমি একবার কেমন পরীক্ষায় পড়েছিলাম, বলছি। একবার এক পরীক্ষার প্রশ্নে কোনও অসতর্ক প্রশ্নকারক একটি প্রশ্নে অসম্পূর্ণ তথ্য থেকে সম্পূর্ণ উত্তর চেয়েছিলেন। আমি প্রশ্নটা নিয়ে ওঁর কাছে গিয়ে বলেছিলাম, "মডারেটরদের হাত ঘুরে এমন প্রশ্ন টিকলো কেমন করে?" তিনি অবশ্যই প্রশ্নটা দেখে ব্যাপার বুঝে ফেলেছিলেন। তবু আমাকে বুঝাতে লাগলেন, "না, প্রশ্ন ঠিকই আছে।" আর মোটা একখানা বই দেখিয়ে বললেন, "এই ত দেখ, এখানে এইরূপ প্রশ্ন আছে, পড়ে দেখ।" আমি বললাম, "স্যার! মোটা বই দেখে কি করব? তিনটে পরস্পর অনির্ভর ঋজু তথ্য, আর চারটে নির্ণেয় অজ্ঞাত রাশি। কোন অলিখিত শর্তও নেই। এর সমাধান কেমন করে হবে? আমি কিন্তু, এ প্রশ্নটা যারা চেষ্টা করে সময় নষ্ট করেছে তাদের প্রত্যেককেই পুরো নম্বর দেব।" তিনি একটু হেসে উত্তর দিলেন, "যাও তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।" তবু আমার কথাটা ঠিক আছে না বেঠিক হয়েছে, তার কোনও ইঙ্গিত দিলেন না। বুঝলাম, উনি মনে মনে খুশি হয়েছেন—আর আমাকে একটু বাজিয়ে নিলেন, খাঁটি না মেকি।

এরপর আর একদিন আমাদের পদার্থবিদ্যা অনুষদের ১০/১১ জন শিক্ষককে একসঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বাজিয়ে নিলেন। ওঁর কাছে একখানা উচ্চপর্যায়ের পাটিগণিত ছিল, অনেক কূট অঙ্কে ভরা! অঙ্কগুলো দেখতে খুব সহজ মনে হয়, কিন্তু করতে গেলে জ্যামিতি, বীজগণিত, স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বা কলন প্রণালীর জ্ঞানের আবশ্যক হয়। সেই বই থেকে আমাদের সবাইকে সাত-আটটা বাছা বাছা অঙ্ক করতে দিয়ে বললেন, "সাতদিন পরে যে যতটা পার এনে আমাকে দেখাবে।" আমি পরদিনই সবগুলো সমাধান করে তাঁকে দেখালাম। (অন্যেরা কে কয়টা করতে পারলো সেটা উল্লেখ করা শোভন হবে না।) যাহোক সত্যেনবাবু খুব খুশি হয়েছেন, বোঝা গেল। মন্তব্য করলেন, "তোমার ত ম্যাথেমেটিক্স-এ য়্যাক্যুমেন (প্রকৃষ্ট পারদর্শিতা) আছে হে!" সত্যেনবাবুর মুখে এ খুব বড় প্রশংসা। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি স্ট্যাটিস্‌টিক্স পড়বে?" বললাম, "তা সুযোগ পেলে পড়তে পারি, কিন্তু সে সুযোগ কোথায়?" তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "আমি তোমাকে বেতনসহ নয়মাসের ছুটি দেব, আর বছরে তিনমাস তো এমনিই ছুটি আছে।" গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হলেই তিনি আমাকে সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে গেলেন, আর ডঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন,—"দেখ, এ আমার ছোট ভাই-এর মত। একে বছরখানিকের মধ্যে যতটা পার

www.pathagar.com

পরিসংখ্যান শিখিয়ে দেও। একে যোগ্য মনে করেছি বলেই, আমি তোমার হাওয়ালায় রেখে যাচ্ছি।"

বুঝলাম সত্যেনবাবুর নির্বাচনী পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হয়েছি। এরমধ্যেই তাঁর মাথায় এসে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাগণিত চালু করতে হবে। আর সেজন্য শিক্ষক সৃষ্টি করতে হবে। সত্যেনবাবুর স্নেহ ও অনুগ্রহেই আস্তে আস্তে আমার পঠনের মোড় ফিরে গেল : পদার্থবিদ্যা থেকে পরিসংখ্যানে বা তথ্যগণিতের দিকে। এই মহাপুরুষের কাছে হিন্দু-মুসলিমের কোন প্রশ্নই ছিল না; ছিল গুণের আদর আর সূক্ষ্ম বিচার-বোধ। তিনি প্রথমে তথ্যগণিতকে অঙ্কশাস্ত্রের সাথে সংযোজিত করে দিলেন। এরফলে ১৯৩৯ সাল থেকে আমি তথ্যগণিত পড়াতে লাগলাম, আর পদার্থবিদ্যার ফলিত অংশ ত্যাগ করে অনার্স ক্লাসে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যাও পড়াতে লাগলাম। এইভাবে কিছুদিন চলার পর তথ্যগণিতের একটা পুরো অনুষদ সৃষ্টি করা হল। প্রথমে তথ্যগণিতের পাসকোর্স আর অনার্সকোর্স একসঙ্গে আরম্ভ হল। তার দুই বছর পরে এম. এ. কোর্সও খোলা হল ১৯৫০-৫১ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা বিষয়ে গর্ব করতে পারে; সে হচ্ছে, তথ্যগণিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে B.A. Honours Course খুলবার আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত অনার্স কোর্স খোলা হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালে সত্যেনবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। কিন্তু চলে গেলেও তিনি আমাদের কথা ভুলতে পারেননি।

একটু আগের কথা বলি : ১৯৩৬/৩৭ সাল থেকেই তিনি বাংলাভাষায় পদার্থবিদ্যা পড়াতেন। আমিও তাঁর পন্থা অনুসরণ করেছিলাম। এতে কোনও দিন অসুবিধা বোধ করিনি। বাংলাও অবশ্যই শিক্ষার বিষয়, ভেবেচিন্তে যথাযোগ্য পরিভাষা সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু যে শব্দটা বাঙালি জনগণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে, সেটা ত বাংলাভাষার অন্তর্গতই হয়ে গেছে। তার জন্য অনর্থক মাথা ঘামিয়ে হয়রান হওয়ার আবশ্যক নাই। যেমন,—আদালত, স্কুল, কলেজ, ভোট, কন্ট্রাক্টর, বাস, মোটরগাড়ী, পোষ্টকার্ড ইত্যাদি। সত্যেনবাবু একবার আমাকে বলেছিলেন, "বাংলায় একখানা পদার্থবিদ্যার ব্যবহারিক বই লেখ, তা দেখে ছাত্রেরা পরীক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া প্রভৃতি ভাল করে বুঝতে পারবে। এখন ওরা ইংরেজী বই দেখে পরীক্ষণ বুঝতে চায়, কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারে না বলে ভুল করে।" আমি তেমন একখানা বই লিখেও ছিলাম; সত্যেনবাবু তা দেখে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু একবার পূজার ছুটির আগে একটি ছাত্র বইখানা নিয়ে গেল, ছুটির শেষে ফেরত দেবে বলে। কিন্তু সে ছেলেটি আর ফিরল না! কি যে হলো বুঝতে পারলাম না।

তিনি কলকাতা চলে যাওয়ার পরে আমি তথ্যগণিত নাম দিয়ে একখানা 'পরিসংখ্যান'-এর বই লিখে তার ভূমিকাটা সত্যেনবাবুকে দেখিয়েছিলাম। তিনি পড়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর গবেষক-ছাত্রদের ডাক দিয়ে বললেন, "আরে, দেখ দেখ, কাজী কি করেছে!" এই বলে সম্পূর্ণ ভূমিকাটা তাদের পড়ে শুনালেন। তিনি অধিকাংশ পরিভাষাই পছন্দ করলেন, আর অল্প যে কয়টা তাঁর পছন্দ হল না সেগুলোর বিকল্প শব্দ

www.pathagar.com

আমাকে শুনালেন (আমি তা টুকে নিলাম)। ভূমিকাটা তিনি প্রবন্ধাকারে তাঁর 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। অবশ্য, আমি এর আগেও চিঠিপত্রের মারফতে পারিভাষিক শব্দাদি লিখে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করতে ত্রুটি করিনি।...এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, তাঁর ঢাকা অবস্থানের ২৪ বছর পর্যন্ত তাঁর যেমন ছাত্র ছিলাম, সারাজীবন-ভর আমি তাঁর ঠিক তেমন ছাত্রটিই ছিলাম।...বহুকাল যাবৎ আমি প্রতি বৎসর মহলানবিশ সাহেবের ২০৩ নং বি. টি. রোড, কলকাতা-৩৫এ Indian Statistical Institute-এর পরিদর্শক-শিক্ষকরূপে (এবং সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীরূপেও) আসা-যাওয়া করতাম। সে সময় কয়েকদিন পরপরই সত্যেনবাবুর সঙ্গেও দেখা করতাম। সত্যেনবাবুও কখনও কখনও ইন্সষ্টিট্যুটে আসতেন।...আমি Quantum Theory সংক্রান্ত সত্যেনবাবুর লেখাটার বাংলা অনুবাদ করেছিলাম এবং এর বাংলা নাম দিয়েছিলাম 'ঝলকবাদ'। প্রবন্ধটা কলকাতার 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সত্যেনবাবু আমার ভাষার স্বাভাবিকতা, সরলতা ও প্রাঞ্জলতার প্রশংসা করেছিলেন। অনুবাদটি কোন সালের কোন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল, আমার মনে নাই।...আমার এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটি আমাকে নানাদিক দিয়ে আমার জ্ঞানবর্ধন ও অনাবিল সুখদান করেছেন তার প্রতিদান দেওয়া অসম্ভব। 'মায়ের কাঙাল' আমি রাণী মহলানবিশকে 'মা' বলে ডেকেছিলাম বলে মহলানবিশ সাহেবও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। প্রীতি-ভালবাসার এ-সব উদারক্ষেত্রে নেই কোনও ভেদাভেদ; মানুষের মনুষ্যত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপর এর প্রতিষ্ঠা।

মনে পড়ে একদিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত পরিশ্রম করে দাবাখেলার তখ্‌তির উপর আটটা মন্ত্রী এমনভাবে সাজিয়েছিলাম যাতে কোন মন্ত্রী অন্য কোনওটির মারমুখো না পড়ে এইভাবে বের করেছিলাম মোট ৯২-ভাবে মন্ত্রীগুলো স্থাপন করা যায়। অবস্থানগুলো সংকেতে লিখে সন্ধ্যার আগেই সত্যেনবাবুকে দেখাতে গিয়েছিলাম। "ভাল করে আবার দেখ তো, অবস্থান সংখ্যা মোট ৯৬ হবে কিনা?" অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, চট করে ওঁর মাথায় খেলেছে বোর্ডে চারধারে বসে চারজন সংকেত লিখলে একই সংস্থানকে চারজনে চারভাবে ব্যক্ত করবে। তাছাড়া গণনাতে নম্বরগুলো বাঁ থেকে ডানে অথবা ডান থেকে বামে ১, ২, ...৮ করে গণা যেতে পারে। অতএব মোট অবস্থান সংখ্যা ৮-এর গুণিতক হবে। পরে দেখা গেল মোট ১২টি মৌলিক অবস্থান আছে, এরমধ্যে ১১টির উপরোক্ত প্রণালীতে ৮-ভাবে লেখা যায়, এর একটি মৌলিক অবস্থান আছে যেটি বোর্ডের উভয়-কর্ণের সঙ্গে সুষম, সেটিকে মোট ৪-ভাবে ব্যক্ত করা যায়। এই কারণে মৌলিক অবস্থান সংখ্যা ১১×৮+১×৪=৯২। এখানে সত্যেনবাবুর নির্দেশ অনুসারে ভুল খুঁজতে গিয়েই ১২টি মৌলিক সাজ বা অবস্থানের উপর নজর পড়লো। অন্য কথায়, ৯২টি সাংকেতিক অবস্থান হলেও ওগুলোর মৌলিক 'সাজ' মাত্র ১২টি। পরে আমি 'বিজয়রাঘবনে'র কাছে জানতে পারি, এ নির্ণয়টা নতুন নয়,—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Euler ইতিপূর্বেই ৮ মন্ত্রীর ১২ সাজ ও ৯২ অবস্থান আবিষ্কার করে গেছেন। উনিও দাবাড়ু ছিলেন। যাহোক তাতে ক্ষুব্ধ হইনি—বড় বড় গণিতজ্ঞরাও ভাল দাবা খেলতে পারেন, এ শুনে আনন্দই পেয়েছি।

www.pathagar.com

সত্যেনবাবু যখন ঢাকায় অবস্থান করছিলেন, তখনই ভারতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠানে Balanced Incomplete Block Design সম্বন্ধে গবেষণা চলছিল। বাংলায় বলতে গেলে, গবেষণার বিষয় হচ্ছে, 'অসম্পূর্ণ শ্রেণী-সংস্থান ব্যাপারে সুতৌল প্রকল্প'। আমি একদিন সত্যেনবাবুর কাছে গিয়ে বললাম, "আমি ভুল-নির্ভুল বিচারী পদ্ধতিতে (trial method) কয়েকটি সুতৌল-অসম্পূর্ণ-সারি-সংস্থান (Balanced Incomplete Block Design) সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলে তার সংখ্যা গণন করতে চাই।" উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "অনুমান কতটা trial লাগবে?" আমি বললাম, "৮০ হাজারের নীচে নয়, আবার ১ লাখের উপরে নয়।" "যাঃ—যা; পাগলা, এত খাটনি করতে পারবে?" এরপর আমি ৬ মাস পর্যন্ত এ কাজে লেগে থেকে মোট সাতশটা সমাধান পেলাম। সংস্থানটা ছিল, ১৫টা সারি, ১৫টা বিভিন্ন জাত, প্রত্যেক সারিতে ৬টি করে বিভিন্ন জাত; প্রত্যেক জাত ৬টা বিভিন্ন সারিতে থাকবে, আর প্রত্যেক জোড়া সারিতে ২টা সাধারণ জাত থাকবে। সত্যেনবাবুও এ সময়, অনেকটা এই ধরনের কাজ করছিলেন। এবারে আর তাড়িয়ে দিলেন না; খুব মনোযোগের সহিত দেখলেন। তাঁর খুশি দেখে কে! থীসিসটা রেখে দিলেন, বাড়ী গিয়ে আবার দেখবেন। পরদিন বললেন, "দেখ, এই ২৭টা কিন্তু বিভিন্ন সমাধান না-ও হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে বিভিন্ন সংস্থান হয়ত গোটা ছয়েকের বেশী হবে না। একই সংস্থানের isomorphic হয়ত নাম বদল করে বিভিন্ন সাজে সেজেছে।" আমি ভাল করে খতিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম সত্যেনবাবু ঠিকই ধরেছেন। পরে শ্রেণীকরণ করে দেখা গেল, মাত্র তিনটে non-isomorphic বা প্রকৃতই বিভিন্ন সংস্থান হয়েছে। তিনি বিশেষ যত্নের সহিত আমার সমুদয় গবেষণা-পত্রটি শুধরে দিলেন। এই গবেষণাপত্রের জন্য আমি ডক্টরেট পেয়েছিলাম। এর আদিতে ছিল সত্যেনবাবুর অসীম স্নেহ।

পারিবারিক সংস্পর্শেও প্রফেসর সত্যেন বোস অকুণ্ঠ মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি যে পাড়ায় থাকতেন, তার আশেপাশে সকলের বাড়ীতেই সপরিবারে বেড়াতে যেতেন। তাঁদের যথাযোগ্য খোঁজ-খবর নিতেন, বিপদ-আপদের সময় সুপরামর্শ দিতেন। ১৯৪১ সালে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের নিদারুণ অসুখ হয়েছিল। তিনি দুই-একদিন পরপরই দেখতে আসতেন। একদিন আমি ১১টার সময় ক্লাস নিতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "কাজী, আজকে তুমি আর ক্লাস করো না। বাড়ীতে গিয়ে ছেলেটাকে দেখাশুনা কর গিয়ে। ওর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না।" তাই শুনে আমি বাড়ীতে ফিরে এসে সারাদিন ও রাত্রি ছেলেটির সেবা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। ইতিপূর্বেই ছেলের জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মধ্যরাত্রের কিছু পরেই ছেলেটি যেন হৃৎপিণ্ডের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চীৎকার করে বলে উঠলো,—"আব্বাম! আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আরও তিনমাস বাকি আছে, কিন্তু আমি এই চললাম।"...এই তার মুখের শেষ বাক্য। পরদিন সকালবেলা এসে সত্যেনবাবু এ ব্যাপার দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি,—ছেলেটাকে তিনি খুব ভালবাসতেন—ওর আচার-ব্যবহার অতিশ্রয় ভদ্র ছিল বলে।

www.pathagar.com

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ১৯২৪ সালে সত্যেনবাবু অশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে জগদ্বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের ফোটন ও ঝলক্‌বাদ-সংক্রান্ত ব্যাখ্যার এক অংশে কিছুটা ত্রুটি দেখিয়ে এক গবেষণাপত্র লণ্ডনে ছাপার জন্য পাঠিয়েছিলেন; ঐ পত্র সেখান থেকে আইনস্টাইনের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির অকাট্য যুক্তি আইনস্টাইন স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং নিজে সেটা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বিশিষ্ট জার্মান পত্রিকা 'Zeitschrift Fur Physik'-এ প্রকাশ করেছিলেন। পরে পরিশোধিত তত্ত্বটি 'বোসন' বা বোস-আইনস্টাইন ঝলক-কোয়ান্টাম তত্ত্ব নামে প্রচলিত হয়েছে। 'বোসন'-এর বিশেষ উৎকর্ষ রয়েছে সম্ভাবনা-তত্ত্বের নিখুঁত যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারে,—অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট মাত্রার তেজপুঞ্জের বিশ্লেষণে ফোটন-গুচ্ছের মধ্যে যেগুলো অ-বিভেদ্য (unrecognisable), সেগুলোর সন্নিবেশ-সংখ্যা (Permutation) নির্ণয়ে যথাযথ গৌণিক-সংখ্যা (ফ্যাক্‌টরিয়াল) দিয়ে ভাগ করে নেওয়ার সতর্কতায়। ব্যাপারটা এত ঘোরালো ছিল যে, একমাত্র শ্রীযুক্ত বোস ছাড়া অন্য কোনও বৈজ্ঞানিকই অতটা গভীরে প্রবেশ করে তত্ত্ব ও পরীক্ষণের সমন্বয় সাধন করতে পারেননি। আমার সামান্য জ্ঞানে এরচেয়ে স্পষ্ট করে আর বুঝাতে পারছিনে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ্যার কক্ষে বসেই প্রফেসর বোস ম্যাক্স-প্লাঙ্কের প্রস্তাবিত গাণিতিক সূত্রের সুষ্ঠু পরিশোধন করতে পেরেছিলেন বলে, আমরা (তাঁর শিষ্য-ভক্তগণ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ ও ভারত গর্ব অনুভব করতে পারি। এইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মহলও এই মহামানবের মস্তিষ্কের উদ্ভাবনশক্তির প্রশংসা না করে পারেন না।

লোক সাহিত্য পত্রিকা
জানুয়ারি-ডিসেম্বর-১৯৮৪
পৌষ ১৩৯০-অগ্রহায়ন-১৩৯১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কর্ম-প্রাণ আবুল হুসেন

মৌলবী আবুল হুসেনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯১৫ সালে কলকাতার ইলিয়ট হোস্টেলে। কিন্তু সে-পরিচয় কেবল মুখ-চেনা-চিনি। তিনি তখন কলেজে "সেকেণ্ড ইয়ার"-এ পড়তেন। আর আমি "ফার্স্টইয়ার"-এ। সে-সময় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার বিশেষ কোন কারণ ঘটেনি। ছাত্র-জীবনে অনেক সময় কারণ নির্বিশেষে কারও কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে থাকে। কিন্তু আবুল হুসেন সাহেবের এমন কোন সহজদৃষ্ট বিশেষত্ব ছিল না, যার জন্য স্বভাবতঃ লোকে তাঁর অনুরাগী হতে পারে এবং তাঁর কাঠখোট্টা রকমের মুখপোড়া চেহারা দেখে তাঁর প্রতি অন্যান্য ছাত্রের কিঞ্চিৎ অবহেলার ভাব হওয়াই অধিক সম্ভব ছিল। বোধহয় এই কারণে এবং কলেজে এক বৎসরের ব্যবধানের জন্য বহুবার তাঁর সঙ্গে ইলিয়ট হোস্টেলের কমনরুমে এবং কয়েকবার কলকাতার এক লিটারারী সোসাইটিতে দেখা হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে তখন তাঁকে চিনতে পারিনি। পরবর্তী কালে তাঁর কাছে এ কথা প্রকাশ করে বলায় উভয়ের হাস্যের কারণ হয়েছিল। যা হোক, তাঁকে সর্বদা স্বল্পভাষী বিমর্ষ দেখতে পেতাম, খেলাধুলা বা কৌতুক আমোদের দিকে কোনদিন তাঁর আগ্রহ দেখতে পাইনি। এখন বুঝতে পারি, তিনি ছিলেন এক ধেয়ানী পাঠ-নিষ্ঠ—সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত। একমাত্র জ্ঞান-লোক ছাড়া অন্য জগৎ তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর ছিল।

এই সম্পর্কে আর একটি কথা কিছু অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখি। ইলিয়ট হস্টেলে একাধিক মেস ছিল, আর আমরা বিভিন্ন মেসের মেম্বর ছিলাম। বিভিন্ন মেসের মধ্যে এক প্রকার মৃদু রেষারেষি ভাব চলত। হয়ত এই কারণেও আমাদের মধ্যে পরিচয়ের স্বচ্ছন্দতা কিছু ব্যাঘাত পেয়ে থাকবে। আজ মনে হচ্ছে হায়, কেন এইসব অপ্রকৃত বাধা ঠেলে তখন প্রকৃত গুণের সমাদর করতে পারিনি?

তারপর ১৯২১ সালে তিনি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চাকরি নিয়ে এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আবার নতুন করে পরিচয়। এই পরিচয় নিবিড়তর হল। এখন আর সেই স্বল্পভাষী-বিমর্ষ আবুল হুসেন নয়, আত্মবিশ্বাসের আনন্দে উদ্ভাসিত নতুনতর আবুল হুসেন। এবার দেখি, জ্ঞানযোগের সঙ্গে কর্মযোগের সংযোগ হয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অন্তঃ-সৌন্দর্য ও সহজ হৃদ্যতার বলে আমাকে এবং আরও অনেককে আকর্ষণ করে নিলেন। এবারে বুঝলাম, তিনি সত্য সত্যই মুখ-পোড়া—উচিত কথাটি শুনিয়ে দিতে কাউকে খাতির করেন না। যাহোক, অচিরেই তিনি সত্যনিষ্ঠা কর্মনিষ্ঠা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য সুখ্যাতি অর্জন করলেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রচুর সমাদর লাভ করলেন।

কিন্তু আবুল হুসেনের আসল কর্তৃপক্ষ ছিল তাঁর বিবেক। তাঁর বিবেক বলল, 'সমাজের কাজে নামতে হবে।' তাই কর্ম-প্রাণ আবুল হুসেন জ্ঞানবর্তিকা উজ্জ্বল করে

www.pathagar.com

জ্বালিয়ে অন্ধ সমাজকে পথ দেখাতে চাইলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চারদিকে শিষ্য, সমভাবুক ও সহকর্মীরা জুটে গেল। আমার অলস প্রাণেও তিনি একটি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করলেন; মাঝে মাঝে যে একটু আধটু সাহিত্যচর্চা করে থাকি, আবুল হুসেনের প্রেরণাতেই তার সূচনা। তিনি সময় সময় এই বিষয় উল্লেখ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন; আজ আমি সাধারণ্যে এর জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

জ্ঞানের সম্মার্জনীতে আবর্জনা দূর হয় সত্য, কিন্তু সকলের পক্ষে তা সুস্থ হয় না। তাই আবুল হুসেনকে নানা আপদ-বিপদ ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি নির্ভীকভাবে জ্ঞান-শিখা প্রজ্বলিত করে ঘুমন্ত সমাজে 'জাগরণ'-এর বার্তা ঘোষণা করেছেন। মুসলমানের অতীতকে তিনি গৌরবময় বলে জানতেন; কিন্তু তার ধ্যানে মুহ্যমান না হয়ে বরং ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য তিনি সমাজকে আহ্বান করেছিলেন। মুসলমানের সম্পত্তি বহু অংশে বিভক্ত হয়ে শীঘ্রই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তাই তিনি মুসলমানের উত্তরাধিকার আইনের সংস্কারপ্রার্থী ছিলেন। ধর্মকে তিনি জীবনপথের সহায়ক মনে করতেন, তাই 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধে ধর্মের বহিরাবরণের দিকে জোর না দিয়ে তার অন্তর্নিহিত প্রাণবান, সতত বিকাশমান সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। মুসলমানকে তিনি ভিক্ষুকের বেশে দণ্ডায়মান দেখতে লজ্জা বোধ করতেন, তাই তাঁর বিখ্যাত 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' প্রবন্ধে তিনি মুসলমানের আত্মসম্মান-বোধ জাগাতে চেয়েছিলেন।

তাঁর নিজের আত্মসম্মান-বোধ প্রবল থাকাতেই তিনি ইউনিভার্সিটির উচ্চ আয়ের পদ ত্যাগ করে অনিশ্চিত আইন-ব্যবসায়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এতে তাঁর সৎসাহস ও আত্মবিশ্বাসেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রেও তিনি প্রভূত যশ অর্জন করে গেছেন। বাংলাদেশে ওয়াক্‌ফ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বহুলাংশে তাঁরই কীর্তি। ক্রমোন্নতি তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল। তাই জীবন-সংগ্রামের জন্য যতটা পরিশ্রম করে সাধারণ লোকে সন্তুষ্ট হত তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও অতিরিক্ত পরিশ্রম করে এম. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঢাকার সুপ্রতিষ্ঠিত পসার ত্যাগ করে কিছুদিন পরেই কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতে যান।

মৌলবী আবুল হুসেন সমাজবৎসল ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। ঢাকায় অবস্থানকালে এবং তার পরেও যখনই যে-কোন বিষয়ে তাঁর উপদেশ বা সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তখনই তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে তা দিয়েছেন। তিনি কখনও প্রতিদানের আশায় পরোপকার করতেন না। বস্তুতঃ আবুল হুসেন এত বৃহৎ ছিলেন যে, তাঁর উপকার করব, এমন কথা কোনদিন আমার মনে হয়নি; আর তাঁর কাছ থেকে উপকার চাইতেও কোনদিন সঙ্কোচ বোধ করিনি।

আবুল হুসেনের সমাজ-প্রীতি তাঁর মানব প্রীতিরই বিশেষ অভিব্যক্তি ছিল। এজন্য সামান্য সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতায় তাঁর মন কোন দিন আচ্ছন্ন হয়নি। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামী ছিলেন। হিন্দু-কালচার ও মুসলমান-কালচারের মধ্যে তেল-জলের সম্বন্ধ, এ কথা তিনি মানতেন না। তিনি বলতেন, উভয় কালচার পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দূরের কথা বরং মধুরতর হয়ে ক্রমশঃ কালোপযোগী পরিপুষ্টি লাভ

www.pathagar.com

করেছে। হিন্দু-মুসলমান যদি আপন আপন কালচার নিয়েই, সব কালচারের মূলীভূত মানবতার ক্ষেত্রে একত্র হয়, তবেই স্থায়ী মিলন সম্ভব হতে পারে। মানবতার ক্ষেত্র অতি প্রশস্ত, কোন কালচারের সঙ্গেই এর বিরোধ নাই এবং কোনো বিশিষ্ট কালচার যে অন্য কালচার দ্বারা গ্রাসিত হতে পারে এরূপ ভয়ও তিনি করতেন না।

কর্ম-প্রাণ আবুল হুসেন নদী-সমস্যা, আইন-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা, এবং শিক্ষা, সাহিত্য, সম্প্রদায় প্রভৃতি নানা সমস্যার চিন্তা করেছেন, পুস্তক রচনা করেছেন এবং এসব সমাধানের জন্য বিবিধ কমিটি ও বোর্ডের মেম্বাররূপেই হোক, আর ব্যক্তিগত ভাবেই হোক, আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন। সে-সময় নিজের সুখ-সুবিধা বা স্বাস্থ্যের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ করেন নি। তাঁর অক্লান্ত জ্ঞান-লিপ্সা ও কর্মপিপাসাই বোধ হয় তাঁকে অকাল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে। তাঁর অসাধারণ কর্মশক্তি, সংগঠন-ক্ষমতা এবং পরিচালন-প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হওয়া বর্তমান বাংলাদেশের, বিশেষ করে সদ্য জাগরিত মুসলমান সমাজের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

মুসলিম হল বার্ষিকী, দ্বাদশ বর্ষ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর অবদান

আমরা কারও জীবনী আলোচনা করতে হলে প্রথমেই বিবেচনা করি তাঁর লৌকিক পরিচয় কি—তাঁর বাপ-দাদা ও নানা-মামুরা কি পর্যায়ের লোক ছিলেন; অর্থাৎ তাঁর বংশপরিচয়টাই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই হচ্ছে বাংলাদেশের, ভারতবর্ষের বা প্রাচ্যের রীতি। কিন্তু প্রতীচ্যের দৃষ্টিভঙ্গী একটু অন্যরূপ—অর্থাৎ সেখানে ব্যক্তিগত গুণপনার উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রাচ্যদেশের এই বদ্ধমূল রীতির উপর আঘাত এসেছে বুদ্ধদেবের কাছ থেকে, হযরত মুহম্মদের কাছ থেকে এবং এঁদের অনুসারীদের কাছ থেকে। তবু আমাদের দৃঢ়-সংস্কারের প্রাচীর একরূপ অনড়ই রয়ে গেছে। বিশেষ করে ডারউইনের প্রাকৃতিক উত্তরাধিকারবাদ, পরোক্ষভাবে হলেও, কতকটা বংশ পরম্পরার বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণ-যুক্তির পরিপোষক হয়েছে। তাই আমি আলোচনার প্রারম্ভেই কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের বংশপরিচয় ও পরিবেশ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলে নিতে চাই।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের পিতৃভূমি বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাগমারা গ্রামে। আমি বাল্যকালে দেখেছি বাগমারার কাজীপাড়ায় সাতটি বিভিন্ন বংশের বাস—চারটি কাজীবংশ আর একটি করে মিয়াবংশ, খোন্দকার বংশ আর মীরদাহ্ মৃধা বংশ। অবশ্য এই ভদ্র চাকলার আশে-পাশে একটু দূরে আশ্রিত প্রজা বা অনুগত কৃষক-প্রজাদেরও বাস ছিল। আমারও পিতৃভূমি বাগমারা গ্রামে।

ওদুদ সাহেবের নানাবাড়ী ছিল পদ্মার ধারে বাগামারা থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরবর্তী হোগ্‌লা গ্রামে। এঁরা ছিলেন মোটা গৃহস্থ। ওদুদ সাহেবের নানা পাঁচুমোল্লা ছিলেন বিষয়সম্পত্তিওয়ালা বিচক্ষণ লোক। ইনি নিজের ছেলেপিলেদের লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন। ওদুদ সাহেবের ছোট মামু নজীরউদ্দিন মোল্লা দারোগা, মেঝ মামু খবীরউদ্দিন বি. এ. শিক্ষাবিভাগের সহকারী ইনস্পেক্টর, আর বড় মামু আসহাবউদ্দিন ছিলেন পিরোজপুরের বড় দারোগা। ওদুদ সাহেবের মা ছিলেন পাঁচুমোল্লার কনিষ্ঠা কন্যা। ওদুদ সাহেবের বড় মামুই তাঁর শ্বশুর কিন্তু তাঁর লেখাপড়ার ভার ছিল ছোটমামুর উপরে। তিনি বিভিন্ন জেলায় কয়েকটা বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। আর বাংলাদেশের নানা অঞ্চলের লোকের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ওদুদ সাহেবের পিতা কাজী সগীরউদ্দিন স্টেশন মাস্টার ছিলেন। কাজ করেছেন দর্শনা(?), সোদপুর, হাওড়া প্রভৃতি তৎকালীন ইস্ট-বেঙ্গল রেলওয়ের কয়েকটি স্টেশনে। ইতিপূর্বে বাগমারার বিশিষ্ট সর্বমান্য বয়োজ্যেষ্ঠ রইস 'কাজেম কাজী'র এক পুত্র (ওদুদ সাহেবের একজন দাদা) পাঁচুমোল্লাদের বাড়ীতে গৃহশিক্ষকতার কাজ করতেন। তখনও সগীর কাজীর চাকুরী হয়নি। এই সুযোগে পাঁচুমোল্লা সাহেব নিজের

www.pathagar.com

সুন্দরী কনিষ্ঠা কন্যার সহিত সগীর কাজী সাহেবের বিবাহ সম্পন্ন করেন। পরে স্বভাবতঃই নাজীরউদ্দীন দারোগা, আসহাবউদ্দিন দারোগা গয়রহের তদ্বিরে ওদুদ সাহেবের পিতা রেলওয়ের স্টেশন মাস্টারীর পদ পেয়েছিলেন।

সগীর কাজী সাহেবের আর একটি বিরল নাম ছিল 'সৈয়দ হোসেন কাজী'। যা-হোক এঁরা যে কাজী বংশের লোক, আর সৈয়দ বলে কখনও দাবীও করেননি—তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি শ্রীমান আবুল ফজলের বইয়ে ওদুদ সাহেবকে 'সৈয়দ' বংশীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে দেখেই কথাটা পরিষ্কার করে বললাম।...সগীর সাহেব রেলওয়ের চাকুরে বলে তাঁকে অধিকাংশ সময় স্টেশন কোয়ার্টারেই থাকতে হতো। কদাচিৎ বাগমারার বাড়ীতে আসতেন। তিনি বড় মিশুক ও রসিক লোক ছিলেন। গ্রামে এলেই সবার বাড়িতে এসে দেখা করতেন আর অনেক গল্পগুজব করতেন। ওঁর কথাবার্তার ঢং ছিল অতিশয় স্পষ্ট আর মতামত অতিশয় দৃঢ় ও সুনির্দিষ্ট। গ্রামের সবাই তাঁকে ভালোবাসতো, তিনিও কারো শত্রু ছিলেন না। ১৯২০/২১ সালের কিছু পরে তাঁর মৃত্যু হয়,—হাওড়াতে স্টেশন কোয়ার্টারেই।

ওদুদ সাহেবের দাদা ইয়াসীন কাজী সাহেব নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু পরিশ্রমী, সচ্চরিত্র এবং নির্বিরোধী লোক ছিলেন—নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাতেন না। পিতৃকুলের চেয়ে মাতৃকুলের ছাপই ওদুদ সাহেবের মনে গভীরতর রেখাপাত করেছে।

বাল্যকালে আমি তাঁর সাক্ষাৎ পেতাম প্রতিবৎসর স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটি ও পূজার ছুটিতে। তখন আমি ছিলাম গ্রাম্য বোকারাম, আর তিনি ছিলেন শহুরে ফিটবাবু। তাঁর ডাকনাম 'ফতুমিয়া'। তিনি বয়সে বড়, অভিজ্ঞতায় বড়। সুতরাং আমাদের (গ্রাম্য বালকদের) উপর তিনি ছিলেন অন্ততঃ থানার দারোগা বা মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট। গ্রাম্য বালকেরা উড়াতো চিলে ঘুড়ি, তিনি উড়াতেন 'ঢাউশ'—যা ওড়ে 'চিলে'র বহু উর্ধ্বে দিয়ে; আমরা গায়ে দিতাম বড় জোর একটা গেঞ্জি, তিনি পরতেন ফতুয়া, বা শার্ট-কোট। আমরা বেড়াতাম খালি পায়ে, তাঁর পায়ে থাকতো চটি বা পাম্পসু—কত আকাশ পাতাল পার্থক্য। তবু আমাকে তিনি ভালোবাসতেন, ভাল ছেলে বলে আমাকে অনেকরকম কূট প্রশ্ন ও সমস্যা দিয়েও দস্তুরমত ঠকাতে পারেননি বলে আমার ঘিলুতে একটু বুদ্ধি আছে, সে কথা স্বীকার করতেন। তিনিই আমাকে সাত ঘুঁটি বাঘবন্দী, আর মোগল-পাঠান (দুইরকম ছকে) শিক্ষা দেন। এসব খেলায় প্রথমে পাঁচছয় দিন হেরে হেরে পরে তাঁর সমকক্ষ হতে পেরেছিলাম—এতে তিনি খুব খুশী। পরে যৌবনকালে যখন আমি দাবা খেলা শিখলাম, তখন তিনিও আমার কাছ থেকে ও খেলাটা শিখে নিলেন। সে খেলায় পাঁচবার হেরে যদি একবারও জিততে পারতেন, তা হলেই মনে করতেন, তাঁরই জিত হয়েছে। শেষে তিনি যখন ঢাকার বাড়ী বেচে দিয়ে কলাকাতায় বাড়ী করলেন, তখনও আমি কলকাতা গেলেই আমাকে ডেকে নিয়ে দাবাখেলা শুরু করতেন, অন্ততঃ একটি বাজী জিতবার জন্য। সেই জিৎ-বাজী না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া পাব না, আমি জানতাম। তাই শেষ বাজীটা তাঁকে দিতেই হত। উনি বলতেন, 'ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে", আর "All's well that ends well"।

www.pathagar.com

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব পাকা তার্কিক ছিলেন। কখনো হার মানতেন না। আমাকে অনেকবার বলেছেন, তুমি বিষয়টা ঠিক বুঝতে পারছ না। আমি যেটা বলছি, সেটাই নির্ঘাত সত্য। তবু আমাকে দিয়ে হার স্বীকার করিয়ে নিতে অক্ষম হলে, অবশেষে বলতেন, "Let us agree to differ—হয়ত তোমার যুক্তির মধ্যেও কিছু সত্য আছে!"

এবার আমরা তাঁর শিক্ষাজীবনের কিছু তথ্য দিয়েই তাঁর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করবো। তাঁর প্রথম পাঠ হয় জগন্নাথপুর মাইনর স্কুলে। এটা হোগলা থেকে আরও দূরে, বাগমারা থেকে প্রায় মাইল সাতেক দূর। বাগমারা, হোগলা, জগন্নাথপুর সবগুলোই পদ্মানদীর তীরে, এবং পশ্চিম পার্শ্বে। জগন্নাথপুর থেকে আরও মাইল চার-পাঁচ অগ্রসর হয়ে পদ্মা পার হলেই পাবনায় যাওয়া যায়। বাগমারা থেকে আড়াই মাইলটাক দূরে আজুদিয়া। পদ্মার পারেই আজুদিয়া গ্রাম। পাঁচু মোল্লা সাহেবের সম্পত্তি ছিল হোগলা থেকে আজুদিয়া অন্তর্বর্তী অঞ্চলে—এক লাগাট নয়, কয়েকটি ছিটমহলের সমষ্টি। যা হোক, জগন্নাথপুর থেকে নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়ে তাঁর ছোট দারোগা মামার সাথে ঢাকা, নরসিংদি (সাটিরপুর), পাবনা ইন্‌স্টিট্যুট, নারায়ণগঞ্জে (মুড়াপাড়া) আবার ঢাকায়। এক বৎসর পরে ১৯১৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন; যা পড়তেন সে সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এরপর নাজিরউদ্দীন সাহেব (ছোটমামা) তাঁকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠিয়ে দেন। কলকাতাতেই তিনি আই. এ., বি. এ. ও এম. এ. পাশ করেন। আমি পড়াশুনায় তাঁর থেকে দুই বছর নিচে ছিলাম। তিনি আই. এ. পাশ করার পর আমিও প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এস সি. পড়তে যাই। তিনি থাকতেন বেকার হস্টেলে, বে-কার নয় Baker সাহেবের নাম বেকার। আর আমি থাকতাম পার্শ্ববর্তী ইলিয়ট হস্টেলে। এ সময় আমি তাঁর বিশেষ 'স্নেহ' ও সাহায্য পেয়েছিলাম। ইংরেজির একখানা পাঠ্যবই ছিল Coverley Papers তাঁর পড়া শেষ হয়েছিল বলে তিনি আমাকে তাঁর Edison নামক বৃহৎ বইখানা দিয়ে দিয়েছিলেন। এতে সমুদয় Coverley Papers ছাড়াও আরও অনেক সাহিত্যিক রচনা ছিল। তিনি যে পাঠ্য-অংশের থেকে আরও অধিক জ্ঞানের পিপাসী ছিলেন, এ হচ্ছে তার একটা দৃষ্টান্ত।

কলকাতায় থাকতে তিনি আমাকে 'সাহিত্যিক' সভায় নিয়ে যেতেন। সেখানে একটা রীতি ছিল যে, উপস্থিত সবাইকে কিছু না কিছু বক্তৃতা করতেই হবে। এখন সে সাহিত্যিক সমিতির নাম ভুলে গিয়েছি। সেটা বোধ হয়, কোন মুসলিম সাহিত্যিক সভাই হবে; কারণ এ সম্পর্কে শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের পুত্র আফজালুল হকের এবং যশোর জেলার সুবক্তা মহম্মদ ওয়াজেদের নামও মনে পড়ছে।

ওদুদ সাহেব তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে রামপ্রসাদ মুখার্জি, দিলীপ কুমার রায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, আমীন আহমদ এবং আরও কয়েকজনের নাম করতেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সত্যেন দত্ত তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন। সবুজপত্র, প্রবাসী ও পরিচয় পত্রিকাও তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। এগুলো আমাকে পড়তে দিতেন, আমাকে সাহিত্যে তালিম দেবার জন্য। এতে অবশ্যই আমি উপকার পেয়েছি। স্কুল

www.pathagar.com

কলেজে তিনি ক্লাসিক্যাল বিষয় হিসাবে আরবী-ফার্সী পড়েননি; পড়েছিলেন সংস্কৃত। আর একটি আশ্চর্যজনক কথা এই যে এম. এ. ক্লাসেও তিনি বাংলা নেননি। তাঁর বিষয় ছিল—অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি (Economics & Politics)।

তাঁর প্রথম দুইখানা পুস্তক 'মীর পরিবার' ও 'নদীবক্ষে' আর শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' এর সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলাদেশের সাহিত্যিকগণ বুঝতে পারলেন বাংলা সাহিত্যের আকাশে এক তরুণ তারকার আবির্ভাব হয়েছে। প্রথম দুইখানা বইয়ে তিনি বাংলার অবহেলিত সাধারণ মুসলিমের গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করেছেন, এবং অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত তাদের চিন্তাভাবনা, পারস্পরিক সামাজিক সম্বন্ধ, একত্র শান্তিপূর্ণ বসবাসের প্রসঙ্গাদি আলোচনা করেছেন। এগুলো তাঁর ছাত্রাবস্থায় লেখা।

১৯২০ সালে তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলার অধ্যাপক হয়ে ঢাকায় আসেন। ঐ সময় প্রাক্তন ঢাকা কলেজের বি. এ., এম. এ. অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে, এর আই. এ., আই. এস সি. অংশ গবর্ণমেন্টের ইন্টারমিডিয়েট বোর্ডের অধীন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত হয়েছিল। ওদুদ সাহেবের উপর উল্লিখিত বইগুলো অবশ্যই বিখ্যাত গবেষক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের চোখে পড়েছিল। তাই তাঁর কাছে বাংলা গবর্ণমেন্টের প্রেরিত নির্বাচন ফাইল পৌছে গেলে তিনি সব কাগজপত্র দেখে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবকেই বাংলার অধ্যাপকরূপে নিযুক্তির সুপারিশ করেছিলেন। এতেই বোঝা যায় তিনি বাংলা সাহিত্যের জগতে তখনই একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকরূপে গণ্য হয়েছিলেন।...অতঃপর ঢাকা থেকে রাজশাহী কলেজে কিছুদিন বাংলা অধ্যাপনা করেন। তারপর গবর্ণমেন্ট তাঁকে কলকাতার টেক্স্টবুক কমিটির 'রীডার' হিসাবে নিযুক্ত করেন। রীডার এর কাজ ছিল স্কুল কলেজের জন্য দাখিলকৃত পাঠ্য বইয়ের মধ্যে কোনটা গ্রহণযোগ্য আর কোনটা নয় , তা নির্ণয় করা, এবং আরও বিবিধ প্রশাসনিক কাজ, যা ইতিপূর্বে সাধারণত এ. ডি. পি. আই.-রাই করতেন।

কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্যকৃতি বিশেষভাবে রক্ষিত রয়েছে তাঁর 'শাশ্বত বঙ্গ' ও 'সমাজ ও সাহিত্যে'র প্রবন্ধাবলীতে; এবং তাঁর 'গ্যেটে'র রচনাবলীর ভিতরে। এছাড়া 'হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম' গ্রন্থে তিনি ধর্মসংক্রান্ত অনেক কথার আলোচনা ও বিবেচনা করে বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি, তার মর্মানুসরণ করবার কথা বলেছেন। তিনি রামমোহন রায়ের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। তাঁর যৌবনকালে, সাধারণ মুসলমান সমাজকে তিনি হযরত মোহাম্মদের অতিশয় গোঁড়া ভক্ত বলে খেদ করেছেন, অথচ, তিনি নিজে যে রাজা রামমোহনের ততোধিক অন্ধ ভক্ত, একথা বুঝতে পারতেন না, বা বুঝতে চাইতেন না। তবে প্রৌঢ়কালে তিনি নানামতের সুমিত সমাধান ও তদ্রূপ ব্যবহারেরও পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর শিক্ষক জীবনের প্রথম অবস্থায় ১৯২০ সালে তিনি আমাকে অংশীদার করে পূর্বদরজা রোডের ধারে একটি বড় বাড়ী ভাড়া নেন। সেখানে আমরা দুই তিন বছর সপরিবারে বাস করি। তখনও দেখেছি তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহার, স্নেহপ্রবণ স্বভাব। আমি

www.pathagar.com

১৯১৭-১৮ সাল থেকেই একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের কাছে ঠুংরী ও খেয়াল শিক্ষা আরম্ভ করেছিলাম। তা দেখে তিনিও আমার তানপুরা থেকে বৃহত্তর একটি তানপুরা কিনে ওস্তাদজীর কাছে তালিম নিতে শুরু করলেন। এই ওস্তাদজীর কাছে আমি তাঁর প্রথামত প্রথম বৎসর শুধু 'সরগম'-এর শিক্ষা লাভ করে কণ্ঠ ও যন্ত্রের স্বরের মধ্যে 'জানে জানে' মিল হবার পরে সঙ্গীতের তারানা, পদ, বাদী, সম্বাদী, আস্থায়ী-অন্তরা ইত্যাদি শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি সপ্তাহখানেক গলা সেধেই চৌতাল, তেওরা, আড়াঠেকা, মধ্যমান ইত্যাদি ধ্রুপদী তালে সঙ্গীত শিখবার জন্য জিদ ধরলেন। ওস্তাদজীকে অগত্যা তাই স্বীকার করে নিতে হল। এতে আমার মনে পড়লো, লালনশা-র সঙ্গীতের একটা পদ—"ওরে, যে যা বোঝে, তাই সে বুঝে থাকেরে ভোলা"। যাহোক ওদুদ সাহেব ৩/৪ বছর পর্যন্ত কয়েকটা ওস্তাদি গান শিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখে সব গানই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মত শুনাতো। তবে তাঁর গলা দরাজ ছিল এবং পদ্যের লয়-বোধও ছিল।

১৯২৬ সালে ওদুদ সাহেবের সভাপতিত্বে, কবি আবদুল কাদিরের উৎসাহে, অধ্যাপক আবুল হোসেনের সম্পাদনায়, আমার সহকারিতায়, আর ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও অন্যান্য স্থানীয় কলেজের সাহিত্যানুরাগীদের সমবেত চেষ্টায় 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল বাণী ছিল "বুদ্ধির মুক্তি"। আর মানুষের বিচার কোনও বিশেষ ধর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং সকল ধর্মের সারাংশ যে 'মানবতা বা মনুষ্যত্ব' তারই মাপ-কাঠিতে। অল্পদিনের মধ্যেই সুধীসমাজে এর প্রসার হল, কিন্তু সম্প্রদায়-বাদীদের কাছ থেকে প্রবল বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হল। যাহোক, পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে ছাত্র-সমাজের মধ্যে ক্রমশ এই আদর্শের মর্মবোধের ব্যাপ্তি হতে লাগলো, এর সঙ্গে সঙ্গে হয়ত তাদের অভিভাবকদের কিছুটা চোখ খুলে গেল। এই সমাজে বিভিন্ন সভ্য কর্তৃক পঠিত 'সম্মোহিত মুসলমান', 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ', 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ', 'মানুষ মোহাম্মদ', 'অসীমের সন্ধানে', 'মানব মুকুট', 'মুস্তফা চরিত', 'সমাজ ও সাহিত্য' ইত্যাদি বহু প্রবন্ধ প্রশংসিত বা বিশেষভাবে নিন্দিত হয়েছিল।

ওদুদ সাহেবের চিন্তাশক্তি গভীর ও বহুমুখী ছিল। তিনি প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, অনুবাদ, সমালোচনা প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার্কিক হিসাবে তিনি যে কোনও বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে যুক্তির সহিত অভিনব চিন্তার সংযোগ করে প্রতিপক্ষকে চমৎকৃত করে দিতেন। আমরা এই ক্ষণজন্মা বীর সাহিত্যিকের মাগফিরাৎ কামনা করি।

ওদুদ সাহেবের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর ঐতিহাসিক বোধ এবং বীরধর্মী দুঃসাহসিকতার কাহিনীর সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এই ক্ষুদ্র পরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাই এখানেই ক্ষান্ত দিলাম।

'উত্তরাধিকার'

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মৌলানা শহীদুল্লাহ্

স্বনামধন্য প্রফেসর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম. এ, বি. এল. ডিপ্লোফোন, ডি. লিট. সাহেব আজ একাশি বৎসর অতিক্রম করে বিরাশি বৎসরে পদার্পণ করেছেন। তাই আজ আমরা তাঁর গুণ-মুগ্ধ সাহচর্য-ধন্য ও হিতবাণীস্নাত সকলেই কেউ তাঁর সহকর্মী হিসাবে, কেউ বন্ধু হিসাবে, আর কেউ বা ছাত্র-শিষ্য বা ভক্ত হিসাবে এই আন্তঃমহাদেশীয় ভোজনালয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভক্তি সমর্পণ করবার জন্য সমাগত হয়েছি।

ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এমন লোক নন, যাঁকে এড়িয়ে চলা যায়। সাহচর্যে আসলে তাঁর বিবিধ ভাষায় পাণ্ডিত্য, হিন্দু-মুসলিম-খৃস্টান-বৌদ্ধ-ইহুদী সমুদয় ধর্মের শাস্ত্রীয় বাণী ও লোক-কাহিনী সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান, আর মানুষ হিসাবে দয়া-দাক্ষিণ্য ও আধ্যাত্মিক সম্পদ-বিনিময়ে অকৃপণ এই লোকটির এক বা একাধিক গুণে আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক, আর না হওয়াই যেন অদ্ভুত।

আমি তাঁকে প্রথম দেখেছি ১৯২১ সালের জুন মাসে,—তিনি যখন প্রথম ঢাকায় এলেন সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক এবং সেক্রেটারিয়েট মুসলিম হোস্টেলের বা হলের হাউস-টিউটর হিসাবে। তাঁর নাম ত আগে থেকেই জানা ছিল, সংস্কৃত ভাষায় ডিগ্রী পাস করা একজন সংগ্রামী মুসলিম হিসাবে, আর সেকালের একজন বিখ্যাত বাংলা লেখক বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মতত্ত্বাদি বিষয়ে উৎসাহী প্রবন্ধ-রচয়িতা রূপে।

তাঁর ঢাকা আগমনকালে আমি ঢাকা কলেজের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর অর্থাৎ এম. এ.পাঠ শেষ-করা অথচ তখনও পরীক্ষা না-দেওয়া একজন ছাত্র ছিলাম। আনুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটির পাঠারম্ভ হবার কথা পহেলা জুলাই থেকে। তার আগেই শিক্ষক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক—একথা তখনকার কর্মনির্বাহকরা বেশ জানতেন। তাই জুন মাসের আগেই সমুদয় নিয়োগপত্র পাঠানো হয়েছিল। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেব জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই কর্মে নিযুক্ত হন, আমি ঐ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই নিম্নতম শিক্ষক হিসাবে যোগ দেই। অর্থাৎ সেই সময় থেকে ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আমি ছাত্রও ছিলাম, শিক্ষকও ছিলাম। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রাথমিক সহকর্মীদের অন্তর্গত একজন হওয়ার গৌরব করতে পারি। কিছুদিনের মধ্যে এম. এফ. রহমান, সত্যেন বোস, জ্ঞান ঘোষ, নরেশ সেনগুপ্ত, রমেশ মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হরিদাস ভট্টাচার্য-প্রমুখ মহারথীরাও ডক্টর সাহেবের সহকর্মী হয়ে আসেন। তখনকার দিনে সর্বস্তরের শিক্ষকদের মধ্যে বেশ সমানভাবে আলাপ-আলোচনা, হাসি-তামাসা, খোশগল্প, খেলাধুলা ইত্যাদির চলন ছিল। ভোজনালয়ে জনাব শহীদুল্লাহ্ সাহেবের আর রমেশ বাবু, হরিদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতির মধ্যে অনেক মুখরোচক গল্প চলতো। খাদিমদাররা আহার্য দিতে আসলে আহাররত

www.pathagar.com

লোকদের কি কি আচরণে তাদের পাতে আহার্য দ্রব্যাদি দিতে হয়, আর কখন নিবৃত্ত হতে হয়, সে-সম্বন্ধে যতদূর মনে পড়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের শ্লোকটি এই—

'আহা' দেওৎ, 'উহুঁ' দেওৎ, দেওন্ত শিরশ্চালনে
'হাহা' দেওৎ, 'কিংকরো' দেওৎ, ন-দেওৎ ব্যাঘ্র ঝম্পনে।

একটা গল্প আছে ড. শহীদুল্লাহ্ সাহেব কেমন করে দুটি বিরোধী কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন :

সলিমুল্লাহ হলের হাউস-টিউটর থাকাকালে, ঐ হলের অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত থাকা তাঁর কর্তব্যের মধ্যে। কিন্তু অনুষ্ঠানে অনেক সময় সঙ্গীত হয়, নাটকও হয়। সেগুলো সম্পূর্ণ জায়েজ কিনা, এ বিষয়ে মতদ্বৈত আছে। এরূপ সন্দেহজনক স্থলে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও সঙ্গীতাদি আরম্ভ হতেই দুই কানে আঙ্গুল দিয়ে অনেক সময় চোখ বুজে বসে থাকতেন।

এইরূপ কথিত ঘটনার সত্যাসত্যের বিষয় আমি অবগত নই। তবে চোখ বুজবার কারণ কতকটা অনুমান করা যায় আর একটা ঘটনা থেকে। একবার অভিনয়ের জন্য 'বঙ্গনারী' নাটক নির্বাচিত হয়েছিল। অতিকষ্টে ডক্টর সাহেবের কাছ থেকে ছাত্রেরা সম্মতি আদায় করেছিল—তবে একটি শর্তে। শর্তটা এই যে এতে ছাত্রেরা নারী সেজে নারীর পার্ট অভিনয় করতে পারবেনা। বলা বাহুল্য, সে-যুগে হলের মঞ্চে—নাট্যমঞ্চ বলা যায় না—নারী এনে নারীর পার্ট অভিনয় করাবার প্রশ্নই উঠতে পারত না। সুতরাং মনে হয়, ছাত্রেরা পুরুষ সেজেই নারীর পার্ট অভিনয় করবে,—খুব সম্ভব এই ছিল অভিপ্রায়। এসব ঘটনা ড. সাহেবের বিলাত যাওয়ার আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে। কারণ বিলাত থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসবার পরেও তাঁর মধ্যে কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদিক দিয়ে ড. শহীদুল্লাহ্ সাহেবের চারিত্রিক দৃঢ়তা লক্ষণীয়। এই সঙ্গে সত্যের খাতিরে একটি কথা বলা আবশ্যক। পারমার্থিক বা ইসলামী সঙ্গীত শুনতে তাঁর কোনদিনই আপত্তি ছিল না—তা সে বাংলাই হোক বা আরবী ফারসী উর্দুই হোক। এখানেও তাঁর ব্যবহার সঙ্গতিপূর্ণ—নইলে 'ইয়া নবী সালামো আলায়কা' অথবা পবিত্র কোরান শরীফের তেলাওয়াত শোনাও কঠিন হয়ে পড়ত।

ধর্মীয় ব্যাপারে আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে পড়ছে। প্রথমবার যখন ঢাকার মাঠে মেয়েরা জামাতে ঈদের নামাজ পড়বার সংকল্প করে, সেবারে ড. শহীদুল্লাহ্-সাহেব অত্যন্ত সাহসের কাজ করেছিলেন। কোথায়ও স্থান না হওয়াতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির খেলার ময়দানে স্থান ত পাওয়া গেল, কিন্তু সারা শহরে কোনও মৌলবী-মৌলানা বা খুদে মুন্সীও ইমামতী করতে রাজী হল না। সেই সঙ্কটের সময়, স্থানীয় ও'লামাদের বিরোধিতার মুখে ড. শহীদুল্লাহ্ সাহেব মেয়েদের ঈদের নামাজে ইমামতী করলেন।

আজকে এই সভার উদ্যোক্তা হচ্ছেন, পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্ব-পাকিস্তান শাখার সভ্যবৃন্দ। এঁরা অবশ্যই জানেন, সাহিত্য রচনায় লেখকের চিন্তা বা মতামত প্রকাশের কতটুকু স্বাধীনতা থাকা উচিত। এমন এক সময় ছিল, যখন হয়ত মনে মনে

www.pathagar.com

চিন্তা করতে বাধা না থাকলেও প্রবন্ধ বা অন্যবিধ রচনায় সক্রিয় স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল—যদি সে-চিন্তার মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় মতের সঙ্গে সামান্য পার্থক্য বা বিরোধ থাকতো। আজও যে ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তেমন কিছু বাধা একেবারেই নাই, তা নয়। যা হোক, একবার ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজের একজন তরুণ সদস্য লিখেছিলেন—"তেরোশো বছর আগে খেজুর ও মরুভূমির দেশের মেষপালক বা উষ্ট্রচালকেরা যেসব নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তা কি এই বিংশ শতাব্দীতেও সুজলা-সুফলা বঙ্গভূমিতে হুবহু গ্রহণযোগ্য ?"—বা এই ধরণের কিছু। এই নিয়ে তুমুল আন্দোলন শুরু হল দিওয়ান-বাজারের স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। তাদের দাবী হল এইসব কুফরী-কালামের স্রষ্টাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া চাই। বিচারের ভার পড়ল জনাব ড. শহীদুল্লাহ্‌র উপর। তিনি সঙ্কটটা পুরোপুরি উপলব্ধি করে রায় দিলেন, লেখক যা লিখেছেন, তাতে তার উপর 'কুফরী ফতোয়া' দেওয়া যায় না। এতে মহল্লাবাসীদের রাগ গিয়ে পড়লো ড. সাহেবের উপরেই। তাঁর প্রতি যত শ্রদ্ধা ছিল, তা পরিণত হল বিতৃষ্ণায়। কিন্তু ড. সাহেব স্থির থাকলেন তাঁর অভিমতের উপর। যা হোক ব্যাপারটা কিছু বিশিষ্ট সম্ভাষণ ও কটূক্তির উপর দিয়েই অবশেষে মিটে গেল।...তরুণ লেখকের জীবনটা রক্ষা হলো।

আমরা ড. শহীদুল্লাহ্‌কে দেখেছি প্রত্যেক জুমার নামাজের খোতবার আগে ইসলামের রূপ বিশ্লেষণ করতে আর সেই আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রণের উপদেশ দিতে; সত্য-সন্ধানী অমুসলিমকে মুসলিম করে নিয়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর আহার-বাসস্থান ও জীবিকার ভার নিয়ে বহন করতে; শত-সহস্র মিলাদ মহফিলে ভাষণ দিয়ে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর চরিত্রের মাধুর্য বিশ্লেষণ করতে; অনেক গরীব মুসলিম ছাত্রকে নিজগৃহে স্থান দিয়ে তাদের উচ্চশিক্ষার সহায়তা করতে; পারিবারিক শাদী-গমীতে শরীক হয়ে অনেক সময় বিবাহ-পড়াতে অথবা জানাজার নামাজের ইমামতী করতে; হাজার হাজার সাহিত্য-সভা ও সংস্কৃতি-সভায় সভাপতিত্ব করতে; হিন্দু মুসলিম-ব্রাহ্ম-বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ভজনালয়ে বা উৎসব-মণ্ডপে উপস্থিত হয়ে সম্প্রীতি ও প্রেম-ধর্মের মহিমা ও ধর্মগুরুদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে। ইউনিভার্সিটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় দড়ি-টানা ও শত-গজ দৌড়ে যুবকদের হারিয়ে (!) দিতে; অবসরের দিনে চৌদ্দ-পনেরো ঘণ্টা বা তারও অধিক কাল কোরান তেলাওয়াত, গ্রন্থরচনা, অধ্যয়ন, দোয়া-কালাম ও পীর-মুরিদান তত্ত্বালোচনা করতে; বহুকাল যাবৎ নিজ খরচায় ইংরেজি মাসিকপত্র 'Peace' চালিয়ে যেতে; অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা (গদ্য-পদ্য, মূল অনুবাদ) রচনা করতে; এবং আরও কত কিছু কাজ করতে, যা অল্পের মধ্যে গুছিয়ে বলা অতিশয় কঠিন।

আমরা দেশের কৃতী সন্তান, জাগ্রতমনা, কর্তব্যনিষ্ঠ, বহুগুণান্বিত, অনাড়ম্বর যুবকগণ অশীতিপর মনীষী আলহাজ্জ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-সাহেবের প্রতি উৎসারিত প্রাণের শ্রদ্ধা অর্পণ করে, আল্লাহ কাদিরের দরগায় প্রার্থনা করি তিনি যেন সুখ শান্তিপূর্ণ "বিংশোত্তরী বা বিশে-শয়" দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

পরিক্রম-মার্চ, ১৯৬৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মরহুমা ফজিলতুন্নেসার সঙ্গে আমার পরিচয়

১৯০৫ সালে মৈমনসিংহ জেলার করটিয়ার মাইল দুয়েক দূরে অবস্থিত 'কুমল্লীনামদার' গ্রামে এক বুদ্ধিদীপ্ত লাবণ্যময়ী কন্যারত্নের জন্ম হয়। তার নাম ফজিলতুন্নেসা ও পিতার নাম জনাব ওয়াহেদ আলী খাঁ। ইনি ছিলেন মাইনর স্কুলের একজন শিক্ষক। এই সুশ্রী, সুলক্ষণা কন্যাটির বুদ্ধিশুদ্ধি দেখে খাঁ সাহেব ৬ বছর বয়সেই (১৯১১) তাকে করটিয়ার প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দেন। এরপর দেখা গেল এই মেয়ে প্রতি বছরেই তার ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করে যাচ্ছে। এই দেখে স্বভাবতঃই পিতা-মাতার মনে এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তাই, নিম্ন প্রাইমারী, উচ্চ প্রাইমারী ও মাইনর পাস করার পরেই তাকে ১৯১৭ সালে ঢাকার সুবিখ্যাত ইডেন হাই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। এখানে ৪ বছর পড়ার পর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে ১৫ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করে—অবশ্যই প্রথম বিভাগে এবং ঢাকা ডিভিশনের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেই (১৯২১ সাল)। এরপর ইডেন কলেজ থেকেই ১৯২৩ সালে I.A. পাস করে কৃতিত্বের সাথে অর্থাৎ with distinction...

ইডেন স্কুল ইডেন কলেজ তখন ছিল বুড়িগঙ্গার তীরে এবং গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানেই। তাই আইন-শৃঙ্খলা ও পড়াশুনা বেশ ভালভাবেই চলতো। এই ইডেন কলেজে থাকতেই ছাত্রীদের মুখে মুখে ফজিলতুন্নেসার নাম সংক্ষিপ্ত হয়ে ক্লাসের উঁচু-নিচুর বিবেচনায় কারো কাছে 'ফতুল' ও কারো কাছে 'ফতুল দি'তে পরিণত হল। এতে আমাদের ফতুলের মিশুক ও স্নিগ্ধ স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এর ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে আমি কয়েকজনের নাম জানি : যথা স্নিগ্ধা, বরণ, করুণা, কণা...ইত্যাদি। যাহোক, এবার আমাদের ফতুল কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ডিসটিংশনের সহিত B.A. পাস করে। অতঃপর ঢাকায় ফিরে এসে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৫ সালে অঙ্কশাস্ত্রের মিশ্র বিভাগের M.A. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে। এটা অবশ্যই একজন মহিলার পক্ষে, বিশেষতঃ মুসলিম মহিলার পক্ষে যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও সুকৃতির পরিচয়, তা না বললেও বোঝা যায়। এইবার ফতুলের বাপ-মায়ের উচ্চাশা ফলবতী হলেও তার নিজের উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। তাই ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্টেট স্কলারশীপ নিয়ে মিস ফজিলতুন্নেসা উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত গমন করে। তারপর ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তার পিতার মারাত্মক অসুখের খবর পেয়ে সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করার আগেই তাকে বাড়ীতে ফিরে আসতে হয়। অবশ্য এটা দুর্ভাগ্যের কথা। বিলাতে যাওয়ার সময় এর ঢাকা কলেজের অঙ্কের অধ্যক্ষ ড. নলিনীমোহন বোসও সঙ্গে ছিলেন। তাই এই পারিবারিক আকস্মিক দুর্ঘটনাটা না ঘটলে হয়ত একটি Ph.D বা অনুরূপ ডিগ্রী নিয়ে

www.pathagar.com

ফিরে আসতে পারতো। কিন্তু "বিধি হ'লে বাম, হয় না কোনও কাম।" এই প্রথমবার আমাদের ফজিলতের জয়যাত্রার পথে শনির দৃষ্টি পড়লো।

সে যাহোক, এখন একটা ঘরোয়া কথায় আসা যাক। বিলাতে ফজিলতের সঙ্গে খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ সাহেবের পুত্র সলিসিটর মিঃ শামসোদ্দোহার পরিচয় ও সম্প্রীতি হয়; এবং উভয়েই পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রতিশ্রুত হয়। সম্পর্কটা অবশ্য বেশ উপযুক্ত। এ বিষয়ে ঘটকালি করেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ সাহেব। ইনিও মৈমনসিংহ জেলারই লোক—১৯২৬ সালে করটিয়া কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর এ কলেজের প্রিন্সিপাল হন। ইনি ফজিলতের বাপ-মায়ের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। ইনিই এ বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রথমে ফতুলের মা ও খাঁ সাহেব একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও অবশেষে প্রিন্সিপাল সাহেবের সুপরামর্শে এ বিবাহে সম্মতি দেন। অতঃপর উভয়পক্ষের মুরব্বীদের মুকাবেলায় যথানিয়মে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়।

ফজিলতুন্নেসা অন্তর্ধান করেছে ১৯৭৬ সালের ২১শে অক্টোবর বৃহস্পতিবারে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। আল্লা একে জান্নাতবাসিনী করুন। বর্তমানে ফজিলতের বংশে রয়েছে তার একমাত্র কন্যা জুলি রামবেলু, জামাতা রিকি রামবেলু, তুলোর মতো ধবধবে সাদা ও নরম একটা ৩ বছর বয়সের খুকি রুইনা; আর জুলির বড় মেয়ে নিলুফার (ও তার স্বামী ফিদায়ে দস্তগীর), জুলির একমাত্র পুত্র তারিক, বয়স ষোল বছর (এখনও ঢাকাতে লেখাপড়া করছে, পরে বিলাতে গিয়ে সেখানেই উচ্চশিক্ষা লাভ করার ইচ্ছায়)। বড় কন্যাও শ্বশুরবাড়ীতেই থাকে, আর তারিক ছুটির সময় জুলির কাছেই থাকে। দস্তগীর আবার নিলুফারের ফুফাতো ভাইও। নিলুফার ও তারেকের নানা খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ সাহেব।

মিস ফজিলতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কখন হয়, তা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে সসম্মানে বি.এ. পাস করে আসার কিছু পরে হওয়াই সম্ভব। এইবার ফজিলতের সঙ্গে আমার কেমন স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক ছিল তারই যথাযথ আভাস রেখে যেতে চাই। আমি তখন ছিলাম বর্ধমান হাউসের ছাত্রদের হাউস টিউটর। আমার জন্য দোতলায় তিনটে স্বতন্ত্র ঘর ছিল। এছাড়া দেওয়ালের বাইরে ছিল একটা অফিস ঘর, যেখানে হাউস টিউটরীর কাগজপত্র এবং ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ঘর। এছাড়া রান্নাঘরে নামবার জন্য (বা সেদিক দিয়ে উঠবার জন্য) একটা স্বতন্ত্র প্রাইভেট সিঁড়ি ছিল।...বিকাল বেলা প্রায় প্রতিদিন ফজিলত এসে আমার স্ত্রী, শাশুড়ী এবং দুইটি মেয়ে ও একটি ছোট ছেলের সহিত গল্প-সল্প করতো। খোশগল্প জমানোর পদ্ধতি ফজিলতের খুবই ভাল ছিল। তার ফিরে যাওয়ার সময় (বিকালে, সাঁঝে বা রাত্রে) আমি ওকে সাথে নিয়ে তার গৃহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতাম। আমি তাকে সর্বদাই নিজের ছোট বোনের মত দেখতাম। তার বাসাটা ছিল ৯২ নং দেওয়ান বাজার রোডের পশ্চিম পার্শ্বে। তখন সদর রাস্তার দিক দিয়ে ঘরে ঢুকবার সুব্যবস্থা ছিল না—দক্ষিণ দিকের ছোট গলির সঙ্গে লাগানো একটা কপাট দিয়েই ঘরে ঢুকতে হত। এই গলির ঠিক দক্ষিণেই একটা মসজিদ ছিল, সেটা এখনও রয়েছে। বাড়ীটার

www.pathagar.com

পূর্বদিকে ছিল (ও আছে) হাসিনা মঞ্জিল—সুন্দর একটা লাল ইটের বাড়ী, দোতলা। ফজিলতের একতলা বাড়ীটা ছোট হলেও, বেশ আবরুওয়ালা একতলা L আকারের বাড়ী। রাস্তার দু-পাশেই অনেক ঢাকাই কুট্টির কুঁড়েঘর ছিল। তাই, ফজিলত মাথায় ঘোমটা দিয়েই রাস্তায় চলাফেরা করত। অবশ্য, ঘোমটাটা একেবারে নাক-কান-চোখ-মুখ ঢাকা না হলেও চলনসই ছিল। সীমন্তের উপরে তিনটি মধ্যমাঙ্গুলি পরিমাণ খোলা চুল ছাড়া মস্তকের বাকী বৃহদংশের চুলই ঘোমটায় সর্বদাই ঢাকা থাকতো। এই দেওয়ানবাজার রাস্তা দিয়ে চলবার সময় কুট্টিদের দুই-একটা ফিসফিসে মন্তব্য কানে আসলেও কোনও দিন প্রকৃত বিপদাপন্ন হইনি। সেটা আল্লারই রহমত।

প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠে ঘুম টুটে গেলেও ফজিলতের কপট ঘুমটা থেকেই যেত—তাই আমাকেই এসে তার দুহাত ধরে টেনে তুলে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে ঘুম ভাঙাতে হত। এটা ছিল আমার শখের চাকুরি। এবারও একবার গিয়ে দেওয়ানবাজারের ঘরগুলো দেখে এসেছি। তার স্মৃতি-জড়িত ঘরগুলো এখনও পূর্বস্মৃতি ধারণ করেই চুপ করে রয়েছে।

দেখতে পেলাম কোন্ ঘরটায় তার অসুখের সময় তার রাতুল চরণ যুগল কোলে তুলে নিয়ে আমি গরম পানিতে ভিজানো তোয়ালেটা নিংড়িয়ে নিয়ে আলগোছে ওর পায়ে সেঁক দিয়ে দিতাম। তখন কী সুন্দর হাসিটাই না ফুটে উঠতো ওর চোখে-মুখে। ও যে আমার চিরজীবনের আপন বোন।

মনে পড়লো, একদিন কোন্ ঘরটায় হস্তলিপি পরীক্ষার জন্য নজরুলকে নিয়ে এসেছিলাম ফজিলতের কাছে, ওর হাতে ভবিষ্যতে জোতিষশাস্ত্রে কি বিধিলিপি-রেখা রয়েছে তাই উদ্‌ঘাটন করার জন্য।

মনে পড়লো কোন্ ঘরটায় পরদিন সকালবেলায় গিয়ে দেখি, ওর সুন্দর সোনার মটর-মালাটা দুখণ্ড হয়ে পড়ে রয়েছে। আমি অবিলম্বে সেটা নিয়ে মালীটোলার সোনারুর দোকানে বসে থেকে জোড়া লাগানো হারটা গলায় পরে সানন্দে ফিরে এসে আমার ছোট বোনটার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম। আরেক দিনের একটা ঘটনার কথা বলি : কোনও জ্যোৎস্না রাতে আমি, আমার স্ত্রী (সাজেদা বিবি), আমার শাশুড়ী, আর আমার ফতুল বোনটি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আমাদের এক প্রিয় বন্ধুর বাড়ীতে। যেতে হবে একটা আম-কাঁঠালের বাগানের মধ্য দিয়ে, বাগানের শেষ প্রান্তের একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে, তার সঙ্গে লাগানো আরেকটা সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে। সে সিঁড়ি এত খাড়া যে, নামবার সময় পিছন ফিরে আস্তে আস্তে নামতে হবে—নইলে সোজাসুজি নামতে গেলে পা পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। আমরা আর সবাই নেমে গিয়েছি কিন্তু ফতুল সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বললো, "আমি অমন করে নামতে পারবো না, আমাকে কোলে করে নামিয়ে নিতে হবে।"—প্রকারান্তরে আমাকেই বলা হচ্ছে, নামিয়ে নাও। তাই শুনে আমরা সবাই আবার সিঁড়ির গোড়ার দিকে এগুতে লাগলাম, ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি কয়েক ধাপ নেমে এসে তিন-চারটা সিঁড়ি বাকী থাকতেই, ফিরে উল্টে হঠাৎ লাফ দিয়ে আমার গায়ের উপর পড়ে গলা ধরে ঝুলে খিল খিল করে হেসে উঠলো। এই রগড় দেখে আর সবাইও হাসতে লাগলো।

www.pathagar.com

এইসব ব্যাপার লক্ষ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় আমার ও আমার ফতুল ভগ্নীটার মধ্যে কেমন অসাধারণ সহজ সম্পর্ক ছিল। দুইজনই যদি একে অন্যকে সম্যক বুঝতে পারে তবেই শুধু এরূপ হওয়া সম্ভব। মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সন্দেহ বা কলুষ থাকলে এমন গভীর সৌহার্দ্য জন্মাতেই পারে না। নজরুল ভেবেছিল, ফজিলতকে সে প্রায় জয় করে নিয়েছে বধূরূপে। কিন্তু সে ফজিলতের টাইপ বা মানসিক ধাঁচ বুঝতে না পারায় অনর্থক মর্মান্তিক কষ্ট ভোগ করেছে। নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত হয়। নজরুল ইতিমধ্যেই দোজবরে বলে চিহ্নিত হয়েছে। এর পরেও কি ফজিলত তাকে তেজবরে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারে? এ চিন্তাটা মোটেই নজরুলের মনে উদয় হয়নি—হয়ত এটা তার পৌরুষের বৃথা অহঙ্কারেরই ফল।...আমি ফজিলতকে চেয়েছি এবং পেয়েছি অতি পবিত্র বান্ধবীরূপে। ফজিলতও আমাকে পেয়েছে অনাবিল বান্ধবরূপে। আমরা আমাদের এই বান্ধব-বান্ধবী সম্পর্ক পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছি। আমাদের দুজনের হৃদয়বৃত্তি সমতুল ছিল বলেই আমরা সযত্নে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আমাদের পবিত্র সম্পর্ক সংযত ও সংহত রাখতে পেরেছি।

অনেকেই হয়ত মনে মনে প্রশ্ন তুলবেন, "আচ্ছা কাজী সাহেব, সত্যি করে বলেন ত আপনার মুখে পাতানো ভগ্নীর সঙ্গে এতটা মাখা-মাখি (বা দহরম-মহরম) আপনার ঘরণী (সাজেদা বিবি) কেমন করে বরদাশত করতেন?" আমি বলি, "আমার সাজুরানী আমাকে ভাল করেই চেনেন। তার পারিবারিক পরিবেশ সম্পূর্ণ আল্লাময়। তার দাদা (শামসুল উলামা আতাউর রহমান), নানা (কাজী আবদুল্লাহ) এবং উপস্থিত মৌলানা-মৌলবিগণ বিবাহের প্রাক্কালে আমাকে দিয়ে সুরা ইউসুফের প্রথম, কিংবা প্রথম ও দ্বিতীয় রেকাত কেরাআত পড়িয়ে নিয়ে উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর সম্পূর্ণ প্রশংসা অর্জন করার পর আমার বিবাহ পড়ানো হয়েছিল। তাতেই হয়ত আমার সাজুরানীর চোখ আমার চেহারার ভিতর হজরত ইউসুফের নূরের তজল্লা দেখতে পেয়ে তার নাতী-নাত্নীদের কাছে গর্ব প্রকাশ করতেন। তাছাড়া আমার পিতৃবংশীয়েরাও দিল্লী-জৌনপুর প্রভৃতি শহরে নিরপেক্ষ বিচারকর্ম ও ইসলাম-বার্তার সুপ্রচারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাই তাঁরা বিল্‌গায়ব আল্লার কুদরতে বিশ্বাসী ছিলেন; এবং তাঁদের মধ্যে মৌলানা কেরামত আলী সাহেবের মত বুজর্গ লোকেরও জন্ম হয়েছিল। সম্ভবতঃ এইসব কারণেই আমার মধ্যে, সাজুরানীর মধ্যে আর আমার ফতুল ভগ্নীটির মধ্যে কোনওদিন কোনও দ্বন্দ্বই প্রশ্রয় পায়নি। আমরা অসম সাহসিক কাজও করেছি, সম্পূর্ণ পবিত্রভাবে, যেমনটা সচরাচর দৃষ্ট না হলে আল্লার অসীম রহমতের দ্বারা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যায়। আমি আল্লার কাছে বিনীতভাবে আরজ করি—ইয়া রাব্বুল আলামীন! তুমি আমাদের সকলকে পবিত্রতায় আসক্ত কর, অপবিত্রতায় বিতৃষ্ণা দান কর; মানুষের হীনতা নিরসন কর, মানুষে মানুষে পরস্পর প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, প্রীতির উদ্রেক কর, যাতে তোমার আদম-সন্তানগণ শয়তানের কুহকে পড়ে তোমার নির্দেশের বিরুদ্ধে ধাবিত না হয়। তোমারই ইচ্ছার জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ মার্চ ১৯৭৭/২২ ফাল্গুন ১৩৮৩

www.pathagar.com

ফজলুল বারী চৌধুরী স্মৃতিকথা

মরহুম ফজলুল বারী চৌধুরীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী হতে যাচ্ছে আগামী ১৮ই মার্চ (১৯৭৬) তারিখে। এই উপলক্ষে আমি কিছু স্মৃতিকথা রেখে যেতে চাই। ফজলুর হাসি-মুখখানি আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় কুষ্টিয়ার পুরাতন হাইস্কুলের একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে। আমি যখন ঐ স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি তখন ও পড়তো আমার কয়েক ক্লাশ নিচে। আমি কিছুকাল ওর পিতা, নামজাদা ব্যবসায়-জীবী, জনাব কওসেরউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে গৃহশিক্ষক রূপে কাজ করেছি। তাতে বুঝতে পেরেছিলাম—ছেলেটার প্রতিভা আছে। ভাল ছেলেকে পড়াতে স্বভাবতঃই ভাল লাগে। বিশেষ করে অঙ্ক ও ইংরেজীতে ওর অনুরাগ আছে দেখে অঙ্কের সঙ্গে কিছুটা ইংরেজীও পড়াতাম। মোট কথা, অঙ্কটাকে ফরজ ধরলে, ইংরেজীটাকেও অন্ততঃ নফল বলতে হয়। আমি কুষ্টিয়া স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও মধ্যে মধ্যে ছুটিতে কুষ্টেয় এসে ফজলুকে পড়িয়েছি, ওর সঙ্গে সাতঘুঁটি-বাঘবন্দী এবং ষোল-ঘুঁটির মোগল-পাঠান খেলা খেলেছি। এতেও ফজলুর দক্ষতা লক্ষ করে ওর প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি হয়েছে। আবার পরবর্তীকালে জনাব কওসেরউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের উদ্যোগে আমার সেজো বোন সালেহা খাতুনের সহিত ফজলুর বিবাহ-বন্ধন হয়। সেইসময় মুরব্বীদের কাছে জানতে পারলাম, ইতিপূর্বেই আমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মজমপুরের চৌধুরী সাহেবদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইভাবে ফজলুর সঙ্গে আমার গুরু-শিক্ষকের চেয়েও দৃঢ়তর কুটুম্ব-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে সম্পর্ক শ্রীমান ফজলুল বারীর "আহ্বানান্তরেও" (এখানে, আহ্বান=আল্লার আহ্বানে আল্লার সকাশে উপস্থিত হওয়া। এই হিসাবে এই আহ্বানের পরবর্তীকালকে বলা হয় আহ্বানান্তরকাল; এরই গ্রাম্য উচ্চারণে মাঝের 'না' লোপ হয়ে 'আভান্তরে' রূপান্তরিত হয়েছে) অক্ষুণ্ন রয়েছে।

বাংলায় একটা কথা আছে, "বাপ্‌কা বেটা, সেপাই কা ঘোড়া"। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। তাই জনাব কওসেরউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের কর্মদক্ষতা, সততা, নৈতিক শিল্প-প্রতিভা প্রভৃতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিয়ে, পরে শ্রীমান ফজলুর বিষয়ে দুই-চারটা কথা বলেই, আলোচনা শেষ করতে চাই।

কুষ্টিয়া এলাকার বাসিন্দারা যখন যান্ত্রিক শিল্পকলার সঙ্গে নিতান্ত অপরিচিত, কওসেরউদ্দীন চৌধুরী সেই সময়ে অগ্রণী হিসাবে খান্দেশ্বরী চিনি ফ্যাক্টরী, সুরকি মিল, ইট ও টালির কারখানা স্থাপন করে স্থানীয় লোকদের সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তিনি খোকশা জানিপুরের নিকটবর্তী কমলাপুরের সুবক্তা মওলানা সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী সাহেব, কুষ্টিয়ার থানাপাড়া নিবাসী শিক্ষাপ্রসার-কামী মুক্তিয়ার খোদাদাদ খাঁ সাহেব, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী রজব আলী খাঁ চৌধুরী সাহেব প্রভৃতির সহিত সংযোগ স্থাপন করে দেশের লোকের ধর্মীয় শিক্ষা, স্কুল-কলেজীয় শিক্ষা এবং ব্যবসা-

www.pathagar.com

বাণিজ্যিক শিক্ষার দ্বারা দেশের উন্নতি সাধনে, বিশেষ করে নিদ্রিত, নিষ্ক্রিয়, অবোধ মুসলমান সমাজের পুনরুত্থানে সহায়তা করেছেন। তিনি নিজের পরিচালনায় কুষ্টিয়া শহরে ইষ্টকের যেসব একতলা বা দোতলা অট্টালিকা নির্মাণ করে গিয়েছেন, সেগুলো এখনও তাঁর কর্মকুশলতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এইসব কৃতিত্বপূর্ণ চিহ্ন রেখে তিনি ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসের ১৬ তারিখে লোকান্তরিত হন।

ফজলুল বারী চৌধুরীর জন্ম হয় ১৯০৪ সালের ১লা ডিসেম্বরে, এবং মৃত্যু ঘটে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে; অর্থাৎ মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর ৩ মাস। আমার যতদূর মনে হয়, এর পিতা (বড় চৌধুরী সাহেব) অশীতিপর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। ফজলু কুষ্টিয়া স্কুল থেকে ১৯২১ সালে প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়। সেখান থেকেও আই. এসসি, বি. এসসি. উভয় পরীক্ষায়ই বৃত্তিসহ পাশ করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়। এখানে শেষ বর্ষে পড়বার সময় নিদারুণ স্বাস্থ্যহানি ঘটায় ডাক্তারীর ফাইনাল ছয় বৎসর পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয়নি—ডাক্তারের পরামর্শে কলকাতার বাস ত্যাগ করে মজমপুরের বাড়ীতে ফিরে আসতে হয়।

কিন্তু নিষ্কর্মা হয়ে বাড়ীতে বসে থাকা তার ধাতে ছিল না। এখন বরং সাহিত্য ও চিকিৎসার সঙ্গে আইনও সংযুক্ত হল, বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্যিক আলোচনা, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখা, আর আইন-সংক্রান্ত পুস্তকাদি আয়ত্ত করাও এর নিত্যকার্যের অন্তর্গত হয়ে পড়লো। এর কয়েকজন তৎকালীন বন্ধুর নাম করলেই বন্ধুচয়নের রুচিটা বোঝা যাবে। তাঁরা হচ্ছেন শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডঃ মতিলাল দাশ, শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, আবুল হোসেন, মহম্মদ নেজামতুল্লাহ , আজিজুর রহমান ইত্যাদি তরুণ কবি, সাহিত্যিক, নট, নাট্যকার, প্রশাসক।

ফজলুল বারীর সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে ছোটগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ। এগুলো দীপিকা, জাগরণ, সন্ধানী, বুলবুল এইসব পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। জীবনের মধ্যাহ্নে এই ছোট চৌধুরী বিশেষভাবে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ এবং জনহিতকর কার্যে মনোযোগ দেন। তিনি পল্লীর শিক্ষিত ও উপযুক্ত বিবেচনাশীলদের নিয়ে পল্লীসংঘ গঠন করেন। এই কর্মাবলীর মধ্যে রয়েছে কুষ্টিয়ার পাটাতন করা মসৃণ রাস্তাঘাট, মরা গোরাই নদীর উপর হিরণ্ময় ব্রীজ, ইউনিয়ন বোর্ড হল স্থাপন ইত্যাদি। তিনি দীর্ঘদিন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, ইউনিয়ন বোর্ড অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও মজমপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুইবার মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি কর্মিষ্ঠ আখচাষীদের হিতার্থে বিপুল সফলতার সহিত কেরিউ এ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের পরিচালনার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

বিরূপ স্বাস্থ্য নিয়েও ইনি যে নিষ্ঠার সহিত বিভিন্ন ধরণের কাজ রেখে গেছেন তার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

এখন পাঠকগণই বিচার করবেন, ইনি সত্যি-সত্যি 'বাপ কা বেটা' নামের সত্যতা প্রমাণ করেছেন কিনা!

মার্চ ১৯৭৬

www.pathagar.com

ISBN : 9848200-11-8